GIFT

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম) কারু ও চারু শিল্প

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

কে, এম, আহসান কবীর

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465881

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুনতাসীর মামুন

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

465881

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল,২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা-পত্র

"বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম) কারু ও চারু শিল্প" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। এটি আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল। আমার জানা মতে, এই শিরোনামে ইতঃপূর্বে বা বর্তমানে অন্য কেউ এ ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন নি। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সাময়িকীতে ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি দেই নি। অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রীর নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করলাম।

স্বাক্ষর

৮-৪-২০১২

(কে,এম, আহসান কবীর)
এম.ফিল. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, রেজিস্ট্রেশন নাম্বারঃ ৪৮/২০০৪-০৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465381

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, কে, এম, আহসান কবীর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম) কারু ও চারু শিল্প" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। অভিসন্দর্ভটির মৌলিক উপকরণ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এবং গবেষকের একক গবেষণার ফসল। আমার জানা মতে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনোপর্যায়ে এই গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। গবেষক এই গবেষণাকর্মটি পূর্ণাঙ্গভাবে বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং তা ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা দেওয়ার সুপারিশ করছি।

স্বাক্ষর

(ড. মুনতাসীর মামুন)
প্রফেসর
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

465381
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও বিভিন্নভাবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। আমরা ভাষার জন্য পরিচিত, মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য পরিচিত। ফোকগান, পাটজাত দ্রব্য, নক্শী-কাঁথা, জামদানী ও বেনারসী শাড়িসহ নানা ধরনের কারুশিল্প দ্রব্য আমাদের পরিচয়কে তুলে ধরেছে। আর এ পরিচয়ের মূল নায়কেরা হলো গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ, তারা ও তাদের কারুদ্রব্য আমাদের জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে। এই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির আরেকটি বৈচিত্র্য আমাদের আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও তাদের জীবন-সংস্কৃতি অর্থাৎ তাদের কারুশিল্প। তাদের কারুশিল্প হল, তাদের জীবনের প্রতিদিনের অতি সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্য। যে সব দ্রব্য প্রকৃতির সাধারণ জিনিস থেকে তৈরি যার আকৃতি, গঠন সরাসরি প্রকৃতি থেকে মূল অবয়ব ধারণ করে আছে বা থাকে।

এই অভিসন্দর্ভের শুরু হয়েছে আমার ও বাংলাদেশের শ্রদ্ধাভাজন ইতিহাসবিদ, গবেষক, লেখক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের আগ্রহে। কেননা তিনিই আগ্রহ করে বিষয়টিকে নিয়ে আমাকে শুরু করার প্রেরণা দিয়েছেন। অতঃপর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কারুশিল্প যে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয়, এই ধারণাটিও তিনিই আমার মাথার মধ্যে গেঁথে দেন এবং সর্বশেষ যখন তিনি আমাকে বলেন তুমি শিল্পকলার ছাত্র, তোমার অভিসন্দর্ভে কারুশিল্পের বর্ণনা হবে অন্যদের চেয়ে আলাদা, হবে নতুন কিছু। তখনই আমি তাঁর চিন্তার বৈচিত্র্য, গভীরতা দেখে বিস্মিত হয়, আমার অভিসন্দর্ভ মোড় নেয় সত্যিকারের পর্যবেক্ষণে। এ পর্যায়ে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই আমার জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া ড. অধ্যাপক রানা রাজ্জাক, সহযোগী অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী, সু-লেখক হাসিনা আহমেদের কাছে আমি ঋণী।

রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ-এর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা, কবিতা চাকমাসহ আরও মনে করতে চাই খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল ইনস্টিটিউটের রিসার্চ অফিসার জিতেন চাকমাকে। রাঙামাটি বিসিক-এর পরিচালক (বিগত) নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, ব্যবসয়ী মন্টু বিকাশ চাকমা, রাঙামাটির পোলিনা চাকমা, ভক্তি চাকমা, রিয়া ত্রিপুরা, সন্তোস ত্রিপুরা। খাগড়াছড়ির স্বপ্না চাকমা, স্বাগতম দেওয়ান, বিভেল চাকমা। বান্দরবনের চিন থু মারমা, ডাব্লিউ ভাই, সুবর্ণা চাকমা, জিতেন্দ্র ত্রিপুরা, সত্যপাঞ্জি ত্রিপুরা, জিং আলহ বম, রবিন বম, নাথান বম, নুপিয়াং বম । মধুপুরের রাখী ম্রং, বাবুল মারাক, জনিক নকরেক, রোজী ম্রং, সিলেটের মাতৃসম এসবিনী দেবী, প্রখ্যাত কবি এ. কে. শেরাম, বন্ধু অভীরূপ সিনহা,

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহীর সেলিনা আপা, সলোমন সাঁওতাল, পাতিরাস মারান্ডি, ভীম হাসদা, মার্গারেট হাসদা, গণেশ মাঝি, রবীন্দ্রনাথ সরেন, অনিল মারান্ডি, চাপাইনবাবগঞ্জের কেরিণা হাসদা– যাঁরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে, তাঁদের সমাজের সাথে মেশার, কাজ করার, পরিচিত হওয়ার ও আলাপ করার সুযোগ দিয়েছেন। এছাড়া আমার সহপাঠী সেলিনা আক্তার সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে বারবার আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

এবার আমার পরিবারের কথা, আমার অগ্রজ পাবলো শাহি, অনুজ ইকবাল জাফর এবং আমার বন্ধু মিন্টুসহ যারা আমার এ লেখার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন— তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, ইতিহাস বিভাগের লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরি, বিসিক লাইব্রেরি, জাতীয় আর্কাইভ লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের লাইব্রেরি ও আদিবাসী কলেজ লাইব্রেরি ও রাজশাহী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল ইন্সটিটিউটের সকলে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার বন্ধু উদ্ভাসন চাকমা, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক শুভজ্যোতি চাকমা, বান্দরবন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল ইন্সটিটিউটের রিসার্চ অফিসার প্রতাপ মার্মা আমাকে তথ্য সংগ্রহে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে মহান আল্লাহ্'র প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার শক্তি-সামর্থ্য ও সুযোগ দান করেছেন।

কে, এম, আহসান কবীর

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র ..... পৃষ্ঠা নং- I
প্রত্যয়নপত্র ..... পৃষ্ঠা নং- II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... পৃষ্ঠা নং- III
সূচি ..... পৃষ্ঠা নং- V
ভূমিকা ও অন্যান্য..... পৃষ্ঠা নং ১-১১

১.১ ভূমিকা, আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) সংজ্ঞা
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি
১.৫ গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু
১.৬ নির্ধারিত এলাকা
১.৭ সীমাবদ্ধতা

প্রথম অধ্যায়:
২.১ আদিবাসীদের (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের) নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস
পৃষ্ঠা নং ১২-২২

দ্বিতীয় অধ্যায়:
৩.১ শিল্পকলা, চারুশিল্প, কারুশিল্প ও আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর) কারুশিল্পের সংজ্ঞা
পৃষ্ঠা নং ২৩-৩০

তৃতীয় অধ্যায়:
৪.১ ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম কারু ও চারু শিল্পের বিবরণ
পৃষ্ঠা নং ৩১-৬৯

চতুর্থ অধ্যায়:
৫.১ আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) কারু ও চারু শিল্পের পরিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা
পৃষ্ঠা নং ৭০-৯৪

পঞ্চম অধ্যায়:
৬.১ উপসংহার
পৃষ্ঠা নং ৯৫-১০৭

চিত্রমালা পৃষ্ঠা নং ১০৮-২২৭
পরিশিষ্ট--১(সারণী) পৃষ্ঠা নং ২২৮
পরিশিষ্ট-২ (ফিল্ডওয়ার্কের সারসংক্ষেপ) পৃষ্ঠা নং ২২৯-২৪২
গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠা নং ২৪৩-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীর একেকটি স্থান, স্থানের ভূগোল, গঠন প্রকৃতি, তার মানুষ, ঐ মানুষের জীবনাচার, খাদ্যাভাস, চিন্তা, আচার-আচরণ ও পোশাক-আশাক ভিন্ন ও বিচিত্র। সর্বোপরি এক স্থান থেকে অন্য স্থানের মানুষের জীবন-সংস্কৃতি আলাদা, বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। আর এই ভূ-ভাগের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকা বিশেষভাবে আলাদা এবং ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানকার মানুষের জীবন ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ খাদ্যাভাস যেমন ভিন্নআঙ্গিকের তেমনি জাকজমকপূর্ণ ও রঙিন। আজকের আধুনিক বিশ্বের কর্মযজ্ঞ ও রঙিন চেহারার অনেকখানিই আফ্রিকা ও এশিয়ার সংস্কৃতি থেকে এসেছে। আর এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারত উপমহাদেশ বৈচিত্র্য বৈভবে বেশ সমৃদ্ধ। এই ভারত উপমহাদেশে নানা বর্ণ ও নানা জাতির মানুষ বসবাস করে। ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর দু'টি দেশ স্বাধীন হয় পাকিস্তান ও ভারত । এরপর রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। পাশের দেশ ভারত ও আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে নানা ভাষা, নানা গোত্রের-বর্ণের মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে আছে নানান জাতি, উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী কিংবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী । এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা একটি স্বতন্ত্র জীবন সংস্কৃতি ও আচরণের দ্বারা পরিচালিত। তাদের জীবনযাপন প্রণালী, খাদ্যাভাস, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরবাড়ি, বাসস্থান, নৃত্যগীত সবই বিচিত্র ও ভিন্নতর। বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা উপজাতির বসবাস আছে। কেউ কেউ তাদেরকে আদিবাসী বলছে।

আমি যখন এই অভিসন্দর্ভের কাজ শুরু করি তখন বাংলাদেশের এই নৃ-গোষ্ঠীগুলিকে উপজাতি, আদিবাসী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হত বা আলোচনা করা হত, সে কারণে এই অভিসন্দর্ভে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহার আছে । তখন এই শব্দগুলোর ব্যবহারের ব্যাপারে কোনো নীতিমালা বা আইন ছিল না। সরকার ইতিহাস বিবেচনা করে ও যুক্তির আলোকে বিচার করে এই সকল নৃ-গোষ্ঠীগুলিকেকে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসাবে আখ্যায়িত করে আইন প্রণয়ন করেছে। এই অভিসন্দর্ভে 'আদিবাসী' বা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে তার পরও ইতিহাস বিচারে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' শব্দটি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। নিম্নে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনাও করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলতে বুঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মূলত সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সম-জাতীয় সংস্কৃতিই আদিবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ এরা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক একক।[১] আদিবাসী সংস্কৃতি শব্দ, আদি অর্থ মূল, বাসী অর্থ অধিবাসী। ইংরেজি Aborigine শব্দের অনুবাদ হিসাবে আদিবাসী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত। ইংরেজি এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। যার অর্থ আদিকাল থেকে[২] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা আদিবাসী নয়। আদিবাসী অর্থ যদি মূল অধিবাসী বা মূল বাসিন্দা ধরা হয় তাহলেও এরা এখানকার মূল আধিবাসী নয়, অর্থাৎ তারা আদিবাসী নয়। পূর্বের সব ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, এই নৃ-গোষ্ঠীগুলি ১৫ শতক বা তারও কিছু আগে বা পরে এই দেশে বিভিন্ন কারণে এসেছে। যেমন সাঁওতালরা ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে এসেছে।[৩] ১৮৮৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দিলে সাঁওতাল পরগনায় বসবাসরত আদিবাসীরা বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী জেলায়, বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। আবার অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী হাজং বা গারোরা আসামের অধিবাসী ছিল বলে E.T. Dalton-এর লেখায় পাওয়া যায়।[৪] গারোরা প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির অন্তর্ভূক্ত। কর্নেল ফ্রেইরির মতে চাকমারা ব্রহ্মদেশের অধিবাসী ছিল।[৫] চাকমা কথাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং তা বোঝানোর জন্য স্যার রিজলীর সাক বা সেক জাতির তত্ত্ব থেকে জানা যায়, Tsak বা Thek কথাটি বার্মিজ। মণিপুরীরা ১৭৬৫ সাল থেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে।[৬] বম নৃ-গোষ্ঠীরা চীন বা ব্রহ্মদেশের পর্বত এলাকা থেকে এসেছে। তারাও ১৭ শ শতকে এদেশে এসেছে। ত্রিপুরারা বসবাস করতো আসামের পাতকোই পার্বত্যভূমিতে তারা বোডো নৃ-গোষ্ঠীর শাখাভূক্ত, এরা ১৬ শ' শতাব্দীর পর এই দেশে এসেছে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নৃতত্ত্ববিদদের মতে উপমহাদেশের আদিম অধিবাসী মাত্রই বাইরে থেকে এখানে আগমন করেছে এবং ভাষাতত্ত্ববিদরাও বিভিন্ন আদিম জাতির ভাষা বিশ্লেষণ করে এ কথার সমর্থন জানিয়েছেন।[৭] নৃতত্ত্ববিদ আব্দুস সাত্তারসহ অনেক লেখক তাদের লেখা বইয়ে বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এইসব নৃ-গোষ্ঠীরা আমাদের দেশের ভূমিজ সন্তান নয়।

মূল অধিবাসী অর্থে যদি আদিবাসী সংজ্ঞা দেই তাহলে বিতর্ক আসতে পারে বৈকি। কারণ তারাই কি এই অঞ্চলের আদি বসবাসকারী? অধিকাংশ গবেষকদের মতে তিন শ' থেকে চার শ' বছরের মধ্যে তারা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদেশ থেকে এদেশে এসেছে। ফলে আদি অর্থ মূল আর বাসী অর্থ অধিবাসী, এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের এই নৃ-গোষ্ঠীদেরকে আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা যায় না। যেহেতু তারা এ অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী নয়। বর্তমান সরকার সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ও সম্প্রদায়ের মানুষের সম-উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে।[৮] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বা আদিবাসীদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলো সভ্যতার বিকাশের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ আইনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলির মধ্যে আছে : (১) "নৃ-তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে। (২) কৃতী ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করা হবে (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিল্পীদের)। (৩) এই আইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা ও তাদের মূল স্রোতে আনার জন্য বেশকিছু প্রদক্ষেপ এ আইনে আছে। এ আইনে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উপজাতি শব্দ ব্যবহার না করে তাদেরকে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" হিসাবে উল্লেখ করা হবে। এর অর্থ করা হয়েছে তফসিলে উল্লিখিত বিভিন্ন আদিবাসী তথা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণ'।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি বা আদিবাসী পৃথিবীর আনুমানিক ৫০টি দেশে রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটি উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপমালায় পলিনেশিয়রা এবং পশ্চিম অঞ্চলের দ্বীপমালায় মেলানেশিয়রা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে সেখানকার আদি অধিবাসীরা, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর অঞ্চলে এস্‌কিমোরা, আফ্রিকার বানটু, হটেনটট ও বুশম্যান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবে এদের সাথে আমাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের কারুশিল্প ও চারুশিল্পের বেশ পার্থক্য রয়েছে, যেমন– অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবরজিন্সরা,তারা অস্ট্রেলিয়ার মূল বা আদী অধিবাসী, তাদের জীবনযাপনে আদিবাসীদের ছাপ সুস্পষ্ট। তাদের কারুশিল্প ও চিত্রকলায় আমরা দেখতে পাই– সাপ, কচ্ছপ, লতাপাতা, পাখি, মাছ, কুমির, ক্যাঙ্গারু, হাঁস ইত্যাদি মোটিফের ব্যবহার।[৯] তাদের দেহ, দেহের ব্যবহৃত উল্কি বা রং, তাদের আচার-অনুষ্ঠান এখনো আদিবাসীর ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনযাপন পদ্ধতি, কারুশিল্প ও চিত্রকলা তেমন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারা মূল অধিবাসী নয়, তাদের জীবনাচরণে, সংস্কৃতিতে ও শিল্পে ঐ আদিবাসী জীবনের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া অন্যান্য যুক্তিগুলি হল–

নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠী প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ১৬ই মার্চ বিবৃতি দেন,

> "আমরা হাজার বছরের ঐতিহ্যের জাতি, আমাদের এখানে উপনিবেশিক শাসন ছিল না। এমনকি মধ্যযুগেও না। তাই অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় যে অর্থে আদিবাসী বুঝায় আমাদের এখানে উপজাতিরা তেমন নয়। অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকায় ঐপনিবেশিকরা আদিবাসীদের হটিয়ে রাজত্ব দখল করেছিল।"[১০]

এখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদেরকে হটিয়ে বাঙালিরা আসে নি বরং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা তিন-চার শ' বছরের মধ্যে এদেশে এসেছে। তাহলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরাই এদেশে অভিবাসনকারী। তাই ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকত্বের মাধ্যমেই তাদের (এদেশের উপজাতিদের) স্বীকৃতি দেওয়া হবে ।[১১] এছাড়া indigenous বা aborigine অর্থ কেউ কেউ আদিবাসী করেছেন। কিন্তু এ শব্দটি আমাদের দেশে আদিবাসী হিসাবে প্রযোজ্য নয়। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম এ বিষয়ে বলেন,

> "বাংলাদেশের অখণ্ড মানচিত্রে বসবাসকারী বাঙালিসহ প্রায় অর্ধশতাধিক ক্ষুদ্রগোত্রজ নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কে আদিবাসী কে নয় এ প্রশ্ন অবান্তর। বাংলাদেশে বাঙালি থেকে পৃথক করে বোঝাতে সব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে এক নামে আদিবাসী বলা হচ্ছে। এই পার্থক্য ইংরেজী ভাষ্যে indigenous বা aborigine কোনো অর্থেই দাঁড়ায় না, আমেরিকায় অভিবাসনকারী ইংরেজ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে বোঝাতে রেড ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীকে "aborigine" আদিবাসী বলা অর্থপূর্ণ।"[১২]

উল্লিখিত দু'টি বক্তব্যই তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ। অতএব, এদেরকে উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী বা পাহাড়ী জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই অভিসন্দর্ভে আলোচনার সুবিধার্থে এই নৃ-জনগোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করেছি এবং এ দু'টি শব্দকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছি ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সংসদের এই আইনের (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, এপ্রিল ২০১০) গেজেটে পৃষ্ঠা নং- ১৪তে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং খুমী, লুসাই, কোচ, সাঁওতাল, ডালু, উসাই (উসুই), রাখাইন, মণিপুরী, গারো, হাজং, খাসিয়া, মং, ওরাও, বর্মন, পাহাড়ী, মালপাহাড়ী, মুণ্ডা ও কোল।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমান করা হয়, বাংলাদেশে প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই শতাংশের মতো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। নৃ-তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় ও মোঙ্গলীয় উৎসের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বাংলাদেশের উত্তরাংশের, বিশেষ করে রাজশাহী জেলার আদিবাসীরা বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা বিভিন্ন জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত। যেমন— সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজেয়াড়, মুণ্ডারী, মুসহর, মালো, মালপাহাড়ী, মাহালী, ভূমিজ তুরী প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে এছাড়াও রয়েছে মুণ্ডা, পলিয়া,পাহাং, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতি তবে এদের মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যায় সর্বাধিক। এদের ইতিহাস, কৃষ্টি অন্যান্যদের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ। ভাষাগত বিচারে এরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে আছে— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখো, চাক, বম, লুসাই, খুমী, খিয়াং এরা মোঙ্গলীয় উৎসের মানুষ। সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার এলাকায় মণিপুরী ও খাসিয়াদের বাস। শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে হাজং ও গারোদের বসবাস। বাংলাদেশের অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ৬টি জাতিকে বেছে নিয়েছি আমার গবেষণা কার্যের জন্য। ৬টি জাতিসত্ত্বা হল– ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম । চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং কক্সবাজার জেলা ছাড়া ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিলস ও অরুণাচলে বসবাস করে। আমার গবেষণা কার্যের চাকমা এলাকা— শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

ত্রিপুরারা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ছাড়াও ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে বসবাস করে। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী এলাকা আমার বিবেচ্য এলাকা।

বম নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস চীনের চীনলিং পর্বতমালা এছাড়া বর্তমানে এরা বার্মার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের বমদের বসবাস বান্দরবানের রুমা, থানচি ইত্যাদি এলাকাতে। তবে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় পাংখোয়াদের সঙ্গে কিছু বমদেরও দেখা যায়। মূলত বান্দরবানের বমরাই ছিল আমার কাজের আওতাভুক্ত।

বর্তমানে মণিপুরীরা ভারত, বার্মা ও বাংলাদেশের মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ এর সমতল ভূমিতে বসবাস করে। শুধুমাত্র সিলেট এলাকা এখানে কাজ করার জন্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গারোরা ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বসবাস করে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইলে বসবাস করে। এছাড়া বৃহত্তর সিলেট জেলায় এদের বসবাস দেখা যায়। এক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের মধুপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য। আর সাওতালরা রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ,নীলফামারী ,দিনাজপুর জেলায় বসবাস করে। ভারতের সাঁওতাল পরগনায় তাদের বসবাস আছে। এখানে শুধুমাত্র রাজশাহীর কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে সাঁওতালদের উপর কাজ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

১. আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু ও চারু শিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিশেষ করে প্রধান কারুশিল্পগুলোকে চিহ্নিত করা, ও বিশ্লেষণ করা।

২. সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা।

৩. বাঙালি ও আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী একে অপরের মধ্যে মিশ্রণকে, প্রভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা।

৪. আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের বিলুপ্তির কারণ চিহ্নিত করা।

৫. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের সুসংগঠিত রূপকে পরিচিত করা, ধরে রাখা ও সংরক্ষণ করা।

৬. বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সর্বোপরি বাংলাদেশের কারুশিল্পের প্রাঙ্গণকে সমৃদ্ধ করা।

৭. নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কিছু উপায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করা এবং এসব ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

৮. এ গবেষণা ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ বাতলে দেবে।

৯. বর্তমান সময়ের দাবীকে প্রকাশ করবে অর্থাৎ বর্তমানে সারাবিশ্বে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের যে সন্ধান করা হচ্ছে , এই গবেষণা এর মধ্যে বাংলাদেশকেও সম্পৃক্ত করবে।

গবেষণার নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও নির্ধারিত এলাকা : আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছয়টি নৃ-গোষ্ঠীকে নেওয়া হয়েছে– ত্রিপুরা, চাকমা, বম, গারো, সাওতাল ও মণিপুরি। ত্রিপুরা, চাকমা, বম এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। গারোরা বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী, সাওতালরা বৃহত্তর রাজশাহীর অধিবাসী ও মণিপুরিরা

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলার অধিবাসী। এই ছয়টি নৃ-গোষ্ঠী গবেষণার আওতাভুক্ত করার অর্থ হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ নৃ-গোষ্ঠী এলাকা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাওয়া। এ ছয়টি জনগোষ্ঠী কেন বেছে নেওয়া হয়েছে?– কারণ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল শেরপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল অঞ্চলের প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো গারো। এরপর উত্তর দিকের রংপুর, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ অঞ্চলের প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো সাঁওতাল। আর পূর্ব অঞ্চল মৌলভীবাজার, সিলেট এলাকার প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো মণিপুরী। এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা, ত্রিপুরা ও বান্দরবনের ভেতরে চাক, মুরং, লুসাই, খেয়াং, বম এদের মধ্যে বমদেরকেই গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আর বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের (খুলনা) তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস না থাকার কারণে এ অঞ্চলের কোনো গোষ্ঠী এ গবেষণার আওতাভুক্ত হয় নি। আর এভাবে প্রধান ছয়টি নৃ-গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে পুরো বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠী এলাকার প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপরও প্রত্যেক আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এলাকায় কাজ করার জন্যে এলাকাগুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন গবেষণার জন্য ত্রিপুরা এলাকাগুলি হল– ১. কিল্লাপাড়, বালুখালী, সদর, রাঙ্গামাটি। ২. কালিন্দিপুর, সদর, রাঙ্গামাটি। ৩. কালিঘাটা, সদর, বান্দরবন। ৪. নিউ গুলশান এলাকা, সদর, বান্দরবন।

চাকমা এলাকাগুলি হল– ১. কলেজ রোড, সদর, খাগড়াছড়ি। ২. মহাজনপাড়া, সদর, খাগড়াছড়ি। ৩.নারাণখায়া, সদর, খাগড়াছড়ি। ৪.বাবুছড়া, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি। ৫. ফুজগাঙ, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি। ৬. বনরূপা, ফরেস্ট কলোনী, রাঙ্গামাটি।

বম এলাকাগুলি হল– ১. লাইমিপাড়া, সদর, বান্দরবন। ২. ফারুকপাড়া, সদর, বান্দরবন। ৩. শৈলপ্রপাত এলাকা, সদর, বান্দরবন।

গারো এলাকাগুলি হল– ১. তেলকি, জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল। ২. চুনিয়াগ্রাম, মধুপুর, টাঙ্গাইল। ৩. পঁচিশমাইল, জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল। ৪. পীরগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

মণিপুরী এলাকাগুলি হল– ১. মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জ, সদর, সিলেট। ২. সুবীদবাজার, সদর, সিলেট। ৩. লামাবাজার, সদর, সিলেট।

সাঁওতাল এলাকাগুলি হল– ১. দামকুড়া, পবা, রাজশাহী। ২. ফুলবাড়ী, কাজমা, কাকনহাট, গোদাগাড়ি, রাজশাহী। ৩.কয়েলদাড়া, খ্রীষ্টানপাড়া, সপুরা,সদর ,রাজশাহী। ৪. লাখড়াদি, গোদাগাড়ি, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। তাদের জাতিগত সমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং নানাবিধ বৈষম্য ও অধিকারগত সমস্যা নিয়ে কাজ হয়েছে। তাদের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়েও বেশকিছু কাজ হয়েছে, তবে তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হল– কারুশিল্প, বস্ত্রশিল্পের বুনন ও রঙের বিচিত্রভঙ্গি, বিশেষ করে তাদের প্রকৃতি নির্ভর কারুকলার যে অনুষঙ্গ রয়েছে তার উপর কোনো গবেষণামূলক কাজ হয় নি। যেমন– লাউ দ্বারা নির্মিত পানিপাত্র, বাঁশ দ্বারা নির্মিত হুক্কা বা বাঁশ ও বেতের তৈরি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ইত্যাদি। এছাড়া আছে পরিধেয়বস্ত্র, ব্যবহার্য অলংকার, বাড়িঘরের গঠন ও নকশা, শরীরে আঁকা উলকি। তাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই অংশটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। একে অপরকে সমৃদ্ধ করা তথা সমগ্র শিল্পজগতকে সমৃদ্ধ করার জন্য এগুলির গবেষণা করা প্রয়োজন।

এইসব ভিন্ন স্পর্ধিত বিষয়গুলি গবেষণার মাধ্যমে বের হয়ে আসলে তা শুধু শিল্পকলা, কারুশিল্প, চারুশিল্প ও সংস্কৃতিতে নতুন দিগন্তই উন্মেচন করবে না বরং এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালি একে অপরকে জানা-বোঝার সুযোগ বাড়বে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় হবে, বাড়বে আন্তসর্ম্পক। আর এ সর্ম্পকের সেতুবন্ধনের একটি ধাপ হতে পারে "বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (ত্রিপুরা, মনিপুরি, চাকমা, সাওতাল, গারো ও বম) কারু ও চারু শিল্প" এই অভিসন্দর্ভটি। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সন্ধান করা হচ্ছে সেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হতে পারে বাংলাদেশের আপন সংস্কৃতি। আর এ কারণেই এই গবেষণাকর্মটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু : আগেই বলা হয়েছে, মূলত এই অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের প্রকৃতি নির্ভর কারু ও চারু শিল্প । (এই অভিসন্দর্ভ মূলত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের উপর নির্ভর করে রচনা করা হয়েছে, যেহেতু চারুশিল্পে তাদের প্রকাশ এখনো উল্লেখযোগ্য নয়, তবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চারুশিল্পেরও সামান্য বর্ণনা থাকবে।) যেমন প্রকৃতি নির্ভরভাবে গঠিত, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, চাকমাদের ঘর ও বুননশিল্প, অলংকার, বাঁশের দ্রব্য, চিত্রকলা, ত্রিপুরাদের বুননশিল্প ও অলংকার, বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র, বমদের বস্ত্রশিল্প, গারোদের ঘর, ভাস্কর্য এবং বাঁশ ও মাটির নির্মিত ব্যবহার্য দ্রব্য, মণিপুরীদের তাঁতবস্ত্র ও অলংকার শিল্প, সাঁওতালদের ঘরের নকশা ও হাতিয়ার এবং বাঁশ নির্মিত দ্রব্য ইত্যাদি এ গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি :

গবেষণা কাজ অর্থবহ করতে কয়েকটি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এটি করা হয়েছে।

১ এটি ফিল্ড ওয়ার্ক বেজড গবেষণা।

২ সরেজমিনে গিয়ে কারু ও চারু শিল্প দেখা, আলোচনা করা, ছবি নেওয়া এবং সংরক্ষণশালায় গিয়ে কারু ও চারু শিল্পগুলোর পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা, তথ্য সন্নিবেশ করা।

৩ প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪ কিছু আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ইনডেপথ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা।

৫ সাধারণ আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে থাকা, সরেজমিনে কাজ করা, তাদের জীবন, সংস্কৃতি, দ্রব্যাদি, বস্ত্রশিল্প পর্যবেক্ষণ করা এবং তা থেকে তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

৬ গ্রুপ আলোচনা, প্রশ্ন করা এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ করা।

এই অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক, জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সমন্বয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অবজারভেশন পদ্ধতিতে গুণগত রিসার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ এখানে বাস্তব বিষয়গুলো দেখে মূল ফাইন্ডিংস-গুলো বের করতে হয়।

প্রাথমিক তথ্যের উৎস : আদিবাসীদের গ্রামে, বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে থাকা, সম্পর্ক গড়ে তোলা, সরাসরি বাস্তব কারুশিল্প দেখা, অতীত ও বর্তমানের চারুশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে জানা, তাদের নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর থেকে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা। প্রশ্নমালার মাধ্যমে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি, তাদের বর্তমান সমস্যা, তাদের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে ও সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার দ্বিতীয় উৎস : দ্বিতীয় উৎসের মধ্যে আছে, আগের সমস্ত লিটারেচার রিভিউ করা। পুরানো ও বর্তমান সরকারি-বেসরকারি গবেষণাপত্র, সেনসাসরিপোর্ট, বই, আর্টিক্যাল, জার্নাল, অনলাইন ডকুমেন্টগুলো স্টাডি করা।

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধতা :

১। আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা সকলের সাথে খোলা মনে কথা বলে না। এছাড়া তাদের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতাটা অনেক বেশী। তারা অনেককেই বিশ্বাস করেন না। কাজেই তথ্য পাওয়া অনেক সময়ই কঠিন হয়ে ওঠে।

২। তাদের নিজেদের ঐতিহ্য সমন্ধে (নিজেদের)অনেকেরই ধারণা নেই এবং তাদের মধ্যে একটা অহংকারী ভাব আছে, ফলে তাদের সহযোগিতা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না।

৩। পূর্বের অনেক গবেষণার ফলাফল ও তার কার্যকারিতা সর্ম্পকে তাদের সন্দেহ থাকায় অনেক সময়-অনেক বিষয়ে তাদের কাছ থেকে যথাযথ তথ্য পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এই গবেষণাকর্ম ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত :

ভূমিকা এখানে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । এখানে ভূমিকাসহ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আছে আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাসসহ ভাষা, ধর্ম, জনসংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, পেশা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে শিল্পকলা, কারুশিল্প এবং আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এখানে ছয়টি নৃ-গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান কারু ও চারু শিল্প এবং কারু ও চারুশিল্পের রং, মাধ্যম, ডিজাইন, মোটিফ ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কারু ও চারুশিল্পের বর্তমান অবস্থা, পরিবর্তিত রূপ, পরিবর্তনের কারণ এবং তাদের বর্তমান কারুশিল্পের রং, মাধ্যম, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, ডিজাইন ও মোটিফ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের উপর বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব এবং বাঙালিদের উপর আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কারুশিল্পের প্রভাব ও আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে তাদের কারুশিল্পের একে অপরের উপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে উপসংহার ও এই গবেষণার সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০০৭, ঢাকা, ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা-নং- XIII

২ উদ্ধৃত, সুলতানা আইরিন পারভীন, *বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের পরিবর্তন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১

৩ Kazi Tobarak Hossain, *The Santals of Rajshahi : A study in social and cultural change*, Mahmud Shah Quarashi (ed.) : *Tribal Culture in Bangladesh*, IBS, RU, 1984, Page-158

৪ উদ্ধৃত, আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, ২০০৭, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা,পৃষ্ঠা-২২৭

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা -৩৩

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা -৩৬

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা - ৩৫

৮ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেট থেকে উদ্ধৃত (এপ্রিল ২০১০-এ প্রকাশিত)* , পৃষ্ঠা-৩

৯ Wally Caruana, *ABORIGINAL ART*, Thames And Hudsom, New York 1993, page no- 30,31

১০ আবেদ খান (সম্পাদিত), *কালের কণ্ঠ*, ১৬ই মার্চ ২০১১, পৃষ্ঠা -১

১১ *প্রাগুক্ত*

১২ আবেদ খান (সম্পাদিত), *কালের কণ্ঠ*, অধ্যাপক ড. খুরশিদা বেগম ' *আদিবাসী নাকি ক্ষুদ্র গোত্রজ নৃ-গোষ্ঠী?*' (উপসম্পাদকীয়), ১০ই জানুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপুরা, সাওতাল, গারো, মনিপুরি, বম ও চাকমা আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস

ভূমিকাতে আলোচনা করা হয়েছে যে, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারা। পাহাড় -পর্বত ও অরণ্যে ভরা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হলো দেশের বৃহৎ ক্ষুদ্র নৃ -গোষ্ঠী অঞ্চল, এই অঞ্চল বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, রাখাইন, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, খুমী, বম, ম্রো, লুসাই ও চাকদের বসবাস। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছয়টি নৃ-গোষ্ঠী ত্রিপুরা, সাওতাল, গারো, মনিপুরি, বম ও চাকমা – এদের নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস অথার্ৎ নৃ-গোষ্ঠীগতভাবে তাদের পরিচয়, তাদের দেহের ধরণ, তাদের উৎপত্তিস্থান, বর্তমানে তাদের অবস্থান, তাদের সাংস্কৃতিক ও তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির ইতিহাসসহ ভাষা, ধর্ম, জনসংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, পেশা ইত্যাদি আলোচিত হল।

চাকমা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস : চাকমা আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আছে এক লম্বা ইতিহাস। তারা আসলে বার্মার অধিবাসী , দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারত বর্ষের পূর্ব দিকে চাগমা নামক একটি রাজ্য ছিল[১], তাদের রাজার নাম ছিল মুঊন তানি। চাকমারা ১৫৪৪-৪৬ সালের দিকে আরাকানের উত্তর দিক থেকে এসে চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিল বলে জানা যায়। রামু বাজারের নিকটস্থ চাকমারকূল নামক স্থানটি আজও ঐ সময়কার স্মৃতি হয়ে আছে।[২] তবে কেউ কেউ বলেছেন, আরাকানী রাজার দ্বারা চাকমারা ১৪১৮ সালে বিতাড়িত হয় এবং চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।[৩] চাকমারা কাগজে কলমে নামের শেষে চাকমা লিখে থাকলেও তারা নিজেদেরকে বলে 'চাঙমা'।[৪] আর বর্মী এবং রাখাইন বা আরাকানী লেখকেরা চাকমাদের 'সাক' (Sak) বা 'থাক' (Thak) কিংবা 'থেক' (Thek) বলেন।[৫] চাকমারা বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ -গোষ্ঠী।বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও কক্সবাজার জেলা ব্যতিত ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিলস্ ও অরুণাচলে বাস করে। বার্মার আরাকান রাজ্যেও তাদের একটি শাখা আছে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

মগভাষায় 'শাক্য' অর্থ 'সাক' আর যারা রাজবংশসম্ভূত তাদেরকে বলা হয় 'সাকমাং' ('মা' রাজা অর্থে)। এই 'সাকমাং' থেকে 'চাকমা'। এই বিশেষ কথাটির উপর চাকমারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। চাকমাদের এই নিজস্ব মতামত এবং মগদের এই ভাষাগত অর্থে ও পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে তাঁরা শাক্যবংশসম্ভূত মহামুনি বুদ্ধের বংশধর।[৭] নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। ফ্রান্সিস বুকানন চাকমাদেরকে ফর্সা বলেছেন। চাকমাদের দেহে ৮৪.৫% মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চাকমাদের দেহ প্রায় কেশহীন এবং উচ্চতা মাঝারি ধরনের ,মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধার পাতলা, চুল সোজা, চোখের মণি ও চুলের রং কালো, দাঁড়িগোঁফ কম । পুরুষদের গড় উচ্চতা ৫'-৬" এবং নারীদের ৫'-৪"।[৮] ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী চাকমাদের জনসংখ্যা ২,৩৯,৪১৭ জন। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাদের নিজস্ব ভাষা ও অক্ষর আছে। চাকমা এবং মারমাদের লেখার জন্য নিজস্ব বর্ণমালা আছে । তবে এগুলি দিয়ে কেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো তথ্যনির্ভর ইতিহাস লিখেছে কিনা জানা যায় নি।[৯] চাকমাদের প্রধান পেশা জুম চাষ, ব্যবসা ও চাকুরী। বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভাল।

বম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস : সম্ভবত এককালে তারা মূল চীনের চীনলিং পর্বতমালা এলাকার অধিবাসী ছিল। তারা ঐ পর্বতমালা থেকে এসে পরবর্তীকালে চিনদুইন ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করে।[১০] তবে কেউ কেউ বলেন বমদের আদিবাসভূমি ছিল ব্রহ্মদেশে অবস্থিত চীন-পর্বত এলাকার দক্ষিণে তসন ও উত্তরে জৌ উপত্যকাভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে। বমরা সেখানকার খুমী উপজাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ব সীমান্ত এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। যে কোনো কারণেই হোক, এরা যে ব্রহ্মদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। বমরা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র নৃ -গোষ্ঠী । বার্মাতে বমদের বসবাস আছে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে বমরা কুকিদের অন্তর্ভূক্ত জাতি। এরা আদিমঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত মানুষ। কারণ এদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে এই প্রমাণ আছে। এদের সামাজিক রীতিনীতির কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা নৃতত্ত্ববিদদের মতে, এরা ব্রহ্মদেশের শান উপজাতিদের অন্তর্ভূক্ত ভিন্ন শাখা মাত্র। যাহোক, এ নিয়েও দ্বিমতের অবকাশ আছে । এদের রক্তধারায় যে আদি-মঙ্গোলীয়গোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহিত তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত ভৌগোলিক ব্যবধানের ফলে তারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আছে। চীন-পর্বত অঞ্চলে লুসাইরা এককালে প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং বমদের উপর তারা যথেষ্ট কর্তৃত্ব করে। কালক্রমে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই অনুমান করা চলে যে এরা মূলত লুসাইদের অন্তর্ভূক্ত জাতি। তাদের নাক চেপ্টা, দাঁড়ি-গোফ অল্প, চোখের মণি কালো এবং মাথার চুল খাড়া ও মোটা।বমদের পুরুষ ও মহিলা উভয়েই পরিশ্রমী। কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়েই নয়, লুসাইদের সঙ্গে দৈহিক উচ্চতা মুখের গড়ন, মাথার আকৃতি ও দেহের বর্ণ ইত্যাদির দিক থেকেও বমদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। বম উপজাতীয় লোকেরা অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্বাস করত। অতীতে কুকি চিন উপজাতিরা মৃত দেহকে কবর দিত।[১১] পাঙ্খো ও বমদের মতে পত্যেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। এই পত্যেন লুসাইদের পথিয়ান-এর অনুরূপ। তিনি পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থান করেন এবং দিনশেষে সূর্য তাঁর ঘরেই আশ্রয় নেয় বলে পাঙ্খো ও বমরা বিশ্বাস করে।

বম শব্দের অর্থ বন্ধন। মি. লালনাগ বোমের লেখাতে পাওয়া যায়, বম শব্দের অর্থ জাতি। পূর্বে তারা নিজেদেরকে লাই বা লাইমি নামেও পরিচয় দিত। [১২]অতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি জনগোষ্ঠীর লোকেরা যাদের জীবন প্রবাহ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠান নৃত্যগীত প্রায় একই রকম, তারা নিজেদেরকে বম নামে আখ্যায়িত করতেন। এভাবে এ জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয় বম।নৃতত্ত্ববিদও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এ উপমহাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মাত্রই বাইরে থেকে আগমন করেছে। । বমরা ভূমিজ সন্তান নয়।[১৩] ভাষাতত্ত্ববিদরাও বিভিন্ন আদিম জাতির ভাষা বিশ্লেষণ করে একই কথার সমর্থন জানিয়েছেন ।[১৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামের বোমাং সার্কেলভুক্ত বান্দরবন জেলায় এদেরকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। পাঙ্খো ও বম একই জাতির অন্তর্ভূক্ত দু'টি শাখা মাত্র। দুই ভাই থেকে এদের বংশোদ্ভব ঘটেছে। তাছাড়া তাদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতিতেও যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়।। বম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে। ইদানীং রোমান বর্ণমালাকে তারা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে।বমরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করলেও তাদের পূজা-পার্বণ ও সামাজিক রীতিনীতিতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তবে এই পার্থক্যের জন্য তাদেরকে জড়বাদী বলা চলে না।বর্তমানে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, উপাসনার গানসহ তাদের সামাজিক আইনের গ্রন্থ প্রভৃতি নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে বান্দরবন জেলার রুমা, থানচি, রুয়াংছড়ি ও সদর থানা এবং রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি থানায় মোট ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করে। বমরা নিজেদেরকে বম বলে পরিচয় দিলেও অন্যান্য আদিবাসীরা বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

কুকি নামেও অভিহিত করেন। ১৯৯১সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে বমদের জনসংখ্যা ৬,৯৭৮ জন।

বাংলাদেশের বম জনগোষ্ঠী, তাদের অবস্থান ও সংখ্যা : [১৫]

নৃ-গোষ্ঠী	জেলা	জনসংখ্যা	ধর্ম	মন্তব্য
বম	বান্দরবন	৬,৯৭৮	খ্রীষ্টান	

বম ভাষার ব্যবহার শুধু এ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এ ভাষার ব্যবহার ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কোনো কোনো এলাকায় আছে এবং মিয়ানমারের চীন হিলচে বেশির ভাগ লোকের মধ্যেও দেখা যায়। পুরুষ প্রধান সমাজ হিসেবে তাদের পরিবারের দায় দায়িত্ব মহিলাদের চেয়ে পুরুষের বেশি। বিয়ের পর পণের নামে বম সমাজে আজও যে প্রথা প্রচলিত আছে, তার অর্থও যথেষ্ট। বিয়ের পণের অংশীদার হবেন মা, বাবা, আপন ভাই, যদি আপন ভাই না থাকে তাহলে চাচাতো ভাই না হয় নিজের গোত্রের ভাই, এছাড়া পিসিমা, আপন মামাও বিয়ের পণ পাবার অধিকার রাখেন। বিয়ের পণ যাদের ভাগে পড়ে তাদের কিন্তু দায়িত্বও আছে। যদি কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাদের বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, তা হলে মেয়েটি মা-বাবার বাড়িতে চলে গিয়ে আশ্রয় পাবেন। কারণ তারা তার বিয়ের পণ ভোগ করেন, তাই ভাইয়ের বাড়িতে থাকার অধিকার তার আছে।বম সমাজে পুরোহিত বা ধর্মযাজকরা বিবাহের কাজ সম্পাদন করে । সমাজে যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে তারা বিয়ে পড়ান। পুরোহিত বা ধর্মযাজকরা সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি, সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবে তারা স্বীকৃত। বম সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করতে পারে না। মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করতেও পারে না।

অর্থনৈতিক জীবনে বম জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা জুমচাষ ও ব্যবসা । তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়।

সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস : ভারতের সাঁওতাল পরগনায় তাদের বসবাস আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলায় বসবাস করে ।মনে করা হয় সাঁওতালদের নাম সাঁওতাল পরগুনার অধিবাসী হিসাবে হয়েছে। সূতার থেকে সাঁওতাল কথার উদ্ভব হয়েছে।[১৬] ১৭৯৮ এর পূর্বেই মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদেরকে বসবাস করতে দেখা যায়। এখান থেকে সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি বলে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করে। এদের নাক চেপ্টা, ঠোঁট মোটা, দেহের উচ্চতা মাঝারি ও চেহারা কালো।[১৭]এদেরকে অস্ট্রেলীয় মানবগোষ্ঠী বলে ধারণা করা হয়। অন্য উপজাতির মতো সাঁওতালরাও এদেশের আদিম আধিবাসী নয়। অনেক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ তাদেরকে অষ্ট্র–এশিয়াটিক জনগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করছেন। ১৯৯৮সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাওতালদের সংখ্যা ২০২৭৪৪ জন। এরা অষ্ট্রিক ভাষাভাষী।তবে সাঁওতালরা এ উপমহাদেশে অনেক আগে থেকে বসবাস করছে। একেবারে সঠিক সময় বলা কঠিন, তবে অনেকে অনেক রকম মতামত দিয়েছেন। বাংলাদেশে তাদের বসবাস বেশি দিনের নয়। বিখ্যাত লেখক হান্টার সাঁওতালরা পূর্ব দিক থেকে এসেছে বলে অভিমত দিয়েছেন, [১৮] তবে এই পূর্বাঞ্চল কোথায় তা বলা কঠিন। সাঁওতালরাও অবশ্য পূর্ব দিক থেকে এসেছে বলে মনে করে। তাদের আলাদা ধর্ম ও দর্শন রয়েছে। তারা বুঝাতে চাই তারা সূর্যদেবের দেশ থেকে এসেছে, কাজেই তাদের দেবতা হলো সূর্য। সাঁওতাল ভাষায় হড় শব্দের অর্থ হলো মানুষ, আর হড় হোপেন বলতে মানব সন্তান বুঝায়। তাদের পুরাতন গ্রন্থে কিছু কাহিনী পাওয়া যায় যেখানে মানব জাতীর উৎপত্তি ও বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সাঁওতাল গানে পাওয়া যায় তারা আগে কোথায় ছিল ,তার পর কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং পরে তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। পরেষনাথ পাহাড় নামে একটি পাহাড় আছে এটা জয়পি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এই পাহাড়-ই তাদের মারং বুড়ো। মারং বুড়ো হলো তাদের দেবতা। আর সাঁওতালদের চায়ে চম্পা রাজ্য হাজারিবাগ মালভূমির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।[১৯] এই এলাকায় তাদের আগেকার বসত ভূমি ছিল। ১৮৩৬ সালে বৃটিশ গভর্নর তাদের থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করে দেন।[২০]এখানে তারা ভালভাবেই বসবাস করছিল। তাদের জমিতে উৎপাদিত ফসলে তারা ভালভাবে জীবন যাপন করছিল। তবে পরে হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দ্বারা তারা জমি ও টাকা পয়সা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং চরম দূর্দশার মধ্যে পতিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। ঐ সময় তারা বণিক ও হিন্দু মাড়য়ারীদের হত্যা করতে থাকে। বৃটিশরা তখন সামরিক শাসন জারী করে এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রায় দশ হাজার নিরীহ সাঁওতালকে হত্যা করে। এই ঘটনার ফলে সাঁওতালরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ঐ সময় ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার থেকে এদেশে সাঁওতালরা এসেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। সাঁওতালরা দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে বেশি বসবাস করে। সাঁওতালদের পূর্ব-পুরুষরা এবং বর্তমান প্রজন্মও টোটেম বিশ্বাস করে। গাছ, পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদির নামে তাদের গোত্রের নাম করণ করা হয়, যেমন– মুর্মু হলো গাভী, মারান্ডি হলো ঘাস, সোরেন হলো যোদ্ধা, টুডু হলো বাদ্যকর, হাসদাক হলো বনহাস, পাউরিয়া হলো পায়রা,

Dhaka University Institutional Repository

চোরে হলো গিরগিটি, কিসসু হলো রাজা, ইত্যাদি নামে তাদের গোত্র আছে ও এগুলো এ সব বিশেষ অর্থ বহন করে ।[২১] ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীদের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে সাঁওতাল লোক-সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে অজস্র উপকথা, পুরাকাহিনী, প্রবাদ, ছড়া, লোকগীতি, বারমাসী, ধাঁধাঁ ও নাচ। আর এসবের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে আছে তাদের ব্যবহারিক জীবন এবং ধর্ম জীবন। আদিবাসীদের অধিকাংশ উৎসবই অনুষ্ঠিত হয় প্রকৃতিকে নিয়ে, ঋতুর বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর ধারাকে নির্ভর করে। সাঁওতালরা কৃষিনির্ভর জাতি, তাদের অর্থনীতিও কৃষিনির্ভর ।

মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস : E. T. Dalton এর বইয়ে মণিপুরীদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মণিপুরীরা নিজেদেরকে আদিবাসী হিসাবে দাবি করে না । তাদের উৎপত্তির প্রথম দিকে তারা আসাম রাজ্যের পাদদেশে আবস্থিত বরাক নদীর অববাহিকার পাতকই উপতক্যার অধিবাসী ছিল। মণিপুরীরা আগে মণিপুর রাজ্যে বসবাস করত। মণিপুর ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, রাজধানীর নাম ইম্ফল। বার্মার সীমান্ত ধরে অনেক খানি নিচু জায়গা জুড়ে ছিল মণিপুর রাজ্য। বাংলাদেশে মণিপুরীরা আঠারো শতকের শেষ দিকে রাজনৈতিক সংঘাতে পর্যদুস্ত হয়ে মণিপুর থেকে পালিয়ে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বসতি স্থাপন করে। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা প্রধান মণিপুরী অধ্যুাষিত অঞ্চল।মণির আলোকে আলোকিত জাতি হিসেবে মণিপুর, আর স্থানটির বেলায়ও মণির আলোকে আলোকিত নগর/মণিময় পুর/মণিদীপ্ত স্থান হিসেবে মণিপুর রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মণিপুরী' শব্দের অর্থ হলো মণির আলোকে আনন্দায়িত জাতি বা মণির আভায় আলোকিত জাতি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, তারা মঙ্গোলীয় মানব গোষ্ঠীর গোত্রভুক্ত। লেখক আব্দুস সাত্তারের বর্ণনায় পাওয়া যায় মেকলি দেশ পরে মণিপুর হিসাবে নামকরণ হয়[২২], এটি একটি স্থান যা গন্ধর্ব্য রাজ্য নামে পরিচিত ছিল,[২৩] এই অঞ্চল ছিল পার্বত্য এলাকাভুক্ত এবং এটা মুখলু নামেও পরিচিত ছিল। তারা টিবেটি বর্মণ শাখার লোক।[২৪] তাদের উপত্তি বিষয়ক কাহিনি হল, বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণ নৃত্যে বিভোর হয়ে ছিলেন তখন শিব এখানে অংশ গ্রহণ করতে চাইলে কৃষ্ণ শিবকে বারণ করেন। তবে শ্রী কৃষ্ণের বারন না শুনে শিব ছদ্মবেশে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং এই সঙ্গে পার্বতিও যোগদেন । এই এলাকাটি ছিল পাহাড় ঘেরা। ঐ অঞ্চলে কোন আলো ছিল না। ঐ সময় এই নৃত্য দেখে অনন্ত নাগ তার মণি দিয়ে আলো বিচ্ছুরণ করে এই এলাকা আলোকিত করেন। আর এর পর থেকে ঐ স্থানের অধিবাসীদেরকে মণিপুরী জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।বর্তমানে মণিপুরীরা বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বসবাস করে। ভারতের মণিপুরী রাজ্যে ও বার্মাতেও তাদের বসবাস দেখা যায়। এদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে একটি হলো মৈতে, আরেকটি হলো বিষ্ণুপ্রীয়া। মণিপুরীদের মধ্যে একটি অংশ মুসলমান এদেরকে পাঙন বলে। তারা দেখতে ফরসা, চোখ ছোট, দেহ মঙ্গোলীয় ধাচের, চুল খাড়া। তবে তাদের নাসিকা অতটা চাপানো নয়, বেশ উঁচু। মণিপুরী লোকেদের আপাদমস্তক দৈহিক গড়ন সুস্বাস্থ্যের , বলিষ্ঠতার পরিচায়ক,উচ্চতা মাঝারী।মণিপুরীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী ।তারা আখ, পাট, গম ইত্যাদি চাষ করে থাকে। পেশা হিসাবে কৃষির পরে তারা তাঁতী, কামার, স্বর্ণকার ও ব্যবসায়ী। মণিপুরীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি । মণিপুরীরা ইন্দো এরিয়ান ভাষাভাষী । ১৯৯৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মণিপুরীদের জনসংখ্যা ২৪৮৮২ জন।

গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস: গারো নামের পাহাড়ের নাম থেকে এখানকার আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের গারো নামে ডাকা হয় । গারো পাহাড়ের পাদদেশে, ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকয় গারো আবাসভূমি আছে । গারো সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত আচিক ও লামদানী গারো। গারো ভাষায় এদেরকে মান্দি বলা হয়। বর্তমানে প্রায় ৯৫% এর বেশী গারো খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে । গারোরা এখান কার আদিম অধিবাসী নয়।[২৫] তাদের ভ্রু ভারি, গায়ের রং ফর্সা, [২৬] গারোমশ, বিরল শ্মশ্রু , নাক চ্যাপ্টা ও প্রশস্থ, কপাল ক্ষুদ্রাকৃতি, কান বড়, ঠোঁট মোটা, মুখাকৃতি গোলাকার, রং ফর্সা (বা শ্যামলা), চুল কোঁকড়ানো। এসব লক্ষণ দেখে তাদের কে মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত বলা হয় । গারোদের একি গোত্রে বিয়ে হয় না। খাসিয়াদের মতো তারাও মাতৃপ্রধান জাতি । গারোধর্ম উপাসনাকে আগে প্রেতবাদ বলা হতো, বর্তমানে তারা খ্রীষ্টধর্ম পালন করে, গীর্জায় প্রার্থনা করে । খুব অল্প সংখ্যক লোক তাদের পুরোনো ধর্মে বিশ্বাস করে। তবে কারো কারো মতে উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের অনেক দেব-দেবী আছে। এ সব দেব-দেবী পূজার সাথে সাথে কিছু সংস্কার ও যোগ থাকে। তারা পর্বত ও নদ-নদীরও পুজা করে থাকে। গারোদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগে বিভিন্ন পূজার আয়োজন করা হত। ভারতের আসামে গারোদের আবাসস্থল ছিল। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ছাড়াও ঢাকা, রংপুর, সিলেট, নেত্রকোণাতেও তাদের বসবাস আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গারো সমতলী।দেখা যায় শিল্প তাদের সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে। নাচ, গান তাদের উৎসবের বেঁচে থাকা, জমিকর্ষণ ও ফসল উঠানোর সঙ্গে মিশে আছে। তারা ফসল তোলা, বোনা ও নবান্নের সময়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ পালন করে। ১৯৯৮ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী গারোদের

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ৬৪২৮০ জন।[২৭] তাদের আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণেও কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের ফলে অনেকেই এখন সভ্যতার আওতায় এসে পড়েছেন। এমন কি অধিকাংশ গারো খ্রীষ্টধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। গারোদের দেবদেবীর মধ্যে তাতারা রাবুগা-ই প্রধান। তাঁর আদেশেই নস্তু নুপান্তু এবং মাচি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাছাড়া–

> গারোসমাজে সালজং (সূর্যদেব), ছোজুম (চন্দ্র), নোরিংগ্রো নোজিংজু (তারাকারাজি), গোয়েরা (বজ্র), নোরাচিত কিম্র রী গোক্রী (বৃষ্টি), মেন (মাটি বা পৃথিবী) আছিমা দিংগছিমা (ছোজুম বা চন্দ্রের মা), কালকেম (গোয়েরা বা বজ্রের ভাই), চোরাবুদি (শস্যদেবতা), রোকিম (বীজের সর-রক্ষক), মিসিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ (ধানের তত্ত্বাবধায়ক) এবং নবাং (মৃতের রক্ষক) প্রভৃতির প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।' [২৮]

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে গারোরা এইসব দেবদেবীর পূজা করে থাকে। তাদের লিখিত ভাষা না থাকলেও আচিক ভাষা আছে। অর্থনৈতিক জীবনে গারোদের প্রধান পেশা চাষাবাদ । বর্তমানে তারা ব্যবসা ও এন জি তে এবং বিউটি পার্লারে চাকূরীও করছে ।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস : নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত।[২৯] প্রায় ৫ হাজার বছর আগে তারা মঙ্গোলিয়া থেকে এশিয়া-তিব্বত ও ভারতে আগমন করে। ত্রিপুরা জাতি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী।বর্তমানে ভারতের পূবাঞ্চলে আসাম-ত্রিপুরা-মেঘলায় ইত্যাদিতে বোড়ো ভাষা-ভাষি বহু জাতি-উপজাতি রয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও তারা বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, নোয়াখালী, কুমিলা, সিলেট, ফরিদপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় বসবাস করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে টিপরারা অন্যতম।[৩০] সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়েই এরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে; তবে রামগড় মহকুমায়ই টিপরাদের সংখ্যা বেশী। টিপরা কথাটি 'ত্রিপুরা' থেকে উদ্ভূত। বিষ্ণুপুরাণে 'কিরাত' ভূমির উল্লেখ আছে। এই কিরাতভূমি পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। 'ত্রিপুরা' নামে এক ব্যক্তি এই কিরাতভূমিতে রাজত্ব করতেন । তাঁর নাম অনুসানেই 'ত্রিপুরা' রাজ্যের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। ত্রিপুরা রাজ্য শাসিত হত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হিন্দুরাজা কর্তৃক। ধর্মীয় মতানৈক্য ও নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যই টিপরারা স্বদেশ ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে। রাজা ধন্যমাণিক্যের সময়, (১৪৯০-১৫১৪ খ্রি.) ত্রিপুরার সেনাবাহিনী উত্তরে কাছাড় থেকে দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের থানছি এবং দক্ষিণে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার জেলার রামু পর্যন্ত অধিকার করেছিল।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

টিপরারা বর্তমানে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হিন্দু বলে দাবী করে। হিন্দুধর্মীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করেও এরা প্রাচীন গোষ্ঠী নৃত্যগীতমুখর উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করে নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মায়ুনী নদীর উপত্যকায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ত্রিপুরাদের রিয়াং দলের লোকেরা বসবাস করত বলে জানা যায়।[৩২] টিপরা সম্প্রদায় পুরাণ, নবতিরা, ওসই ও রিয়াং গোত্রে বিভক্ত। ত্রিপুরাদের ৩৬টি দলের মধ্যে ১৬টি দল বাংলাদেশে বসবাস করছে। অবশিষ্ট দলগুলোকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায়।[৩৩] বিখ্যাত লেখক হাচিনসনের লেখাতেও উসুই ও রিয়াং (ত্রিপুরাদের) দলের কথা পাওয়া যায়।[৩৪] ত্রিপুরা রাজবংশ যে শাক্য-ক্ষত্রিয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরা সনাতন ধর্মের অনুসারী।

টিপরারা হিন্দুদের মতোই পোষণ করে থাকে। তাদের ধারণা সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে চারিদিকে কেবল পানি আর পানি ছিল। সবকিছু ছিল অন্ধকারময়। এক অখণ্ড শূন্যতার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ভ্রমণ করেছিলেন। অতঃপর ক্রমে-ক্রমে সৃষ্টির উদ্ভব ঘটলো, টিপরারা এই মতেই বিশ্বাসী।১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা হলো ৬১,১২৯ জন। ত্রিপুরাদের ভাষা বৃহত্তর বোড়ো দলভুক্ত।[৩৫] ত্রিপুরাদের বিভিন্ন দলের মধ্য মহিলাদের পরিধানের জন্য নানা রং ও ডিজাইনের পোশাক দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা ধূতি-গামছা-লুঙ্গি-জামা ইত্যাদি পরে। এইসব গোত্রের ভাষা ও সেইসব আসলে কী অর্থজ্ঞাপন করে অনেক অনুসন্ধানেও তা জানা সম্ভব হয় নি। ত্রিপুরারা যে ভাষায় কথা বলে তা ভারতবর্ষের কক্-বরক্ নামে পরিচিত । তাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর , বর্তমানে তারা ব্যবসা ও চাকূরীও করছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ৬ টি ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান, সংখ্যা ও ধর্মের বিবরণ :

* ১৯৯৮-এ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী[৩৬]

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	পরিচিতি অন্য নাম	অবস্থান	জনসংখ্যা	ধর্ম	মন্তব্য
চাকমা		পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার	২,৫২,৮৫৮*	বৌদ্ধ	
সাঁওতাল		উত্তরবঙ্গ রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, সিলেটের চা বাগান	২,০২,৭৪৪*	খ্রীষ্টান	
ত্রিপুরা (রিয়াং সহ)		পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা , চাঁদপুর	৮১,০১৮*	খ্রীষ্টান বৌদ্ধ	
গারো	মাণ্ডি	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর সিলেট, গাইবান্ধা, খাগড়াছড়ি, ঢাকা	৬৪,২৮০*	খ্রীষ্টান	
মণিপুরী (বিষ্ণু প্রিয়া)	মৈতেই	বৃহত্তর সিলেট, ঢাকা	২৪,৮৮২*	হিন্দু	আদিবাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে চান না।
বম	বম	বান্দরবন	১৩,৪৭১*	খ্রীষ্টান	

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteer-Chittagong*, Dhaka,1970, page n.15
২ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯,পৃ-৩১
৩ উদ্ধৃত, আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং -৩৬
৪ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯, পৃ-২০
৫ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৪৫
৬ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯,পৃ-২৩
৭ আব্দুস সাত্তার,*আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং -৩৯
8 Mejbah Kamal and others edited, *Indigenous People*, Cultural Survey of Bangladesh Series-5, Asiatic Society of Bangladesh, 2007, page n.36
৯ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯, পৃ- ১৪
১০ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং ১৩৮
১১ *প্রাগুক্ত*
১২ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং,-১৩৭
১৩ প্রফেসর পিয়েরে বেসিন,*পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, অনুবাদ : সুফিয়া খান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১০১
১৪ উদ্বৃত, আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১৯৭
১৫ উদ্ধৃত, সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯,পৃ-১৮ (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী)
১৬ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি; ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং- ২২২
১৭ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩ পৃষ্ঠা নং -০১
১৮ উদ্ধৃত, আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং -২৭৬
১৯ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল,*বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩ পৃষ্ঠা নং -০৪
২০ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং -২৭৯
২ মেসবাহ কামাল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের আদিবাসী* , বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৩য় খণ্ড, উৎস প্রকাশন-২০১০ ,ঢাকা, পৃষ্ঠা নং-৫৩২
২২ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০০৭, ঢাকা, বাংলাদেশ পৃষ্ঠা নং- ৫৫৮
২৩ *প্রাগুক্ত*।
২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং- ৫৬০
২৫ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং - ২১৪
২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং - ২১৫
২৭ উদ্ধৃত, মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী, জোবাইদা নাসরিন , *নিজভূমে পরবাসী: উত্তর বঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স*, দিব্য প্রকাশ, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং -১৬০,১৬১ (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৮ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী)
২৮ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং - ২১৬
২৯ মুস্তাফা মজিদ, *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং - ৪৮
৩০ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা নং -১৭১
৩১ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯,পৃ-৮৭
৩২ *প্রাগুক্ত*
৩ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ১৯৯৪,পৃ-৯৬
৩৪ সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯,পৃ-৯০
৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং ৮৬
৩৬ উদ্ধৃত, মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী, জোবাইদা নাসরিন , *নিজভূমে পরবাসী: উত্তর বঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স*, দিব্য প্রকাশ, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং -১৬০,১৬১ (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৮ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্পকলা, কারুকলা ও চারুকলা : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারু কলা

এ অভিসন্দর্ভে আলোচনার বিষয় আদিবাসী অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারু শিল্প। এক্ষেত্রে প্রথমে শিল্পকলা তারপর কোন্ কোন্ বিষয়কে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুকলা বলা যায় তাও নির্দিষ্ট করে নেব।

পৃথিবীতে মানুষের মন ও দেহ দু'টি জিনিসই সমানভাবে শক্তিশালী। কখনো কখনো মন বেশি শক্তিশালী বলে মনে হয়। মানুষ সেই আদিকাল থেকেই অন্য প্রাণী থেকে একটু আলাদাভাবে ক্রিয়াশীল, অস্থির ও নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তাই সে সঙ্গী খুঁজে নেয়, পরিবারের সাথে থাকে। সমাজের সাথে মেশে। নিজেকে প্রকাশ করে, কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, আচড় কেটে বা এঁকে ও সুর দিয়ে কোনো কাজ করে বা কোনো জিনিস আবিষ্কার করে এবং এর মধ্যে রয়েছে নান্দনিক শিল্প। আর্ট-এর সংজ্ঞা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যেমন–

> "Art never expresses any thing but itself, it has an independent life, just as thought has, and develops purely on its own lines"[১]
>
> অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ভাবনা ও নিজস্বতা থাকে; তেমনি আর্টেরও নিজস্বতা ও স্বাধীন কল্পনার প্রকাশ থাকে।

ড. সুধীর কুমার নন্দী বলেন,

> "কান্ট বলেছেন, শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সর্ববাধাহীন এবং যেকোনো যাবতীয় উদ্দেশ্য বিরহিত"।[২]

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা হলো–

> "অনেক দিন ধরে মনের ভিতর যা তৈরি হলো তাই ছবিতে বের হল"।[৩]

অর্থাৎ শিল্পকলা হলো রঙে, রূপে, লেখাই রসানুভূতির প্রকাশ । আর শিল্পকলা বলতে আমরা কেবল বুঝব চোখে দেখা শিল্পকে অর্থাৎ যাকে আমরা ভিজ্যুয়াল আর্ট বলি।[৪] শিল্পকলা সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্পসমালোচকদের আরও মতামত হলো–

Dhaka University Institutional Repository

১.The definition of human experience : (Dewey)

২.That which gives pleasure apart from desire (Aquinas)

৩.Significant from (Bell) [৫]

উনবিংশ শতাব্দীতে দু'টি অর্থাৎ চারু ও কারু শিল্পের বিভাগকে পৃথকভাবে বোঝানোর সুবিধার্থে, মূল্যায়ন করার জন্যে নতুনভাবে শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সেক্ষেত্রে বলা হয় যে, শিল্পকলা হচ্ছে— সুকুমার শিল্পকলা ও ব্যবহারিক শিল্পকলা। আর এই সুকুমার বোঝাতে ঠিক যে সূক্ষতর বা অতি উচ্চতর নিপুণকর্ম বোঝানো হচ্ছে তা নয়, বিশেষ করে সুললিত বা ইংরেজিতে যাকে বিউটিফুল বলা হয় তাকেই শিল্পকলা বোঝানো হচ্ছে। শিল্পকলার এই সজ্ঞাতে শিল্পকে শৈল্পিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কর্মকে বোঝানো হয়েছে। ব্যবহারিক শিল্পকলা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত তবে তা ব্যবহারিক কাজে লেগে থাকে।

সাধারণত কুমারের চাকার সাহায্যে মাটির বাসনপত্র, হস্তচালিত বা তাঁতের তৈরি কাপড়, কাঠমিস্ত্রীর তৈরি কাঠের আসবাবপত্র, স্বর্ণকারের তৈরি ধাতুর গহনাকে কারুকর্ম বা ক্রাফট বলা যেতে পারে। এসব জিনিসের যারা পরিকল্পনা করেন তাদেরও কল্পনা শক্তির দরকার হয়। তাই এগুলোকে গ্রহণ করতে হয় শিল্পকর্ম হিসাবে। অবশ্য চারু ও কারু শিল্পের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত ভেদ টানা যায় না, যদিও এরকম করার চেষ্টা করা হয়। আলোচনার সুবিধার্থে অনেকে শিল্পকলাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

১। প্রধান শিল্পকলা (Major Art)

২। অপ্রধান শিল্পকলা বা (Minor Art)

প্রধান শিল্পকলা হলো চিত্রকলা, ভাস্কর্য ,স্থাপত্য, নৃত্য, গান ইত্যাদি। এছাড়া শিল্পকলার অন্যান্য শাখাকে অপ্রধান শিল্পকলা হিসেবে ধরা হয়। তাদের বড় অংশই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বস্তু।[৬] প্রধান ও অপ্রধান শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন,

..... Major art and minor art, architecture, sculpture, painting, literature and music are classified thus as major art while ceramic furniture, tapestry, gem carving gold and silver smith coin and cameo work comprise minor categories.[৭]

একান্ত নিজের জন্য করা শিল্পকলাই হলো প্রধান শিল্প :

Fine arts on the other hands, are those that are cultivated more for their own sake and for the intrinsic pleasure they afford the minds and emotions of those who experiences.[৮]

Dhaka University Institutional Repository

আর হস্ত শিল্প হলো :

Encyclopedia of world art Vo-7, Mcgraw Hill book Company, Inc., New York, Toronto, London, page-270 এ বলা হয়েছে, The word handicraft is useful or decorative object made by hand or with tools by a workman who has direct control over the product during all stage of production, Its Meaning is close to the significant of minor arts. Inlay, lacquer, metalwork, furniture, musical instrument, puppets, dolls, carpets etc. [৯] আর শিল্প হল, The concept of art, the history, its definition, the proper place of esthetic pursuits among the pursuit of human mind[১০]

অতএব, প্রধান শিল্পকলার একটি নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে,

Art is an aesthetic object. It is meant to be looked at and appreciated for its intrinsic value. Aesthetic is beautiful to our eyes.[১১]

এবং অপ্রধান শিল্প বাহ্যিক প্রয়োজনের জন্য তৈরি করা হয়–

Craft is man's first technology, the technology of the hand. A fine object is intended not only to be aesthetically pleasing. It is essentially a skilled solution to specific need.

মানুষ হাটে, কথা বলে, গান করে, ছবি আঁকে, জামা-কাপড় পরে এর মধ্যে যা সুন্দর তাই শিল্পকলা। চারুকলা হলো যা মনকে আনন্দিত করে, মোহিত করে। বিখ্যাত শিল্প সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, Art is in everything, which makes pleased to our sense.

শিল্পীরা ছবি আঁকেন বিভিন্ন মাধ্যমে। সেগুলোকে বলি চিত্রকলা। মাটি, কাঠ, সিমেন্ট ও পাথরে যখন মূর্তি বা গড়নকে রূপ দেয় তখন বলি ভাস্কর্য। স্থাপত্য বলি-ঘরবাড়ি, বিভিন্ন ভবন, প্রতিষ্ঠান, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির কাঠামো তৈরিকে। বাজার, শহর, জনপদ, লোকালয়, চিড়িয়াখানা, পার্ক, স্টেডিয়াম, এমনকি সব বিষয়ের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে নির্মাণে রূপ দেয়াকেও আমরা স্থাপত্য কলা বলে থাকি। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকর্মকে আমরা এক শব্দে বলি শিল্পকলা। এই শিল্পকলা চর্চায় বা শিল্পী যখন তার শিল্পকর্মকে রূপ দেন তখন অনেক কিছু ভাবেন। তার সমাজকে ভাবেন, তার পরিবারের কথা মনে রাখেন, আশেপাশের মানুষের কথা চিন্তায় থাকে। শিল্পীর আবেগ, আনন্দ ক্ষোভ, দুঃখ এসব

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গুলো তিনি তার শিল্পকলায় রূপ দেন। শিল্পকর্ম দেখে অন্যরা আনন্দ পাক, শিল্পীর চিন্তার প্রকাশের সাথে দর্শক নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলোর মিল খুঁজে পাক, তার মনকে আন্দোলিত করুক, এমন কিছু ইচ্ছাও থাকে। শিল্পীর শিল্পকর্ম মানুষের জন্য আনন্দদায়ক ও নয়ননন্দন বলেই ওপরে বর্ণিত শিল্পকর্মকে নান্দনিক শিল্প বলা হয়েছে। নন্দন শব্দ থেকে নান্দনিক শব্দের উদ্ভব। নন্দন বলা হয় স্বর্গের উদ্যানকে।

মানুষের সৌন্দর্য-চাহিদা দু'রকম। প্রথমটি হলো মানসিক জীবনের চাহিদা অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধের চাহিদা। অপরটি হলো দৈহিক চাহিদা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা। যা আমাদের মানসিক প্রয়োজন মিটায়, তা হলো চারুকলা বা চারুশিল্প এবং যা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তা হলো কারুকলা বা কারুশিল্প।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা পাই যে শিল্প দুই প্রকার, চারু ও কারু শিল্প।

১। চারু শিল্পের মধ্যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্প, সংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

২। কারু শিল্পের মধ্যে আসে বাঁশ, বেত, বয়ন, সিবন, অলংকার, বস্ত্র ইত্যাদির শিল্পকর্ম।

সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ, একেবারে গরীব মানুষ, চাষাভূষারা যখন তার কুঁড়েঘরটি বানায় বাঁশ, খড় দিয়ে— যথা সম্ভব সুন্দর ও পরিপাটি করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জানালার চারপাশ, দরজার চারপাশে, বাঁশ ও বেতের বাঁধন দিয়ে নানারকম নকশা করে। গ্রামের যে জমিদার বা অর্থশালী লোক তার বাড়িঘরও পরিপাটি করে সাজানো থাকে। কাঠের দরজা জানালায় থাকে কাঠ খোঁদাই করা, উঁচু হয়ে থাকা নানারকম নকশা, ফুল, পাখি ও লতাপাতার ছবি। তার বাড়িতে ব্যবহৃত খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল নানারকম আসবাবপত্র, বারান্দায় ও সিঁড়িতে রেলিং- তা কাঠের হোক, লোহার তৈরি হোক, এমনকি বেতের ও বাঁশের তৈরি হলেও সেগুলোতে থাকে অনেক রকম শিল্পকর্ম এবং বিভিন্ন রকম কারুকাজ করে সেগুলোকে তৈরি করা হয়। অনেক টাকার যে মালিক, যার বিশাল অট্টালিকা , তিনিও সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য এমন কি অনেক সময় বিলাসবহুল জীবনযাপনের কারণে শিল্পকলাকে নানাভাবে ব্যবহার করছেন। এটা করার কারণ সব মানুষের মনেই কিছু না কিছু শিল্পচিন্তা থাকে । সুন্দরভাবে বসবাস করার মন থাকে। সুন্দর জিনিষ কে ভাল লাগে।

লোহার তৈরি দা-কুড়াল, খন্তা, কাস্তে, কড়াই, যাঁতী ইত্যাদি নির্মাণের আকৃতি ও গড়নে যেমন শিল্প নৈপুণ্য থাকে তেমনি জিনিসপত্রগুলোকে সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত করার জন্যে গাঁয়ে আচঁড় কেটে কখনো

Dhaka University Institutional Repository

বা খোদাই করে লতা-পাতা, ফুল, পাখি ইত্যাদি ছবির নকশা আঁকা হয়। সংসার জীবনে ও দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে হাজারো জিনিসপত্র মানুষের দরকার হয়। সেই সব জিনিসকে মানুষ নানাভাবে শিল্পরূপ দিয়ে থাকে। যেমন— কলস, পাতিল ,মাটির হাড়ি, পিতল ও কাঁসার থালা, গেলাস, কলসী, চিলমচি, পানের বাটা। এই যে কারুকাজ করা শিল্পকর্ম, তাকেই আমরা বলি কারুশিল্প। যেমন— বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, মোড়া, খাট, পালং, ছোট বড় বিভিন্ন রকম সাজি, ডালা, কুলা, মাছ ধরার পলো, চাই, ওঁচা, কোঁচ ইত্যাদি। পাটের তৈরি শিকা, ম্যাট, ব্যাগ, সতরঞ্জি, জায়নামাজ, পর্দা প্রভৃতি। সোনা-রূপার অলংকার ও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কারুশিল্প। যানবাহনের জন্যে নৌকা, পালকি, রিকশা বাংলাদেশের সুন্দর কারুশিল্প হিসেবে বিশ্বের বহুদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিন চাকা বিশিষ্ট চেহারা ও আকৃতির দিক থেকে যেমন রিকশা একটি শিল্প কর্ম, তেমনি বাঁশ, প্লাস্টিক ও কাপড় দিয়ে ফুল, পাতা, পাখির নকশা কেটে সেলাই করে রিকশাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রতিটি রিকশার সিটের পেছন দিকে সুন্দর ছবি এঁকে তা লাগিয়ে দেয়া হয়। রিকশা একটি আকর্ষণীয় কারুশিল্প।নৌকার চেহারা ও গড়নের দিক থেকে যেমন শিল্প নৈপুণ্য রয়েছে, তেমনি কাঠ খোদাই করে নৌকার গায়ে অনেক কারুকাজ করা হয়। একইভাবে পালকির গায়েও অনেক নির্দশন থাকে। তাঁতের শাড়ি, নানারকম কাপড়, চাদর, কম্বল, বাঁশ ও বেতের টুকরী, মাথাল, তাদের গহণা, শাঁখার চুড়ি, ঝিনুকের বোতাম, পুতুল, হাড়ের চিরুণী বাংলাদেশের উল্লেখ্যযোগ্য কারুশিল্প।

> "লোকশিল্পের সঙ্গে কারুশিল্পের অনেক মিল ও যোগাযোগ রয়েছে। যেমন কুমার যখন চাকায় মাটির হাড়ি, কলসী ইত্যাদি বানায় তখন তা কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প। এই হাড়ি পাতিল রং দিয়ে ছবি এঁকে যখন একে শখের হাড়ি বানানো হয়, তখন হয় লোকশিল্প। মাটি টিপে টিপে যে হাতি, ঘোড়া, মানুষ ও নানারকম পুতুল বানানো হয় সেগুলো লোকশিল্প।"[১২]

নকশী কাঁথা বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি লোকশিল্প। কাঠের তৈরি ছোট বড় হাতি, ঘোড়া ও পুতুল যা— লাল, হলুদ, নীল, গোলাপী, কালো এমনি নানরঙের খুবই আকর্ষণীয় করে রং করা হয়। হাতি, ঘোড়া কাঠের পাটাতনে বসিয়ে নিচে চাকা লাগিয়ে দেয়া হয়। যাতে এগুলো খেলনা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

রঙিন সূতা, পাট, পাটের রশী দিয়ে গ্রামের মেয়েরা নানা রকম বুননের কাজ করে। যেমন– সতরঞ্জি, জায়নামাজ, তোয়ালে ইত্যাদি। এসব বুননের জিনিস ও পাটের শিকা, বেত দিয়ে বানানো নানান রকম আসবাবপত্র, শীতল পাটি, পাখা ইত্যাদি আমাদের লোকশিল্প এবং কারুশিল্প।মাটির তৈরি জিনিস্ আমরা

Dhaka University Institutional Repository

সব সময়ই দেখি । দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারও করি । মাটির হাড়ি-পাতিল, সরা গামলা, কলস, সোরাই, খোরা, সানকি, চাড়ি, মটকি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকেই পাট দিয়ে নানা ধরনের কুটিরশিল্প ও কারুশিল্প হত এখনও হচ্ছে। শিকার প্রচলন তো ঘরে ঘরেই রয়েছে। ঘরের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকমতো রাখার জন্য শিকার প্রয়োজন হয়। আজকাল শিকা ও অন্যান্য পাটজাত কারুশিল্প শহরের লোকেরাও ব্যবহার করছেন। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার আগের তুলনায় বহুভাবে বেড়েছে। কারুশিল্প চর্চার প্রসারের সাথে সাথে পাটজাত কারুশিল্পেও সৃজনশীলতার বহুমুখী বিস্তৃতি ঘটেছে। আজকাল পাট দিয়ে যে কত রকমের শিল্পকর্ম করা হচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই।[১৩]

তুলা দিয়ে লেখা, ছবি, পাখি ইত্যাদি জিনিসগুলো তৈরি করা যায়। যেমন— তুলা ও কাপড়ের পুতুল, তুলা ও কাপড়ের হাতি। পোড়ামাটির ফলক চিত্রের মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের প্রাচীন শিল্পকর্মের নিদর্শন পাই, ঠিক তেমনি পাই কাঠের মূর্তি, কারুকার্য খচিত স্তম্ভ, থাম, তোরণ, দরজা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য ব্যবাহারিক জিনিসে। আমাদের জাতীয় জাদুঘর ও অন্যান্য স্থানীয় ঐতিহাসিক জাদুঘরে এরকম অনেক নিদর্শন আছে। যেকোন মেলায় গেলেই আমরা কাঠের তৈরি হরেক রকমের পুতুল, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলনা দেখতে পাই, এসবই কারুশিল্প ।

সূচীশিল্প কারুশিল্পের একটি বিশেষ শাখা। সূচীশিল্পের সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র আমরা দেখি। আমাদের মা, বোন, নানী-দাদী সবাই কিছু না কিছু সেলাই ফোড় করে থাকেন। নকশীকাঁথা গ্রামে মেয়েদের শিল্পকর্ম হিসেবে পরিচিত। অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশের গ্রামে এই শিল্পকর্ম হয়ে এসেছে। গ্রামের মানুষের সুখ, দুঃখের কাহিনী ও কল্পনার নানা রকম ছবি এসব নকশী কাঁথায় এবং পাখায় দেখা যায়। ফুল, লতা পাতা ইত্যাদি সূচী-শিল্পের মাধ্যমে জায়নামাজে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। এছাড়া আজকাল আধুনিক যুগে সূচী-কর্মের মাধ্যমে নানা রকম ছবিও তৈরি করা হয়। এখন দেখি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু ও চারু শিল্প কী?

আমাদের আলোচ্য বিষয় আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু ও চারু কলা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চারুকলা অর্থাৎ ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা খুব বেশি দূর এখনো এগোতে পারে নি, এই অভিসন্দর্ভে তাই তা নামমাত্র আলোচনায় আসবে, সে কারণে মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুকলা।

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প কাকে বলব? এর একটি নির্দিষ্ট পরিধি আমরা ঠিক করে নিয়েছি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেক বিষয় বস্তু আছে যা প্রাকৃতিক আকৃতিতে তৈরি। যেমন লাউ দিয়ে পানি পাত্র, বাঁশের হুক্কা ইত্যাদি। আবার বাঁশের দ্বারা তৈরি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য (বাঁশের তৈরি, বাঁশের বুনন এখানে অত্যন্ত নান্দনিক), তাদের অলংকারসমূহ অত্যন্ত সরল আকৃতির হয়ে থাকে, বাদ্যযন্ত্র, হাতিয়ার, বেতের তৈরি বিভিন্ন পাত্র, বস্ত্র, যেমন কার্পাস তুলা দ্বারা তৈরি কম্বল, সাধারণ আসবাব পত্র যেমন– কাঠের চিরুণী, কাঠের চামচ, ক্যাপ, ব্যবহারিক আসবাবপত্র যেমন বাঁশের খাট বা বাঁশের বাঁশি। অর্থাৎ তাদের জীবন ধারণের সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে নান্দনিক ও ব্যবহারযোগ্য সকল দ্রব্যাদি হলো আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প।

আর Art is most simply and most naturally defind as an attempt to pleasing form অর্থাৎ সেই সৌন্দর্য শক্তি এগুলোর মধ্যে আছে তাই আমরা এগুলোকে কারুশিল্পের আওতায় ফেলেছি। এতে সৌন্দর্য যে আছে তার আরও প্রমাণ দেশের বিখ্যাত শিল্পী হাশেম খানের কথায় পাই,

> "বাংলাদেশের আদিবাসীদের (ক্ষুদ নৃ-গোষ্ঠীদের) তৈরি কারুশিল্প বিশেষ করে তাঁতের তৈরি কাপড়, কম্বল, চাদর, বাঁশের ঝুড়ি, অলংকার ও কাধে ঝুলানো ব্যাগ সুন্দর কারুশিল্প হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে।"[১৪]

অর্থাৎ তাদের ঘর থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য কারুকলার সৌন্দর্যে বিকশিত।

এই অভিসন্দর্ভে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মোটিফ ও ডিজাইন সম্পর্কে বর্ণনা আসবে–সে ক্ষেত্রে মোটিফ ও ডিজাইন সম্পর্কে বলা যায়, মোটিফ ও ডিজাইন হলো–

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে মোটিফ অর্থ বলা হয়েছে Distinctive feature of dominant idea of a design or composition.

আবার মোটিফ অর্থ, A motive is a regular re-correct thematic element in a body of art or Folklore. অর্থাৎ শিল্পের ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো মোটিফ। মোটিফে প্রতীক, রূপক, গূঢ় অর্থ থাকতে পারে নাও পারে ।[১৫]

আর ডিজাইন বা নকশা অর্থ কারুকাজ বা অনেক জিনিসের একত্র রূপ। কোনো স্থান বিশেষ বা জিনিসের শোভাবর্ধনের জন্য কারুকাজ করা হলো নকশা ।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১ Melvin Rader, *A modern book of Aesthetics*, Fifth Edition, Holt, Rinehart and winston, New York, 1903, Page-31

২ সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ৭০০১৩, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৬৪

৩ শ্রী নন্দলাল বসু, *শিল্পকথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা-১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩৬

৪ ইবনে গোলাম সামাদ, *মানুষ ও তার শিল্পকলা*, ম্যাগনাম ওপাস, ২০০৬, ভূমিকাংশ থেকে

৫ *A handbook of art and crafts*- wigg, Hasselschwert, Wankelman, - Brown and Benchmark publishers- 1997, USA Page No- 23

৬ ইবনে গোলাম সামাদ, *মানুষ ও তার শিল্পকলা*, ম্যাগনাম ওপাস, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩

৭ *Encyclopedia of Britainnica-Vol-2*, Art, Encyclopedia of Britannica, inc, 1973 Chicago, Page-486

৮ *Ibid*, Page -484

৯ *Encyclopedia of world art Vo-7*, Mcgraw Hill book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1958, page-270

১০ *Encyclopedia of world art Vo-1*, Mcgraw Hill book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1958, Page-763

১১ H.W. Janson, *History of art*, Thames and Hudson, New York, 1995, Page-16

১২ হাশেম খান, গোপেশ মালাকার, এডলিন মালাকার, *চারু ও কারু কলা*, অষ্টম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বই, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১১

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৪৪

১৪ হাশেম খান, গোপেশ মালাকার, এডলিন মালাকার, *চারু ও কারু কলা*, ষষ্ঠ শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বই, ২০১১, পৃষ্ঠা-৮

১৫ বিলকিস বেগম, *চাপাইনবাবগঞ্জের সূচীশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৮২

১৬ *প্রাগুক্ত*,পৃষ্ঠা-৮১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারুশিল্প

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা প্রকৃতির মতো সরল, অকৃত্রিম, সজীব। প্রকৃতি-জমি তাদের জীবন, সংস্কৃতি। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রীতি, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, উপকথা, গান, নৃত্য, অলঙ্কারশিল্প, নাটক, বাদ্যযন্ত্র, পুরনো হাতিয়ার, বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন শিল্পকর্ম, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, কার্পেট শিল্প, কাঠের তৈরি কারুশিল্প, ভাস্কর্য ও বস্ত্রশিল্প । সর্বোপরি জীবন ও সমাজ নির্ভর শিল্পকলার স্পর্ধা। এই স্পর্ধার অন্যতম জীবন সম্পৃক্ত বিষয় হলো তাদের কারুশিল্প, চারুকলা। তাদের প্রকৃতি ও জীবন যেমন এক, তেমনি সংস্কৃতি ও জীবন একাত্ব হয়ে আছে। তাদের সমাজচেতন ও জীবন-ভাবনার এপিঠ ওপিঠ হলো তাদের কারুশিল্প। অতখানি জীবন-ঘনিষ্ঠতা অন্যদের কারুশিল্পে কম দেখা যায়। আর কারুশিল্পে তাদের বৈচিত্র্য ও উচ্চতা চোখে পড়ার মতো ।

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু ও চারু শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত প্রকৃতি নির্ভর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাদের ঐতিহ্যগত কিছু ব্যবহার্য দ্রব্য এখানে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুকলা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট করে নেওয়া ছয়টি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্প ও চারুশিল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

চাকমা কারু ও চারুশিল্প

চাকমাদের সংস্কৃতি ও কারুশিল্প : চাকমা জাতিসত্ত্বার রয়েছে উৎসব, পূজা-পার্বণ, নাচ, গান, লোকসাহিত্য, বস্ত্রশিল্প, বুননশিল্প, কবিতা, বাঁশ ও বেতের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, পুরাতন হাতিয়ার, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, জুম চাষ। আর সব কিছুই একে অপরেরর সঙ্গে মিশে আছে। অর্থাৎ জুম চাষের সঙ্গে মিশে আছে তাদের গান, পোশাক-পরিচ্ছদ পূজা-পার্বণ, নাচ, নবান্ন-উৎসব। জীবন চালাতে

Dhaka University Institutional Repository

গেলে শিল্পকর্মও তৈরি হয়, ব্যবহৃত হয়, চালিত হয়। সে কারণেই তাদের জীবন আচারের সাথে এই কারু ও চারুশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক অবিচ্ছিন্নভাবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের দশটি ভিন্নভাষী আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বসবাস করে।[১] তারা জুম ও পাহাড়ে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল,[২] এ কারণে তাদের সমাজ সংস্কৃতিও ভিন্ন। তাদের জীবন যাপনে তারা নানা রকমের দ্রব্য ব্যবহার করে এর মধ্যেও বাঁশের সামগ্রী, লাউয়ের খোল, জীবজন্তুর হাড় ইত্যাদি আছে। এই গুলোর মধ্যে বাঁশের ব্যবহার অন্যতম। বাঁশ তাদের সাংস্কৃতিক ধারাকে উন্নতরূপে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছে। ক্যাপ্টেন লুইনের মতে উপজাতীরা বাঁশ ছাড়া চলতে পারে না। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা বাঁশকে কেন্দ্র করে এক ধরণের আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলে ছিল।[৩] তাদের প্রয়োজনের অধিকাংশই বাঁশ দ্বারা তারা পুরণ করে থাকে। গবেষক জিতেন চাকমা তাকে গোত্র ভিত্তিক সমাজের উৎকৃষ্টতম সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] বাঁশ তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। নৃ-গোষ্ঠীদের জন্মের সময় নাড়ী কাটা ও মৃত্যুর সময়ও বাঁশ ব্যবহার করা হয়।[৫]

বেলকনি (ইজোর), বেড়া বাঁধার জন্যে বেত, ছাদ সেলাইয়ের জন্যে বাঁশপাতা ব্যবহার করা হয়। দৈনন্দিন ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে

> "……পানি রাখার পাত্র (গ্লাস), ধূমপান করার দাবা, বাচ্চাদের দোলনা (ধূলোল), বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ির মধ্যে কাল্লোং, পুলেং, লেই, ভেরা, নুনদানী, ডুল, শাম্মো, খারাং মারালে আছে। বারেং, ফুল বারেং , বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে জুমোর (ছাতা), মেয়েদের কাপড় বুননের যন্ত্রপাতি, চুল আচড়াবার জন্য ফুনি (চিরুণী), বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশী, খেংগরং, দুধুক, মাংস কাটার জন্যে দুলুক, শিকার সামগ্রীর মধ্যে বেঙচেই, বুম্বোচেই, টেরা, লুই, ডুপ, শরবাশ, আধাশোলা, কানুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রান্নার পাত্র হিসাবে বাঁশের চোঙা, চামচ, চাল মাপর একক 'ড', ধান মাপার একক 'আড়ি', ধান হতে তুষ পৃথক করার জন্য কুলা, ভার বহনের জন্য বাক এবং সৃজা, মদ চোয়ানোর সরঞ্জাম বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়।"[৬]

বাঁশ ব্যবহারে তাদের অভিজ্ঞতার ফলে কোন বাঁশ কোন কাজে বেশি ভাল তা তারা বের করতে পেরেছে। খুঁটির জন্য ভাল তলই বাঁশ, চাল সিলাইয়ের জন্য ভাল কালি সারি বাঁশ, হাত পাখার জন্যে নলি বাঁশ ভাল। আর এ কারণে বর্তমানেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঁশ তাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান যুগে বাঁশের ব্যবহারটা পরিবেশ বান্ধবও বটে। বাঁশের ব্যবহারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তারা বাঁশ দেখে বলে দিতে পারে এ বাঁশের বয়স কত। কিংবা কখন এ বাঁশ কাটলে পোকা লাগবে না। বাঁশের আদ্যপান্ত তারা ভালভাবেই জানে। একটি নির্দিষ্ট বয়সী বাঁশকে তারা

Dhaka University Institutional Repository

বেত বলে। আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা কম বয়সী বাঁশের বেত থেকে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য ও ঝুড়ি তৈরি করে থাকে।[৭] বেত গুলোর মধ্যে–

"……বাঁশ বেত, মরিচাবেত, গোলবেত, লতিবেত নামে কয়েকটি ভাগ দেখা যায়। এ সকল বেত দিয়ে নানা ধরণের সামগ্রী তৈরি করা হয়, আর এই সমগ্রী তৈরি করার যে বুনন কৌশল তাকে জু বলে।"[৮]

নির্দিষ্ট কিছু জিনিস নির্দিষ্ট জু দিয়ে তৈরি করা সম্ভব। যেমন– চালোন, কুলা, এগুলি একটি নির্দিষ্ট জু তে তৈরি করা হয়। আবার কিছু পাত্র আছে যেগুলো তৈরি করতে ভিন্ন ভিন্ন জু ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ একাধিক জু ব্যবহার করা হয়। একটি ব্যবহৃত জু হলো উজু জু । পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা এমনিভাবেই বাঁশের ব্যবহার পদ্ধতি জানে এবং এর সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। আর এই জানার বিষয়টি তাদের বাস্তব জীবনের কোন না কোন কাজে লাগেই। শহরে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে বাঁশের সামগ্রীক ব্যবহার কিছুটা কমেছে, তবে শিক্ষিত সমাজে বাঁশের বিচিত্র ব্যবহারে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তার পরেও এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় সমাগ্রী আছে যা সুদূর ঢাকা শহরে বসবাস করলেও চাকমারা নিয়ে যায়। কুলা, হুক্কা, কাদি, কাপড় বোনার সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে অনেক চাকমাকে সুদূর বিদেশে নিয়ে যেতেও দেখা যায়। ধান রাখার ডোল, বারেং বুনা পুরুষদের কাজ হিসাবে গণ্য করা হলেও নিখুঁত শিল্পসমৃদ্ধ কাজগুলোতে মেয়েরাও সমানভাবে পারদর্শী।[৯] তাদের হাতে বোনা একটি ঝুড়ির নাম কাল্লোং অর্থ্যাৎ এই ঝুড়িটা হলো ফসল রাখার একটি বড় পাত্র। এমনকি তারা বাঁশের রান্না ঘরের ধোয়া দিয়ে এক ধরণের প্রতিরোধ তৈরি করে, যাতে পোকা বাঁশ নষ্ট না করতে পারে।[১০]

কারুশিল্পের বিবরণ

পুরাতন অনুন্নত হাতে বোনা শিল্প চাকমা জাতির মধ্যে বহু শতাব্দী হতে বিদ্যমান।[১১] চাকমা মেয়েদের পরিধানের পিনন ও বুক বাঁধনী 'খাদি' (ব্রেসিয়ার) কাপড় এখনও প্রত্যেক বিদেশীর চিত্ত আকর্ষণ করে। আগে মেয়ে-পুরুষ সকলেই খবং বা মাথার পাগড়ী ব্যবহার করত। পুরুষ ও মেয়েদের খবং-এর মধ্যে শুধু ডিজাইনের পার্থক্য ছিল। পূর্বে রাজা-রাণী হতে আরম্ভ করে গরীব কুটিরবাসিনী পর্যন্ত কার্পাস হতে চরকির সাহায্যে বীজ পৃথক করে তুলা বা রুইয়ে পরিণত করে, রুই ধুনে পেঁইচ (সূতা বের করার আগে পেঁচান রুই) তৈরি করে চরকায় সূতা কাটার পদ্ধতি শিক্ষা করত। চাকমা জাতির যে বয়নশিল্প প্রথা বিদ্যামান তা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির কাপড়ের ডিজাইনের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম। চাকমা মেয়েদের তৈরি করা 'আলাম' (বহু প্রকার ডিজাইন সমন্বিত কাপড়, এই কাপড় দেখে অন্য কোনো কাপড়ের ফুল বোনা হয়) কোন যুগে কে তৈরি করেছে তা বলা কঠিন, এটা কাপড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের ও গাছের ডিজাইন, নক্সার সমষ্টিযুক্ত একটি কাপড়[১২]। আগে এই 'আলাম' বয়ন প্রত্যেক বয়স্ক বা যুবতী মেয়েদের শিক্ষা করতে হত।[১৩] চাকমাদের পুরুষেরা নিজেদের বয়ন করা কাপড় ব্যবহার করে আসছিল।

চাকমা মেয়েরা চরকার সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে চাঁদের মা-বুড়ি চরকা দিয়ে সূতা কাটছে এই ব্যাখ্যা করে ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দেওয়া হত। এই বয়ন প্রথা চাকমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং স্মরণাতীত কালের অনুসৃত প্রথা। ইতোমধ্যে সরকার চাকমাদের এই বয়নশিল্পকে কুটিরশিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতিগুলি সবই গাছ ও বাঁশের তৈরি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য বয়নশিল্প ছাড়াও চাকমারা বাঁশ ও ছোট বেতের কাজে দক্ষ। তারা বাঁশ ও বেতের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ও আকারের ঝুড়ি তৈরি করে থাকে। ফুলবারেং ও সাম্মুয়া নামক একপ্রকার বড় ও ছোট ঝুড়ির কারুকার্য দেখলে বিস্ময় লাগে। কারুশিল্পের বর্ণনা দিতে গেলে প্রথমে আসে– পোশাক পরিচ্ছদ।

পোশাক পরিচ্ছদ

চাকমা মেয়েরা লম্বা চুল রাখে। পুরুষেরা ধূতি, গামছাকানী, ঘরে বোনা কোট পরিধান করত। মেয়েরা 'পিনান' (স্কার্ট), খাদি (বক্ষ-বন্ধনী) পরত ; অবশ্য মাঝে মাঝে শাড়ি-ব্লাউজ ও পরে। 'পিনন' হলো ঘরে বোনা উপরে ও নিচে লাল ডোরা কাটা এবং একাধারে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত 'চাবুকী' নামে পরিচিত ফুলের সূচিকর্ম করা ঘাগড়া বা স্কার্টবিশেষ। এটা কোমর থেকে পায়ের গিট পর্যন্ত জড়িয়ে পরা হয় এবং এর নিচের দিকে খোলা থাকে। 'খাদি' হলো দুই ফুট চওড়া ও ছয় ফুট লম্বা রঙ্গীন নকশা করা এক টুকরা সুন্দর বোনা কাপড় যা বক্ষ বেষ্টন করে পরা হয়। তিন রকম খাদি আছে : (এক) চিবুট্টানা হলো সাধারণ খাদি– এটা বৃদ্ধাদের জন্য, (দুই) ফুল খাদি সাধারণত মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য এবং (তিন) রাঙাখাদি যুবতী বা অল্প বয়সের মেয়েদের জন্য।

চাকমা কাপড়ের মোটিফগুলো হল– মাছের মতো মাছফুল, পুদি মাছ, কাঁকড়ার মতো হাঙারাফুল, আমের মুকুলের মতো আমবোল, তিনবিয়্যাফুল, হরঙা হ্যাপা ফুল, কাদি চাবাঙ গাছ, শঙ্খচক্র ফুল, বিড়ালের লেজ, উলুফুল, বেগুন বিচি ফুল, আদা ফুল, সামুলেজ ফুল এবং চিবিত গাছ ।

Dhaka University Institutional Repository

আগে পুরুষেরা মালকোচা দিয়া ধূতি পরত এবং সিলুম (শার্ট) গায়ে দিত, মাথায় পাগড়ী বাঁধত ও কোমর বন্ধন করত।[১৪] চাকমাদের কারুশিল্পের মধ্যে বস্ত্র একটি প্রধান শিল্প। চাকমা বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বস্ত্রশিল্পের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, চাকমারা বস্ত্রের দু'পাশেই (পেছনে ও সামনে) নক্শা করে। কিন্তু অন্যান্যরা যেমন মুরং, খুমি, ত্রিপুরা এরা একপাশে নক্শা বুনন করে। কাপড় পরিধানের পরিমাণেও চাকমাদের সঙ্গে অন্যান্যদের অনেক পার্থক্য আছে। যেমন– চাকমারা মাজা থেকে একবারে পায়ের গুড়ালী পর্যন্ত পিনন পরে থাকে। কিন্তু কিন্তু মুরংরা পরে হাটুর উপর পর্যন্ত এবং ত্রিপুরারা গোড়ালীর উপরে পরে। আর খুমিরা আরও ছোট কাপড় পরে। খুমিদের এই পিননগুলির সঙ্গে আরও বিশেষ পার্থক্য হলো এ পিননগুলির রং সাধারণত সাদা হয় অথবা খুব কম রং দিয়ে, বোনা হয়। অথবা দু'একটি লাল রঙের লাইন থাকে। কিন্তু চাকমাদের পিনন অত্যন্ত বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। খাদি (বক্ষবন্ধনী) বস্ত্রের রং, পিননের রং, মোটিফ ও ডিজাইনে সাধারণত(খাদির) মূল রং লাল হয়ে থাকে। [১৫] সাথে হলুদের ব্যবহার দেখা যায়। হলুদ পাতলা লাইন, মাঝে পাতলা আবার একটু চওড়া লাইন। খাদির পাড় গুলোতে গামছার মতো সূতা বের হয়ে থাকে। এছাড়া দুপাশে কালো চওড়া পাড় দেখা যায় কাপড়ের চওড়া দিক থেকে। মূল রং হিসাবে নীলও ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে হলুদ লাল পাতলা স্ট্রাইপ দেখা যায়। মূল রং হলুদ হলে লাল স্ট্রাইপ দেখা যায়। মূল রং সবুজ হলে সাদা স্ট্রাইপ ও দেখা যায়। তবে সবগুলোতো একই রকম লম্বালম্বি দুই পাশে মোটা পাড় যা মূল রঙের চেয়ে গাঢ় , যেমন নীল, কালো, লাল ইত্যাদি রং হয় । আর তাতে আরেকটি চিকন লাইন হয় । প্রত্যেকটি কাপড়ে যে স্ট্রাইপ তা শেষ হলে মূল রং ছাড়া অন্য রঙের প্রায় দশ ইঞ্চি চওড়া একটি অংশ থাকে।

অন্যদিকে পিনন-এর রং মোটিফ নকশায় সাধারণত ধরা যায় মূল রং নীল বা কমলা বা হলুদ। চওড়াভাবে নিচে দশ ইঞ্চি ছেড়ে দিয়ে নীলের মধ্যে লাল চওড়া স্ট্রাইপ এর লালের সাথে চিকন মূল স্ট্রাইপ লম্বাভাবে চলে যায়। আর চওড়াভাবে দেখলে কাপড়ের শেষ প্রান্তে চওড়া স্ট্রাইপ এর মধ্যে চিকন হলুদ স্ট্রাইপ দেখা যায়।

আগে চাকমা মেয়ে ও ছেলেরা গৃহস্থালীর কাজ করত এবং বাহিরের কাজ করতে ও ভ্রমণের জন্য বের হলে মাথায় খবং (পাগড়ী) বাঁধত। প্রাচীনকাল হতে চাকমা ও তঞ্চঙ্গা মেয়েরা পাঁচ পোশাক ব্যবহার করত (চাকমা ও তঞ্চঙ্গারা আসলে একই গোত্রের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)। পাঁচ পোশাক বলতে (১) পিনন (পরিধানের বস্ত্র), (২) খাদি বা বুক কাপড় (৩) ফারত দড়ি (কোমর বন্ধনী) (৪) কবই (গায়ে দেওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ব্লাউজ) (৫) খবং (মাথার পাগড়ী)। এই স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য তঞ্চঙ্গ্যা মেয়েরা এখনও রক্ষা করে চলছে। বিয়ের সময় তারা রেশমী কাপড় পরে থাকে।[১৬] তারা একটা ব্লাউজের মতো কাপড় পরে। ব্লাউজটা হাতাওয়ালা, গোলগলা, লাল রঙের মধ্যে কমলা রঙের কাপড়ের তৈরি। এতে গাঢ় লালের মধ্যে হালকা লালের স্ট্রাইপ দেখা যায়, কিন্তু সেটা সেড নয়।

অলঙ্কার

অলঙ্কারের মাধ্যম: তাদের অলংকারের মাধ্যম হলো রূপা, রূপার টাকা, পয়সার অলংকার, হাতির দাঁত এবং ইদানীং তারা সোনা ব্যবহার করতেন। অনেক আগে লোহার অলংকারও ছিল।

চুলেরঅলঙ্কারাদী : চুলের কাটা– চারাং বা চেন শুদ্ধ চাবুক, চুলা ফুল (চুলের ফুল)।

কানের দুল : জামুলী, করম ফুল বা কাজা ফুল, রাজুর, কানফুল প্রভৃতি। আগে চাকমাদের মধ্যে পুরুষেরা কানে সোনারূপার ইয়ারিং অথবা বালী (গোল চাকতি) পরিধান করত, গলায় সোনারূপার শিকল পরত এবং নাচের সময় পায়ে ঝনঝনি বা নূপুর বাঁধত। মেয়েরা কানে সোনারূপা ইয়ারিং, ঝুমুলি (কানের অলঙ্কার) পরত ।

এছাড়া অন্যান্য অলংকারগুলো হলো : চিক, তেলহরী ছড়া, হাল ছড়া, তেঙাছড়া, পিজী ছড়া (পুঁতির) প্রভৃতি। নৃত্যের সময় পায়ে ও কোমরে নূপুর পরত, রূপার হাসুলি, রূপার হালছড়া (চন্দ্রহার), [১৭] পিজিছড়া (রৌপ্য বা কাঁচের নির্মিত গলার হার) পরত ।

অনন্ত : বাহুতে তাজজোড়, হাতে বাজু, বালা, চুড়ি পরত। কুজি খাড়ু, বালা খাড়ু, বাহু, হাতীর দাঁতের বালা পরত ।

বলয় বা মল : পায়ে টেঙের খারু (পায়ের মল) পরত।[১৮]

নাকফুল বা নথ : সোনার তৈরি অলংকার ।

তাদের এসব অলংকারের মধ্যে মাত্র কয়েকটি অলঙ্কার সোনার তাছাড়া আর সমস্তই রূপার হয়ে থাকে।

তেঙাছড়া ও অন্যান্য গহণার গঠন, ডিজাইন , মোটিফ ও বৈশিষ্ট্য:

তেঙাছড়ার ডিজাইনে জ্যামিতিক ভাব আছে। মূলত বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার ও ত্রিভূজ আকার সম্পন্ন। তবে বৃত্ত আকার সম্পন্ন গহণা "তেঙাছড়া" বড় বড় বৃত্ত আকারে নির্মিত যা বাঙালিদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া হাতের বাজুতে ৬টি রিং লাগানো থাকত যেগুলো ডট বা বিন্দুর ব্যবহার বলা যেতে পারে। তাদের চন্দ্রাহারে ত্রিভূজ আকৃতির ফর্ম দেখা যায়। এছাড়া তারা অনেক ডটকে শিকল দিয়ে একত্র করে বেশ বড় হার বানায়। (তাদের হার বাঙালিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ফর্মে ও লম্বায় বড়) আবার হাতের চুড়ি আছে যা ১৬টি চুড়ি একত্রে তৈরি করা হয়। এই ধরনের ফর্ম বাঙালিদের মধ্যে কম দেখা যায়। গলায় বড় একটা মালা দেখা যায় যা সত্যিই বড় বৃত্ত ফর্মের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়।

বাদ্যযন্ত্র :

মাধ্যম– সাধারণত বাঁশ, কাঠ, লোহার দ্বারা তৈরি করা হয়। ডিজাইন– সরল প্রকৃতির, জ্যামিতিক আকৃতির হয়ে থাকে।

ঢোল, খেংগরং (বাঁশের বা লোহার তৈরি মুখ দিয়ে বাজানোর একপ্রকার যন্ত্র), ধুদুক[১৯] (বাঁশের তৈরি চোঙা), মুরালী বাঁশী, বেলা[২০] (বেহালা) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র চাকমা সমাজে বাজানোর প্রচলন আছে।

ঢোল সাধারণত শবদাহ ও মৃত ব্যক্তির রথটানা অনুষ্ঠানের সময় বাজানো হয়। আগে যুদ্ধবিগ্রহ, আমোদ উৎসবে ঢোল, ধুদুক, শিঙা ইত্যাদি বাজানো হত এবং খেংগরং, মুরলী বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি অবসর সময়ে সন্ধ্যার পরে সারাদিন খাটুনির পর মনে শান্তি আনার জন্য ও চিত্ত বিনোদনের জন্য বাজান হত। যুবকেরা খেংগরং মুরলী বাঁশি, বেহালা বাজায়, আর যুবতী মেয়েরা খেংগরং বাজিয়ে থাকে।[২১] যুবকেরা সন্ধ্যার পর প্রেম সংগীত বা উবাগীত মর্মস্পর্শী সুরে বাঁশিতে ঝংকৃত করে তোলে যা মনে দোলা দেয়। বাঁশি ও খেংগরং-এর সুরগুলো শুনতে খুবই সুমধুর। বিপদকালে যুদ্ধের সময় চাকমারা শিঙা ব্যবহার করত। এটা আহ্বানসূচক সংকেতরূপে ব্যবহৃত হত। চাকমারা জুমের উঁচু পাহাড়ের ঘরে ধুদুক বাজিয়ে থাকে। সিয়ান সিক বা খিয়াং সিক (শিস) চাকমা সমাজে যুদ্ধবিগ্রহের আহবান ও বিজয়ধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটা উত্তেজনামূলক আহ্বান। 'রেইং' চাকমা সমাজে আনন্দ উৎসবে ও গানের আসরে ব্যবহৃত হয়। এটা আনন্দ ধ্বনিসূচক শব্দ। চাকমাদের মধ্যে কেও জঙ্গলের ভিতর অন্য সংগীদের খোঁজ নিতে বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে না পারলে 'কুই' দিয়া থাকে। এটা কারও খোঁজ নেওয়ার সংকেত ধ্বনি। এ ছাড়া কোনো কারণবশতঃ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে লোক আহ্বান করার জন্য এই শব্দ উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। তিন দিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই নৃত্য দেখানো রীতি। নৃত্য শেষে গৃহস্থের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

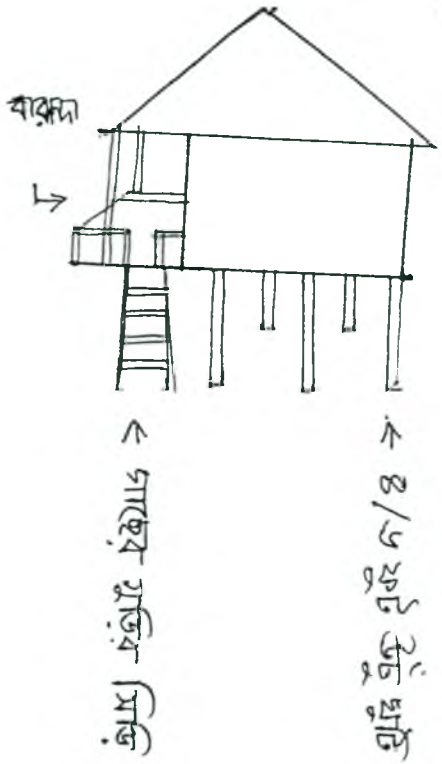

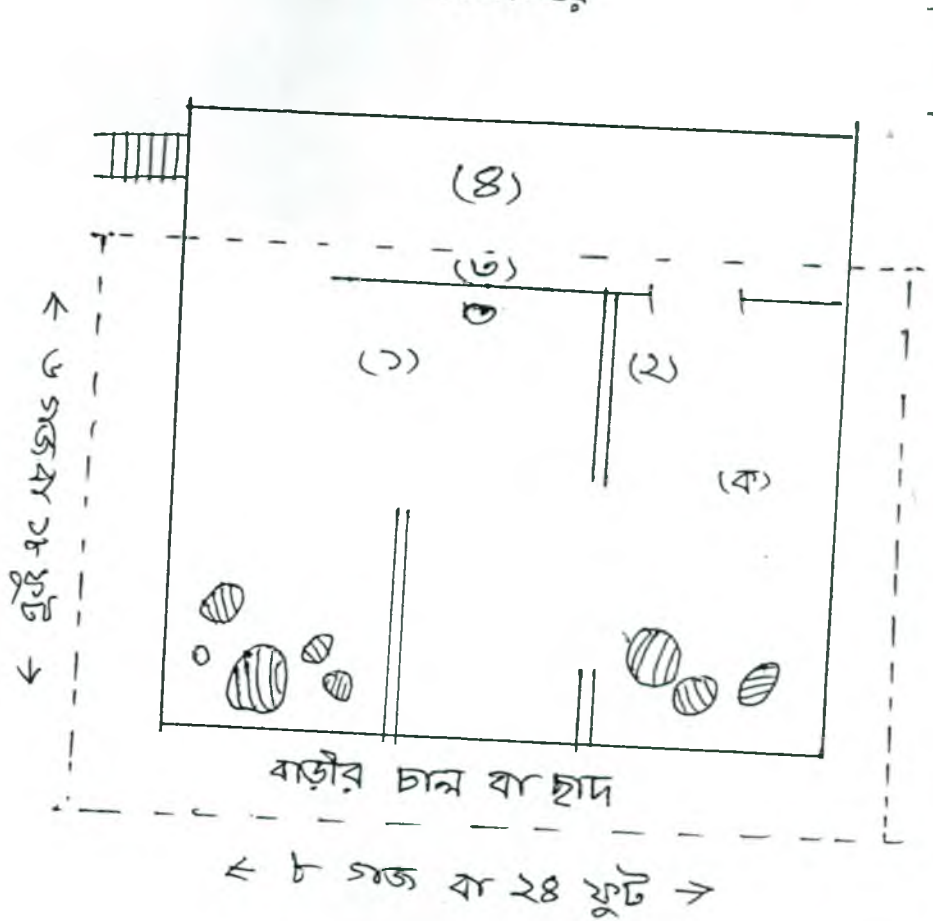

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ঘরের নমুনা নকশা

চাকমা ঘর

১. মূল কামরা, কর্তার বউ এক ছেলে ও একমেয়ে থাকে

২. বড় মেয়ে ও তার স্বামী থাকে

৩. বারান্দা

৪. ঘরের সামনের উঁচু জায়গা

৫. ছাগলের ঘর

(চিহ্ন) চালের ডোল বা ঝুড়ি

সূত্র: প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, অনুবাদ: প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭ পৃ: ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

বৈসুক উৎসবের মাধ্যমেই আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সার্বজনীন লোকসংস্কৃতির ভাব মূর্ত হয়ে ওঠে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার করালগ্রাসে মানুষের জীবন থেকে অবসর কমে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে তাদের সঞ্চিত মূল্যবোধ, তবুও আজো বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় বৈসুক উৎসব মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার এনে দেয়, পরস্পরকে কাছে টানে। খেটে খাওয়া মানুষ দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ভুলে মেতে ওঠে এ বৈসুক উৎসবে। উৎসবের ক'টা দিনে আনন্দের জোয়ারে ভাসে সমগ্র আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনপদ ।

পিঠা : মাধ্যম– কলা, গুড়, নারিকেল, চিনি, সরিষার তেল, শূকরের চর্বি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। চাকমা কথায় পিদাকে বাংলায় পিঠা বলে। চাকমা সমাজে নানা প্রকারের পিদা তৈরি করা হয়ে থাকে, যথা– কলা পিদা (কলা ও চাউলের গুঁড়া দিয়ে তৈরি পিঠা), বরা পিদা (বিনি চাউলের গুঁড়া, তৈল, ঘি বা চর্বি দিয়ে ভাজা করা পিঠা, শূকরের চর্বির তেল অথবা সরিষার তেলে ভেজে যে পিদা তৈরি করা হয় তাকে বরা পিদা বলে), সান্যা পিদা, হগা পিদা, বিনি পিদা, পাক্কোন পিদা, বেঙ পিদা, ধুগি পিদা, লুদি পিদা ইত্যাদি।[২২] উৎসবের সময় বা সামাজিক পূজা ও আচার অনুষ্ঠানে এই পিদা অবশ্যই তৈরি করার নিয়ম আছে। যেমন : ধর্মকাজ, বৌ-চাওয়া অনুষ্ঠানে বিয়ের সুইদ ভাঙ্গার (কনের বাড়ি যাওয়া) সময় ইত্যাদি। দূরবর্তী স্থান হতে নিকট আত্মীয় বেড়াতে এলে আদরের চিহ্নস্বরূপ পিদা তৈরি করে খেতে দেওয়া হয়। এই সমস্ত পিদা চিনি, গুড়, নারিকেল, কলা, পিলাগুলার শাঁস (এক প্রকার লতার তৈলাক্ত ফল) ইত্যাদি চাউলের গুঁড়ার সঙ্গে মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়।

ঘর : আগে চাকমাদের ঘরের বৈশিষ্ট্য ছিল ৪-৬ ফুট উঁচু খুঁটি দিয়ে উপরে বাঁশ দিয়ে মেঝে তৈরি করে তার উপর ঘর বানানো। ঐ ঘরে বেত দিয়ে তৈরি মাদুর দেখা যেত। সিঁড়ি করা হত গাছের গুড়ি কেটে। বাড়ির আকৃতিটা বেশ আলাদা।

ঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঘর বানাতে ব্যবহৃত সব দ্রব্যই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা এবং তার প্রকৃত রং যেমন বাঁশের প্রকৃত রং থাকত ঐ ঘরের গাঁথুনীতে। তার উপর কোনো প্রলেপ বা রং দেওয়া হত না।তাদের ঘরগুলি সম্পূর্ণ বাঁশের তৈরি যা নান্দনিকতার নিদর্শন বহন করে।[২৩] গঠনের দিক থেকে চাকমাদের ঘরগুলি দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশী। [২৪] মেঝে ও দেয়াল বাঁশ চিরে করা হয় এবং ছাদ ছন ঘাস, বাঁশের পাতা, কুরুক পাতা (এক রকম পাহাড়িয়া পাতা) প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া হয়। 'পিজারের' (ব্যক্তিগত

Basket বোনার প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

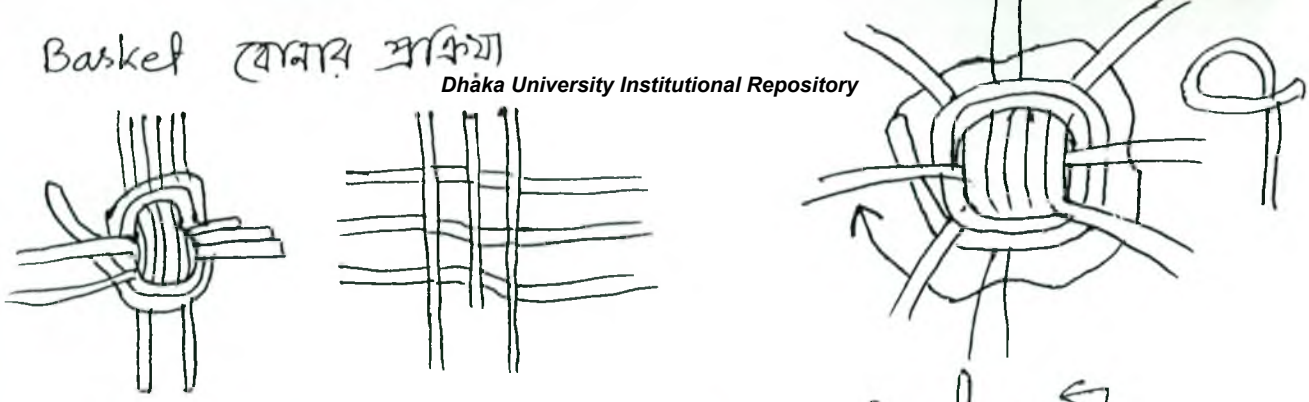

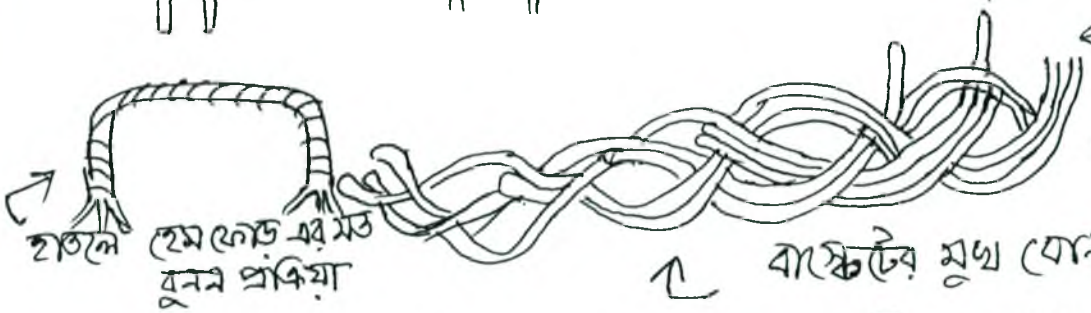

হাতলে হেম ফোড় এর মত বুনন প্রক্রিয়া

(চেইন ফোড়ের মত)

বাস্কেটের মুখ বোনার পদ্ধতি।

অধিকাংশ চাকমা বাস্কেটের বুনন এ ধরনের (বাড়ি বা মাঝখানের বুনন)

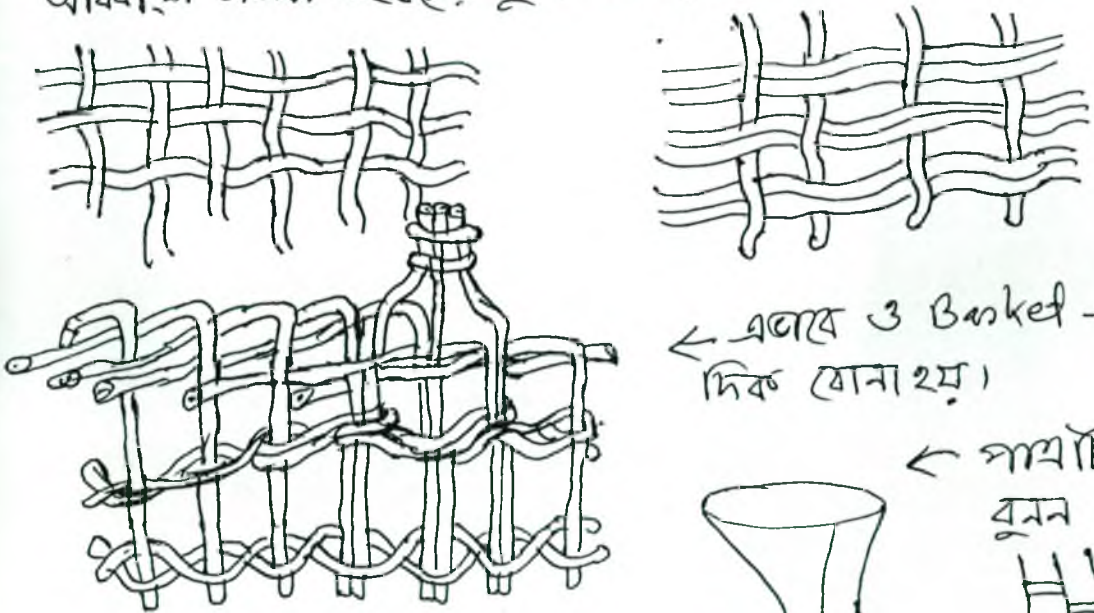

← এভাবে ও Basket এর মুখের দিক বোনা হয়।

← পাত্রটির বাড়ির বুনন প্রক্রিয়া

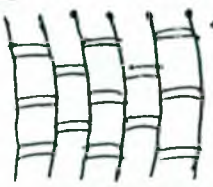

ফুটন্ত ফুলের মত (মোটিফ (ফসল তোলার পাত্র)

← পাত্রটি দেখতে অনেকটা তাদের মন্দিরের মত।

বর্তমানে চাকমারা বাঁশের চাঁচ দিয়ে ইংলিশ হ্যাট সহ, অনেক জিনিস তৈরী করছে, এখানে রং ও নতুনত্ব এসেছে

চাকমা কানের অলংকার

বর্তমানে চাকমারা পুরনো গহনা রেখে আধুনিক ডিজাইনের গহনা পরছে।

Dhaka University Institutional Repository

কক্ষ) দুই পাশে দু'টো কাঠের মই থাকে; আঙ্গিনার মতো খানিকটা খোলা জায়গা ঘরের সামনে থাকে। একটা মই উঠে গেছে ব্যক্তিগত কক্ষ বা 'পিজারের' দিকে এবং অপর টি চানা (বারান্দা) ও সিংকাবা বা অতিথি কক্ষের দিকে। এই অতিথিকামরা প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায়।[২৫] এটা হলো উপজাতিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এতেই তাদের আতিথেয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া ফসল ও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য আলাদা স্থান থাকে ।

ঘরের ভেতর প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেকেই মইয়ের কাছে রক্ষিত জলপাত্র থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে নেয়। ঘরের নিচে (অর্থাৎ মাচানের নিচে) খোলা জায়গা গৃহপালিত পাখি, শূকর, ছাগল প্রভৃতি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দৈনন্দিন আসবাবপত্র : চাকমারা বাঁশ ও ছোট বেতের কাজে দক্ষ। ঝুড়ি, লাউয়ের খোল, গাছের ফল ও ফুল ইত্যাদি কারুশিল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর আগে বাঁশ ও বেতের ব্যবহারে তৈরি নানা দ্রব্যের নাম ও তার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাঁশ ও বেতের কারুশিল্পের বর্ণনা ও দুই একটি স্কেচ ব্যবহার করা হল।

মাধ্যম: বাঁশ ও বেত ।

রং : বাঁশের যে প্রাকৃতিক রং এটাই থাকে অন্য কোনো প্রলেপ দেয়া হত না।

বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন রকমের ঝুড়ি তারা তৈরি করতেন। কাল্লোং নামের ঝুড়ি যেটি শস্যাদি ও ফলমূল বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ঝুড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল– এর ডিজাইন দেখতে ফুটন্ত ফুলের মতো। নিচ দিকে সরু উপরে আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে উঠেছে। একেবারে নিচে সমান ও চারকোণা, কিন্তু উপরের আকৃতি সম্পূর্ণ গোল, ফোটা ফুলের মতো চারদিকে উদ্ভাসিত গোল। বাঙালিদের ধামা বা অন্য পাত্রে এরকম ডিজাইন দেখা যায় না।

মেঝাং : মোটিফ, ডিজাইন ও রং– এছাড়া মেঝাং যা ছোট টি-টেবিলের মতো দেখা যায়। যা খাওয়ার পরিবেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই টেবিলে উপরের অংশের বুননে লাইনগুলো সোজা ও ভরাট। এতে চারকোণা তবে কোণাকুণি বুনন দেখা যায়। এছাড়া তাদের ছোট ছোট পাত্রগুলো মন্দিরের মতো মনে হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি নির্ভর রূপ:

এছাড়া প্রকৃতির অপরূপ রূপ ব্যবহার দেখা যায় এমন দ্রব্যগুলি হলো: বাঁশের পাত্রের দোলনা, কুলা, চিরণী, ক্যাপ । বেতের তৈরি ছোট পাত্র আছে যাতে অলংকার রাখা যায়। বাঁশের তৈরি হুক্কা, কিংবা মাউথ অর্গান– ঘেংগরং ও ধুধুক নামের বাঁশি যার নির্মাণ শৈলী একান্তভাবে প্রকৃতি নির্ভর। হুক্কার ডিজাইন অত্যন্ত সহজ সরল। এটি বাঁশের একটা ফালি ও উপরের দিকে একটি চিকন ডাটার মতো অংশ, যেন বাঁশের এঁকো দিয়ে তৈরি।

তারা একজাতীয় তিতা লাউয়ের খোলকে নিজস্ব পদ্ধতিতে শুকিয়ে মাটির কলসী সদৃশ্য পাত্র তৈরি করে।[২৬] অনেক সময় এ জাতীয় লাউয়ের ছোট খোল দ্বারা বাঁশী, নস্যিদানী, চামচ[২৭] প্রভৃতি সামগ্রী তৈরি করে তারা ব্যবহার করে থাকে। তারা তাদের বসতবাড়ির খুঁটি ও সিঁড়ি, ধানভানার সরঞ্জাম, গরুর গলার ঘণ্টা, চরকা-চরকী প্রভৃতি তৈরির কাজে গাছ ও কাঠের ব্যবহার করে। এছাড়া খোদাই করা নৌকাও তৈরি করার দক্ষতা উপজাতিদের রয়েছে। কাঠ খোদাই করে তৈরি মূর্তি, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, শিকার-লব্ধ জন্তুর মাথার শো-পিস, চুরুট পাইপ, মাথার চিরুণী প্রভৃতি সৌখিন সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রে তাদের শিল্পীসুলভ কারিগরী নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কাজে তারা সেগুন, গামার, গর্জন, চাঁপাফুল, জারুল, কড়ই, চাঁপালিশ, শিমুল, তেলসুর, কদম, মেহগনী ব্যবহার করে থাকে। তাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের মধ্যে হাঁতির দাঁত[২৮] ও হাড়ের তৈরি পাখা ও বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার উল্লেখযোগ্য।

-পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে তামা, লোহা, রূপা, অষ্টধাতু, সোনা ও পুঁতি জাতীয় ধাতব অজৈব উপকরণে তৈরি সামগ্রীর ব্যবহারও রয়েছে। যা দ্বারা তারা অলঙ্কার ছাড়াও তাবিজ, চুরুট, পাইপ, বৌদ্ধমূর্তি,গঙ্গ বা ঘণ্টা তৈরি করে।

পুরাতন হাতিয়ার : বিভিন্ন জীব-জন্তু ও পশু-পাখি শিকার করার জন্য তাদের নিজস্ব কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করতে দেখা যায়। এছাড়া জুমচাষ ও অন্যান্য কাজ-কর্ম পরিচালনা করার জন্যে তারা বিভিন্ন রকম দা ব্যবহার করে।

চাকমাদের চারুশিল্প ও ভাস্কর্য : চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও প্রাচীন লোকসাহিত্য রয়েছে। চিত্রকলা নাচ ও গান, ছড়া ও ছড়া গান এবং নিজস্ব শিল্পীগোষ্ঠী, এমন কী নাট্যগোষ্ঠীও আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর কয়েকটিতে নারীকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রথা রয়েছে। এই ধুলোমলিন মর্তের মানবজীবনকে আরও একটু সুন্দর, গভীর ও মধুময় করতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আদিবাসী বা

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী লোকশিল্পে মেয়েদের ভূমিকা নির্ণয়ে বলা যায়, তারাই এখানকার লোকশিল্পের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাঠ, হাতির দাঁত, পাথর ইত্যাদিতে আদিবাসী লোকশিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় অপূর্ব সব নকশা ফুটে ওঠে। এছাড়া এখানে প্রসঙ্গক্রমে তিনজন আদিবাসী চারু ও লোককারুশিল্পীর কাজের কিছু বর্ণনা দেওয়া যায়। চাকমা সমাজের একজন খুব নামী হাতির দাঁতের শিল্পী ছিলেন মোহনবাঁশী চাকমা[২৯]। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই হস্তীদন্ত শিল্পীর সুনাম এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এই শিল্পী হাতির দাঁত থেকে তাজমহল, ফুলের টব, মেয়েদের বালা, নেকলেস, কানের ফুল, চুলের কাঁটা, চিরুণী, আংটি, খেলার বিভিন্ন ঘুঁটি, অলংকার রাখার বাক্স, পিস্তলের বাঁট, বোতাম, কোটপিন, টাইক্লিপ, জপমালা ইত্যাদি তৈরিতে শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মারমারা হাতের কাজে বেশি পারদর্শী এ রকম আরেকজন কারুশিল্পী হলেন মারমা সমাজের হ্লাঙ-প্রু[৩০]। তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন এক কাঠমিস্ত্রীর দোকানে। চেয়ার-টেবিল-খাট-পালংকের একঘেয়ে কাজে তার মন বসতো না। তার ভেতরে সুপ্ত শিল্পিমন কাঠের কঠিন বুকচিরে জাগাতো চলমান জীবনের নানা অবয়ব। ফলে মালিকের গালমন্দ শুনে ও কাজ ছেড়ে ফিরে এলেন নিজের জগতে। এই লোকশিল্পী কাঠের বুকে খোদাই করেন ধাবমান হরিণ ও শিকারী ধাবমান ঘোড়া, অশ্বারোহী সৈনিক, লড়াইরত সাপ ও বেজি, স্তন্যপানরত শিশু ও মা, ঘোড়ার পিঠে মহিলা, বন থেকে শিকার নিয়ে ঘরে ফেরা আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবক ইত্যাদি।

চাকমা চিত্রকলা : সাধারণত চাকমাদের ঘরের মধ্যে ও বিভিন্ন গাছের ছাল, বিজ এর উপর চিত্রাঙ্কন দেখা যায়। এটাকে 'গিলেরপাট' বলে। এর উপর সাধারণত ফুল পাতা বা তাদের কাপড়ের উপর যে 'আলাম' বা নক্সা করা হয় তা এখানেও করা হয়। এছাড়া কিছু চিত্রশিল্পী দেখা যায় যারা চিরাচরিত প্রথায় ছবি আঁকেন।

মোহনবাঁশী চাকমার কিছুটা অগ্রজ বা প্রায় সমসাময়িক এ রকম শিল্পীর মধ্যে বিখ্যাত হলেন চুনীলাল দেওয়ান (জন্ম : ১৯৩০, মৃত্যু : ১৯৮০)।[৩১] ইনি অবশ্য আধুনিক চারুশিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, পটুয়া কামরুল হাসানের পরিচিত ছিলেন (বলে জানা যায়) চুনীলাল দেওয়ান। তাঁর চারুশিল্পের একটা ব্যাপক চর্চার খবরও পাওয়া যায়। তারই সূত্রে শিল্পচার্য জয়নুল গিয়েছিলেন রাঙ্গামাটি এবং সে সময়ের অনুষঙ্গে কিছু পেইন্টিংও তার আঁকা হয়েছিল। এ সবই আজ ইতিহাসের বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা হলেন– গৌতম চাকমা, প্রখ্যাত শিল্পী রফিকুন্নবীর সমসাময়িক বলে শোনা যায় , সুনীতি চাকমা (ফ্রান্স অবস্থানরত) ও কনক চাঁপা চাকমা। আদিবাসীদের বিশেষ করে চাকমাদের ছবি গুলিতে রং বেশ অনুজ্জ্বল। হয়তোবা তাদের জুমে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর বিবর্ণ জীবনের ছবি এটি। এরপরও এই ছবিগুলিতে আছে নির্মল প্রশস্ত মেঘ, পাহাড়ী পরিবেশ, ঘর, তাদের বুদ্ধ ও ধ্যানমগ্নতা। সচরাচর তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার মিশ্রিত নতুন আঙ্গিকের চিত্রভাষা। পানি পাত্র, হুক্কা টানা, নৃত্যরত ও গেরুয়া বৌদ্ধের ফর্ম। রঙের দিক থেকে কনিষ্ঠচিত্রী কনক চাঁপার ছবি বেশ বর্ণিল।

সুনীতি জীবন চাকমা (১৯৬৫ সালে জন্ম) বর্তমানে ফ্রান্সে থাকেন।[৩২] তিনি বি.এফ.এ. করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ফ্রান্সেও তিনি চিত্রকলার উপর পড়াশুনা করেছেন। তার প্রথম দিকের ছবিতে চাকমাদের সহজ সরল জীবনের ছবি আমরা দেখতে পাই।

বর্তমানে তিনি নির্বস্তুক ধারায় ছবি আঁকেন। ছবিতে আমরা চোখ সাদৃশ্য বস্তু দেখি।[৩৩] Professor Richard Crevier, (History and Philosophy of Fine Arts, Institute of Fine Arts Rennes, France) বলেন,

"Chakma is not a tamed person, we can call him an expressionist."

তিনি আরও বলেন সুনীতি Francis Bacon(Artist) দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর কালারগুলো Pathetic । তিনি ইমেজ ও আধুনিক সিম্বলকে সমন্বয় সাধন করে কাজ করেন। তাঁর কাজে wild, Free style আমরা লক্ষ্য করি।[৩৪] সুনীতি চাকমা ১৯৯৯-২০০০ সালে ফ্রান্সের Institute of Fine Arts Rennes, France থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর ছবিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। কনক চাঁপা চাকমার ছবি ও সুনীতির ছবিতে আমরা উজ্জ্বল রং দেখি।[৩৫]

কনক চাঁপা চাকমা : কনক চাঁপার জন্ম তবলছড়িতে, ১৯৬৩ সালে[৩৬]। তার বাবার নাম বিজয় চন্দ্র চাকমা, মা শরৎ মালা চাকমা। তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এফ.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ডাচশিল্পী ভ্যানগগ তার পদ প্রদর্শক।[৩৭] আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশ থেকে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন। সর্বশেষ বেইজিং অলিম্পিকে ছবি আঁকার জন্যে তিনি পুরস্কৃত হন। তার ছবিতে ম্রো

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসীদের নৃত্যসহ আদিবাসীদের পানি আনা,[৩৮] কাজ করা ভিক্ষুদের ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে বের হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখতে পাই। তার ছবি মূর্ত ও বিমূর্তের মাঝামাঝি কৌশলে আঁকা।

গারোদের কারু ও চারুশিল্প

গারো কারুকলার মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইন :

বাসগৃহ : শণ বা খড় দিয়ে গারোদের বাস গৃহ তৈরি হয়। ঘরে মাটির দেয়াল নির্মাণ করা হয়। তবে দোচালা লম্বা বাস গৃহও তারা তৈরি করে, একে নকমান্দি বলা হয়।[৩৯] মাধ্যম : ছন, কাঠ, বাঁশ ও বেত। এঘরের মেঝে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।এছাড়া গারোদের বাড়ির আঙ্গীনায় টং ঘর দেখা যায়। এই ঘরে ফসল রাখা হয় এবং জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষাও করে এই ঘর। কারণ এই ঘর থেকে সব লক্ষ্য করা হয়।

গঠন-ধরন : দোচালা লম্বা ঘর। মজবুত গাছের কাটা অংশের উপরে এইঘর অবস্থিত ছিল। সামনের দিকে খোলা বারান্দার মতো । দু'টি দরজা থাকে। সামনে বাঁশ দিয়ে বা কাঠ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করা হয় ওঠার জন্য। প্রধান বৈশিষ্ট্য বাঁশের চাটাই বেড়া, নানা ধরনের বুনন বা কাঠের গুড়ি, কাঠের খুটি দিয়ে এই ঘর তৈরি । সমস্তই কিছুই প্রকৃতি নির্ভও, কোনো লোহা, টিনের ব্যবহার ছিল না। ছিল না কোনো প্রাকৃতিক দ্রব্যের রং, অর্থাৎ প্রাকৃতিক রূপটাই এখানে প্রধান থাকত। আর নকপান্থে নামে এক ধরনের বাসগৃহ পাওয়া যেত যা বেশ বড় আকারের। এগুলিতে কারু-সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। ঘরগুলোতে মজবুত গাছের উপর বাঁশের তৈরি বড় মাচাং, সামনের দিকে খোলা ও বাকী অংশে বাশের বুননে মজবুত বেড়া দেওয়া। এঘরে সাধারণত দুইটি দরজা থাকে। ওঠানামার জন্য গাছের গুড়ির সাহায্যে বড় মই তৈরি করা হয়। লক্ষণীয় যে খুটিগুলির গায়ে সুদৃশ্য কারুকাজ করা থাকে।[৪০] এই ঘরটি ইদানীং কম দেখা যায়। পাহাড়ী গারোদের ঘর মাচার উপর নির্মিত হয়। এখন আধুনিক ঘরে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাদ হয়। কিন্তু এগুলো আগে ছন, কাঠ, বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হত।[৪১]

বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য :

মাধ্যম– বাঁশ, পিতল, কাঁসা, গরুর চামড়া, কাঠ, জীবজন্তুর শিং ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারা উৎসবে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে যা তাদের নিজস্ব কায়দায় তৈরি। এর মধ্যে দামা, ক্রাম[৪২], নাথিক, রাং, শিংগা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র দেখা যায়।'রাং' কাঁসা দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র, অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। 'দাম' ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র, গরুর চামড়া ও কাঠ দিয়ে তৈরি। 'আদুবি' মহিষের শিং দিয়ে তৈরি। আরেকটি বাদ্যযন্ত্র বাঁশের নরম অংশ ও পিতল দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাঁশি। পিতলের অন্য একটি বাঁশি আছে সানাইয়ের মতো । এগুলি বাঙালিদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। সিংগা, সিংগা হচ্ছে এক ধরনের বাঁশি। এটা মূলত মানুষ মারা গেলে শ্রাদ্ধ করার সময় নাচ গান করা হয় ও বাঁশি বাজানো হয়।

তাদের অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো কুঠির শিল্প ও কাঠ বিক্রি করা।

বস্ত্রশিল্প :

মাধ্যম- কার্পাস তুলা, রেশম ইত্যাদি দিয়া তারা কাপড় তৈরি করে।

রং : তারা চাকমা বা বমদের মতো অত উজ্জ্বল কালার ব্যবহার করে না। খয়েরী, কালো, বেগুনী, ম্যাজেন্ডা, কমলা ইত্যাদির ব্যবহার বেশি। তুলনামূলকভাবে তাদের রং চাকমাদের চেয়ে হালকা।

তাদের কাপড়ের ডিজাইন ও মোটিফ : ডিজাইন ও মোটিফেও পার্থ্যকটা লক্ষণীয়। তারা ব্লাউজ পরে এটা খুব সাধারণ, সাধারণত নীল রঙের , খয়েরী রঙের– গাঢ় লাল খুব কম। মারমারা যে কাপড় পরে সেখানে স্ট্রাইপগুলো চাকমাদের থেকে আলাদা। স্ট্রাইপ এর মধ্যে, মাঝে, একটা উজ্জ্বল কালার বা জরির ব্যবহার দেখা যায়। আর গারোদের নিচের পরিহিত কাপড়ের মাঝখানে মোটা স্ট্রাইপ দেখা যায়। কিন্তু আমরা চাকমাদের দেখেছি একেবারে নিচের নিকে এই মোটা স্ট্রাইপটার অবস্থান। অর্থাৎ এটা গঠনে চাকমাদের থেকে বেশ আলাদা। গ্রামাঞ্চলে আমরা বাঙালিদের বেডসীটের যে ডিজাইন ও রং দেখি তার সাথে গঠন আকৃতির মিল দেখতে পাই। এই রকম স্ট্রাইপ লুসাই যুবক-যুবতীদের পোশাকে দেখা যায়।

তাদের পোশাকে আমরা অনেক সময় আট/দশ ইঞ্চি চওড়া পাড় দেখতে পাই। যা অন্যদের থেকে আলাদা। অনেকটা বাঙালিদের মতো । মোটিফে কখনও কখনও ফুল দেখি তবে তার গঠন জ্যামিতিক আকারের ফুল-পাতার মতো । চারকোণা মোটিফ দেখা যায়। জ্যামিতিক প্রজাপতি, ঘাস বা শাপলার মতো মোটিফ। সাধারণত ঘরে বা সাধারণভাবে বাইরে যে কাপড়টি মেয়েরা পরে (নিচে) তার বুনন

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা আমাদের গামছার মতো সরল, সাধারণ হয়। স্ট্রাইপের রং সাধারণত বেগুনী, হালকা বেগুনী, নীল, ম্যাজেন্ডা ইত্যাদি হয়ে থাকে। গঠনে রঙে জাকজমকহীন, অনুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান।

গারো যুবতীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতির কাপড় পরে যা চাকমা (মেয়েরা ব্লাউজ 'গান্না' 'দক্কা' টুকরো কাপড় পরে, পুরুষরা ধূতি, নেংটি পরত[৪৩] বা এক ফুটের কম চওড়া পোশাক পরত । কার্পাস তুলা থেকে এ জাতীয় পোশাক বোনে) বা অন্যান্য আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতো হলেও আলাদা। এতে সাধারণত লাল কালো ও হলুদ রঙের ব্যবহার বেশি হয়। তারা এগুলো নিজেরাই বুনে থাকে।[৪৪] তাদের তাতের মধ্যে আছে–

কটকা তাঁত : ছোট তাঁত এতে ওড়না, (দোকসারি) দোকমান্দা (৪ হাত কাপড়), কম্বল ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

বড় তাঁত : চিকন সূতার কাপড় তৈরি হয়। ১০০, ১২০ মাপের সূতা ঐ তাঁতে ব্যবহৃত হয়।

তাদের বস্ত্রশিল্পের মধ্যে সূতি কাপড়ের দকসারি তৈরি হয়। দোকসারি নিচে পরতে হয়। এটা কম দামের কাপড়। অন্যটি হলো দকমান্দা, দকমান্দাটি বেশি দামের কাপড় এবং এটি কোনো উৎসবে বা অনুষ্ঠানে পরা হয়। এই কাপড়টি সূতি কাপড়ের সাথে রেশমী সূতার মিশ্রণে তৈরি হয়। তাদের কাপড়ের নকশা বাঙালিদের জামদানী শাড়ির সাথে অনেক সময় মিলে যায়।[৪৫] ইদিলপুরে শিশু পল্লীতে ছোট বড় তাঁত আছে। এটি পঁচিশ মাইল এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

অলঙ্কার :

মাধ্যম– রূপা, পাথর, পুঁথি, লোহা, তামা, পিতলের দ্বারা তৈরি করা হয়। তারা পুঁথির মালা পরে থাকে। মাজাতে বিছা পরে, সেগুলো রূপার তৈরি। গলায় পাথরের রং-বেরঙের মালাও পরে (উৎসবে, গোষ্ঠীপ্রধান মাথায় পাঁগড়ী পরে)। হাতে পরে মোটা বালা বা চুড়ি। বাজুও পরিধান করে হাতে, মাথায় কাপড়ের সঙ্গে উজ্জ্বল রৌপ্য অলংকার পরিধান করে। কপালে টিপ পরে। হাতে লোহার ও তামার আংটি দেখা যায়। তারা কানে পিতলের রিং পরে।[৪৬] অলঙ্কারে ফুলের এবং জ্যামিতিক ডিজাইনের মোটিফ দেখা যায়।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

রং- বাঁশ দিয়ে তারা খাদ্য দ্রব্য বা ছোট কিছু বহন করার জন্য ঝুড়ি বোনে তাতেআগে রং থাকত না ইদানীং হলুদ ও সবুজ কিংবা অন্য রং থাকে। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের বাঁশের পাত্র তৈরি করে ও ব্যবহার করে থাকে। যার শিল্প গুণ দেখার মতো। তবে যুগের সাথে সবকিছু বদলায়, ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে তারা আর যুম চাষ করতে চায় না। সে জন্য ঐতিহ্য বদলাচ্ছে বা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই কারুশিল্পেরও পরিবর্তন হচ্ছে। গারোদের অধিকাংশই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে বিধায় গারোদের প্রধান উৎসবগুলো যেমন রং চুগালা (ভাদ্র মাসে), দেওয়ান গালা ইত্যাদি বিলুপ্ত হচ্ছে, তারা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা লাভবান হলেও এ উৎসবগুলো আর হচ্ছে না। নাচ, গান, আনন্দোৎসব সব কিছুই যেন বিস্মৃত প্রায়।[৪৭]এখানে পরিবার সহ একজন সাধারণ গারো কৃষকের সাথে আলাপ করি (চিত্রমালাতে ছবি দেওয়া হয়েছে) ।[৪৮] এ ছবি দেখে তাদের পরিবর্তনকে বোঝা যাবে।

থালা :

মাধ্যম- মাধ্যম ছিল কাঁসা।

কাসার থালা আগে ছিল। এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মা, দাদা, বা মুরব্বীদের এই থালায় খাবার দেওয়া হত।

অস্ত্র :

মাধ্যম- মাধ্যম ছিল কাঠ,লোহা ইত্যাদি।

স্ক্রি, দাওয়ের মতো , যুদ্ধের কাজে লাগে। মিলাম, কুক্করি দেখতে দা-এর মতো । অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে দা-কে তারা বলে আথথি। অর্থাৎ দাকে বলা হয় মান্দি আথথি।এগুলো দূর্গাপুর নেত্রকোণার বিরিসিরিতে গেলে পাওয়া যাবে। সুনামগঞ্জ এলাকায়ও আছে। আরেকটি কারু কলার নাম জাকতা। জাকতা হলো বর্শা। এটি তারা শিকারের কাজে ব্যবহার করত।

দিখখা- মাধ্যম মাটি বেত ইত্যাদি। মাটির তৈরি পাত্র। পাত্রের গায়ে বেতের ডিজাইন। এ পাত্রে চূ বা মদ তৈরি করা হয়।

খকসি:বাঁশের তৈরি এই পাত্রে মাছ ধরে রাখা হয়। আরেকটি পাত্রের নাম ঝাকি। এই পাত্রটি বাঁশের তৈরি। এতে বিভিন্ন ধরনের জিনিস রাখা হয়। বাঁশে ধোঁয়া দিয়ে রং গভীর করা হয়,পওে এটা কে বাস্কেটে পরিণত করা হয়।[৪৯] আমুয়া, এই দ্রব্যটি সাংসারিক বা গারোদের প্রকৃতি পূজার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফং দ্রব্যটিতে মদ রাখা হয়। আরেকটি গারো শিল্প হলো বাইল। কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয়

Dhaka University Institutional Repository

কারুদ্রব্য এমসিসি নামক একটি এনজিও USA ও কানাডাতে রফতানি করে।[৫০] এটি হচ্ছে বাঁশের তৈরি। মাছ ধরার দ্রব্য।[৫১] মান্দি থোরা, এটিতে ফসল বা কোন দ্রব্য পিঠে করে নিয়ে আসা হয়। এই পাত্রটি বেশ বড়। কুলা, কুলাকে ওরা রুওয়ান বলে। ওদের কুলা আমাদের বাঙালিদের কুলার চেয়ে দেখতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মাতুল, এটি বৃষ্টির সময় মাথায় দিয়ে তারা কাজ করে। খকথক, এটা দেয়ালে রাখা হয় এবং এতে ফুল থাকে। হুক্ক, হুক্ক হলো আরেকটি কারুশিল্প। দেলাং সুয়া, এটি তাদের উঠানের মধ্যে থাকে। মানুষ মারা গেলে অন্যরা এর চার দিকে ঘুরে ঘুরে নাচ গান করতে থাকে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীকারু শিল্পী হিসাবে নাম উল্লেখ করতে গেলে প্রথমে আসে–

নিতেশ নকরেক - বেত দিয়ে ও মাটির পাত্রের সাথে মিশিয়ে এক ধরনের অতি আধুনিক পাত্র কারুশিল্প তৈরি করেন। যা অত্যন্ত নান্দনিক। এটি সিলেট অঞ্চলে পাওয়া যায়। অতএব তিনি ও কারুশিল্পী ।

বাবুল মারাক- বাঁশ ও বেত ও গ্ল দিয়ে নানা রকমের কারুশিল্প তৈরি করেন। বাড়ি পীরগাছা, মধুপর।

চারুশিল্প : চারুশিল্পের মধ্যে আছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি।

চিত্রকলা : গারোরা তাদের বাড়ি বা মাচাং এ কারুকাজ করে থাকে। তাদের এমন কিছু শিল্পী আছে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক পড়া শোনা নেই, তবে তারা নিজেদের মতো ছবি আঁকে। সেই সব চিত্রে তাদের কাপড়ের বা অলংকারের নকশা, পাতা, ফুলের নকশা ও কখনো কখনো পশু-পাখির ছবিও দেখা যায়। এ রকম কয়েকজন শিল্পীকে পাওয়া যায়–

চন্দন মান সাং এর নাম, পঁচিশ মাইলের পীরগাছায় রসুলপুর মাজারের নিকটস্থ চুনিয়া গ্রামে তার বাড়ি। বয়স চল্লিশের মতো । তার চিত্রকলা হলো বন্যপ্রাণী, কিংবা বাচ্চা পিঠে এই রকম বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি। বিষয়বস্তুতে সরলতা বিরাজমান। রঙের প্রলেপ ও মিশ্রণ ও ব্যবহারে নতুনত্ব নেই।

ডেনিসন চিরান- ভাস্কর্য করে থাকেন ,বিশেষ করে কাঠে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় কাজ, কাঠ খোদাই করে থাকেন। যথেষ্ঠ সুনামও অর্জন করেছেন। তবে প্রকৃত পক্ষে তার কাজ জীবন বাঁচানোর জন্য, তাই তাঁকে আমরা চারুশিল্পী না বলে কারুশিল্পী বলতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাস্কর্য বা মূর্তিকলা : অখ্রীষ্টান গারোরা মৃত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি রক্ষার্থে কাঠের মূর্তি খোদাই করে বসত বাড়ির সামনে উঠানের এককোণে স্থাপন করতেন। একে গারো ভাষায় 'খিমমা সংআ' বলে।[৫২] এগুলো দেখতে অতি আধুনিক Installation Art বা স্থাপনা শিল্পের মতো।[৫৩]

এছাড়া দেখা যেত কাঠের তৈরি দু'জন দেবতার মূর্তি, যেখানে ফিগারটা কিন্তু কোনো পুতুলের মতো নয়। চোখ ধ্যানরত মাথার চুলগুলো লাইন কেটে করা হয়েছে সব মিলে আলাদা ধরনের কাজ এটি।

দুই একজন প্রাতিষ্ঠানিক চারু শিল্পীকে পাই, এরা হলেন–

সোল হাঙচা - চারুকলা থেকে এম.এফ.এ. করেছেন। বয়স ৩৫, লম্বা চুলের অধিকারী এ শিল্পী চিত্রকলায় বেশ পারদর্শী। তার চিত্রে আমরা বন, প্রকৃতি ধ্বংসের হাহাকার দেখি। তিনি এগুলো সরাসরি আঁকেন। বিষয় বস্তুতে ময়মনসিংহ বা মধুপুরের বন উজাড় বা ধ্বংস হওয়ার চিত্রটি আমরা খুঁজে পাই।[৫৪] তার ছবিতে রং অনুজ্জ্বল, শিল্পী হিসাবে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই ও তার প্রতি শুভ কামনা করি।

অনিতা রিচিল - চারুকলায় পড়াশোনা করা গারো নারী, গত ২০১০ সালে হঠাৎ করে মারা যান, বাড়ি নেত্রকোণা, নারী গারো শিল্পী। তার বয়স ছিল ৩৮-এর মতো । চারুকলার ব্যাপারে সেই একই কথা বলতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে গারোরা তেমন দক্ষতা এখনও দেখাতে পারে নি।

মণিপুরী কারু ও চারু শিল্প

বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরীরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও উচুস্তরের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের অধিকারী। তাদের সর্ম্পকে একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিকের বক্তব্য এরকম, I have allueded to the Monipur is as a comparatively refined race.[৫৫] মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের বাঙালি ব্যতীত অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রসর মণিপুরী সম্প্রদায়। জীবনযাপনের ধরন, ধর্ম বিশ্বাস ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতির বহুবর্ণিল উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্কৃতি।[৫৬] এর মধ্যে রয়েছে নৃত্যকলা, লোকসংগীত, লোকগল্প, লোকগাঁথা আর রয়েছে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কারুশিল্প ও চারুশিল্প কলা। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মতো কারু এবং চারুশিল্প কলা ও তাদের জীবন আচার তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংশিষ্ট । সিলেটে মহিলা মণিপুরী সভানেত্রী এস বীণা দেবী নিজেদেরকে আদিবাসী বা নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকার করেন না, কারণ হলো

Dhaka University Institutional Repository

একটি মনিপুরী মাফলারের ডিজাইন।

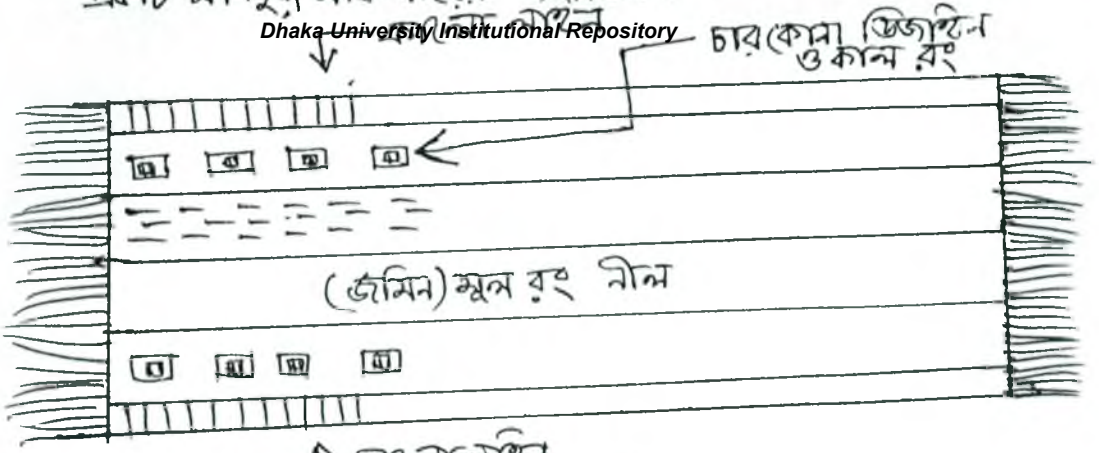

ফানেকের আঁচলে মন্দিরের মোটিফ।

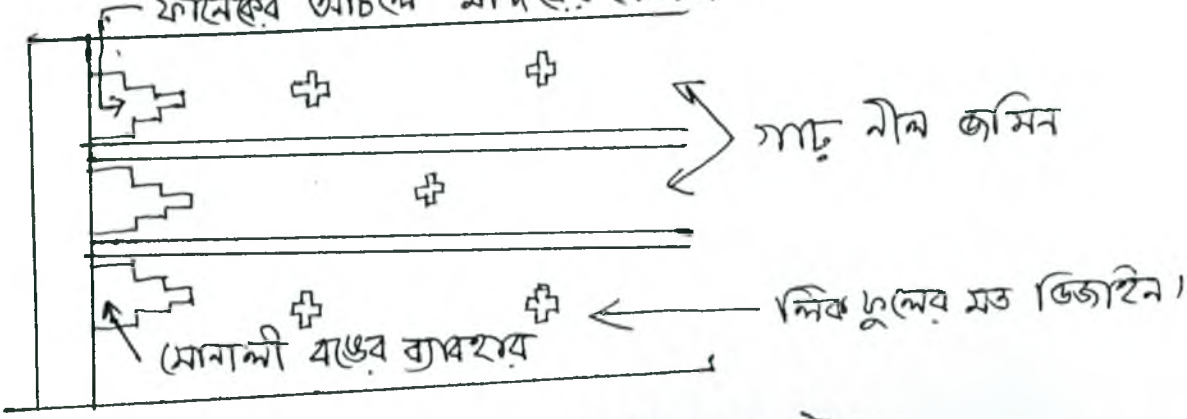

মনিপুরী ফানেক এর একাংশের ডিজাইন ও মোটিফ

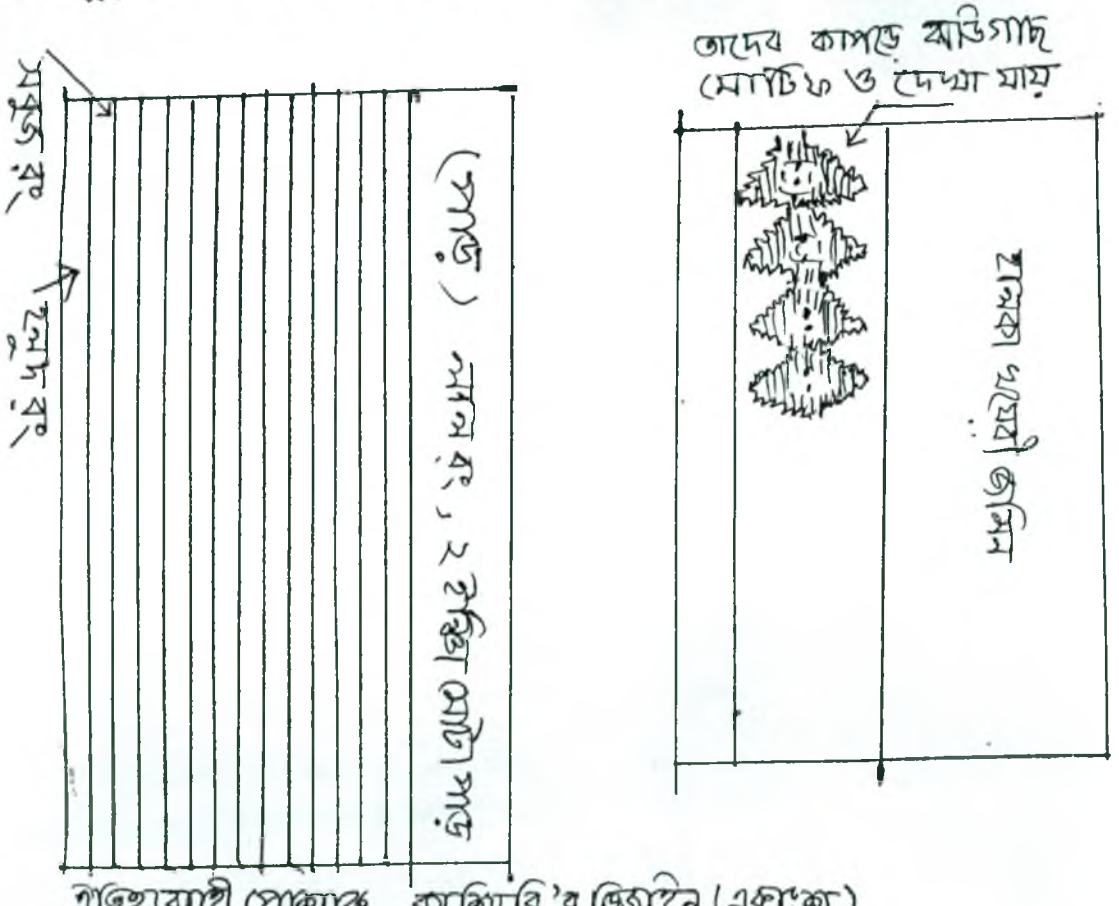

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ৩০০০ বছরের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের কারুশিল্পের মধ্যে অন্যতম হলো - বস্ত্রশিল্প, অলংকার ইত্যাদি।

তাদের কারুশিল্পের মধ্যে আছে তাঁত শিল্প জাত বিভিন্ন পোশাক, সোনার বা বিভিন্ন দ্রব্যের অলংকার, ধর্মীয় ও বিভিন্ন পার্বণে ব্যবহৃত পাত্রাদি, উপাদান, বাড়িঘরে ব্যবহৃত দ্রব্য ও নকশা, বাদ্যযন্ত্র, মুদ্রা, যুদ্ধাস্ত্র, খেলার সামগ্রী, খাদ্যপাত্র, উৎসবের সময় ঘরে বা বাইরে করা নকশা অলংকার। চারু শিল্পের মধ্যে আছে, তাদের তৈরি করা প্রতিমা মূর্তি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কিছু শিল্পীর কাজ এবং অতি সম্প্রতি দুই/এক জন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীর কিছু চিত্রকলা।

মণিপুরী কারুশিল্প

কারুকলাসমূহের মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইন :

তাঁতশিল্প : মণিপুরীদের অধিকাংশ বাড়িতেই তাঁত শিল্প রয়েছে।[৫৭] বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ কম হলেও তাঁতজাত দ্রব্যের ব্যক্তিগত বিপননে অধিকাংশ পরিবারের ভরণ-পোষণ ঘটে থাকে। এই তাঁত শিল্পের বস্ত্রশিল্প ও তার নকশা অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। বাঁশের তাঁতে তারা নানা রঙের পোশাক তৈরি করে ।

মাধ্যম : তাঁতে বোনা বস্ত্রের ক্ষেত্রে মাধ্যম হলো কার্পাস সূতা, রেশমি সূতা ,উল ও জরি ইত্যাদি ।

পোশাক : পুরুষরা ধূতি ও পাঞ্জাবি পরে। বাড়িতে তারা পাছাতি নামক একটি পোশাক পরে। ৫ হাত দৈর্ঘ্যের একটি গামছাকে পাছাতি বলে। যুবক-তরুণেরা সাধারণ শার্ট-প্যান্ট পরে থাকে। মেয়েরা 'ফানেক' বা লাহিং ও ব্লাউজ আর নিজস্ব ডিজাইন ও বুননে বিশেষ এক প্রকারের ওড়না পরে। পার্বণে-পূজায় তারা 'ইনাফি' নামক ওড়না পরিধান করে। 'ইনাফি'-তে বিশেষ কারুকাজ করা হয়, 'মৈরাং' নামে, যাতে একটি প্রতীকী 'মোটিফ' ব্যবহার করা হয়।[৫৮] ইদানীং মণিপুরী মৈরাং অঙ্কিত শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ তারা পরে থাকেন।

রং : রং এদের কাছে দার্শনিক এক বিষয় বলে মনে হয়। রং দ্বারা, রঙের সেড দ্বারা এদের আধ্যাত্মিকতাকে, ধর্ম-দর্শনকে তারা ফুটিয়ে তোলে। অন্যান্য যত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাংলাদেশে আছে তাদের মধ্যে রং ব্যবহারে নিঃসন্দেহে এরা ব্যতিক্রম। হালকা, নরম, মিশ্র রঙের ব্যবহারে এরা অতুলনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন : মূল রং লাল, নীল, হলুদের প্রাধান্য কম। শুধুমাত্র একটি নৃত্যেই ওদের মূল এই রং দেখা যায়। তবে হালকা নীল, ফিরোজা, গোলাপী ঘিয়ে, হালকা সবুজ, আসমানী, হালকা হলুদ, হালকা কমলা ইত্যাদি রঙের ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রেই এই রং থেকেও আরও সেড দিয়ে কাজ শেষ করা হয়েছে। অর্থাৎ নীল রং হালকা নীল রং ও অন্য আরেক সেড দিয়ে শেষ। যেটা বাঙালিদের মধ্যেও কম। অন্য কোন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে তা নিতান্তই খুঁজে বের করার মতো বিষয়। আবার বিভিন্ন রঙের হালকা প্রয়োগও একটি কাপড়ে দেখা যায়।

মোটিফ, ডিজাইন ও গঠন প্রকৃতি : তাদের শাড়ির পাড়ে বা আঁচলে এই রকম মোটিফ দেখা যায় যা তাদের মন্দিরের মোটিফ বলে এস রীণা দেবী (সিলেট মণিপুরী মহিলা সমিতির সভানেত্রী) জানান। এছাড়া তারা একমাত্র আদিবাসী যাদের কাপড়ের ডিজাইন জামদানী ডিজাইনের সাথে বেশি মেলে। তাদের শাড়িগুলোতে চৌকোণা ডিজাইন দেখা যায়। চাকমা বা ত্রিপুরাদের কাপড়ে যে স্ট্রাইপ বা লাইন দেখা যায় এদের শাড়িতে তার ব্যবহার খুবই কম।

তারা উল দিয়ে মাফলার বোনে যা অন্যান্য দের মাফলারের চেয়ে আলাদা। মাফলারের গঠন , ডিজাইন ও ফর্ম আলাদা ।

মাফলারের মূল রং হালকা সবুজ, নীল ,কন্ট্রাস্ট কালার হলো কালো। লক্ষণীয়, এই মাফলারের গঠন নকশা স্বতন্ত্র-আলাদা। আরও লক্ষণীয়, তারা কালো ব্যবহার করে কম। আমরা মাফলারে দেখলাম কন্ট্রাস্ট কালার সাধারণত শাড়িতে, উড়নায় দেখতে পায় না। এখানে মাফলারে ডটের নান্দনিক ব্যবহার লক্ষণীয়। তাদের বেডসীটগুলোতেও আমরা হালকা কালার দেখতে পাই। নকশায় তারা অন্য আদিবাসীদের থেকে অনেক আধুনিক।

অলংকার :

অলংকারের মাধ্যম : সোনা, রূপা।

তাদের অলংকারের মধ্যে 'লিকসই' 'হেই কুরু' 'পুন্দারেই' 'থাপাক' প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। নাকের জন্য 'নাসিকা' কানের জন্য 'ঝুমকা' ও বিবাহিতরা শাখা পরে, এবং গলায় মোটা মোটা দানা দিয়ে তৈরি 'হুনাছড়ি' ব্যবহার করে। অন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাথে বড় পার্থক্য যে মণিপুরীদের সোনার অলংকার পরা একটি আবশ্যক সাজ-অনুষঙ্গ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের তুলনায় অলংকার শিল্পের সূক্ষ্মতায় গড়নে ও সৌন্দর্যে মণিপুরীরা শীর্ষস্থানীয়। অলংকার তাদের প্রাণ। তারমধ্যে মণিপুরীরা সোনাকে অলংকারের প্রধানতম মাধ্যমে হিসাবে পরে যা চাকমা, বমদের মধ্যে দেখা যায় না।

রং :

অলংকারের রং সোনালী । তাদের অধিকাংশ অলংকার সোনার তৈরি। তাদের অলংকার পরার ঐতিহ্য হাজার বছরের কাজেই অলংকারের কারুকাজে সূক্ষ্ম, মসৃণ, উন্নতমানের ডিজাইন ও কাজ দেখা যায়। ধরা যাক কানের দুলের কথা, চাকমাদের কাছে আমরা শুধুমাত্র গোল একটি রিং দেখছি কিন্তু এখানে দেখি কানের দুলের গঠনে চারটি অংশ ও গঠনপ্রণালী বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেখানে উপরে পাতলা সূক্ষ্ম কারুকাজের বৈভব। তারা হাতে পাতলা চূড়ি ও মোটা বালা পরে। মোটা বালা অন্য আদিবাসীদের মতো চওড়া ও কারুকাজ বিহীন সিম্পল নয়। বালাতে আমরা চৌকোণা ও লম্বা লাইনের মতো জায়গা দেখি যে জায়গাটি বৃত্ত বা চৌকোণা করে কাঁটা।

মোটিফ :

তাদের আগের বালাগুলিতে সাপের মাথার ডিজাইন দেখা যেত, তার নাম নাগবালা। অন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা চূড়ি পরে পেঁচানো অর্থাৎ একটি রিং পেঁচিয়ে অনেক চুড়ির মতো পরে। সেখানে এরা চূড়ি পরে আলাদাভাবে, অনেকগুলি। বাঙালিদের সাথে তাদের যোগাযোগ ও ঐতিহ্যের আদান প্রদান এখানে ফুটে উঠে। তারা গলার হার পরে তবে তা ভিন্ন রকমের। এখানেও আমরা বৃত্তের ব্যবহার দেখি। জ্যামিতিক গোল আকৃতি দেখি, আর তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, মসৃণ ও সূক্ষ্ম শিল্পসাজে প্রকাশিত।

পিঠা শিল্প : 'বিষূব' পিঠা তাদের এক শিল্প রসনার অন্যতম সৃষ্টি। এই পিঠা নানান উপকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'লাইহারাউবা'। লাই অর্থ দেবতা 'হারাউবা' অর্থ আনন্দ নৃত্য। দেবতা তুষ্টি সাধনে এই নৃত্য করা হয়। প্রতিবছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১৫ দিনব্যাপী এই নৃত্য উৎসব চলে। রাস বলতে প্রেম-রসকেই বুঝাই। রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেম সেটিই এখানে গানে-নাচে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এরকম বিভিন্ন উৎসবের সময় এই পিঠা তৈরি করা হয় ।

এখানে সিলেটের সুবিদবাজারে অবস্থিত মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জাদুঘরের কারুশিল্পগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে -

Dhaka University Institutional Repository

চূড়াঃ রাসনৃত্যর পোশাককে, তারা চূড়া বলে।[৫৯] গহণাসহ জমকালো এ পোশাকটি তাদের কাছে অতি পরিচিত।

পলয়, যা বকরম দিয়ে তৈরি মেয়েদের পরিহিত কাপড় (নিচের অংশ, ফোলানো থাকে) অন্য ছবিতে (ছবি গুলো শেষে চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে) দেখি ডান দিকে রাঁধা, বাদিকে বৃন্দা সখি। বৃন্দা সখি হলো রাধার অষ্টম সখির একজন। মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাজু ও সোনার বালা পরিহিত, কমলা রঙের কাপড় পরিহিত (নারী পোশাকের মতো)। শ্রীকৃষ্ণের গায়ে উত্তরীয়র মতো কাপড় ও আছে। এর পাড় সোনালী রঙের।

এখানে রাঁধার গায়ের কাপড়, ব্লাউজ লাল। নাচার পোশাকের কামিজ অংশ সাদা রঙের। বকরম দিয়ে তৈরি যে অংশটি গোল হয়ে জায়গা দখল করে, এই কাপড়টি বিশেষভাবে আলাদা অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী থেকে। তবে এটি চাকমাদের পিননের মতো কালারফুল কারুশিল্প।এছাড়া আছে , 'পে' রাজা বা দেবতাদের ছায়া দেয়ার জন্য ছাতা সাদৃশ্য এই দ্রব্যটি ব্যবহার করা হয়। উপরের দিকে সাদা কাপড়ে তৈরি দ্রব্যটি বেশি উঁচু হয়। মাঝখানে ছাতার মতো লম্বা হাতল। এটির প্রচলন দেখা যায় মারমাদের মধ্যে। অন্য ছবিতে দেখি, মাঝখানে — রাজা/বাদশারা যুদ্ধ জয় করে এলে এই উত্তরীর দিয়ে তাদের সম্মান করা হয়। এই কাপড়ের ডিজাইনে সাদা, কালো কমলা রং এ সাদা গোলাকার বড় আকৃতি দেখা যায়, যা চাকমা, ত্রিপুরা, গারোদের কারুশিল্প থেকে বেশ আলাদা। এটা উলের তৈরি চাদর বিশেষ।

এছাড়া আছে পুরুষের পোশাক, মাথার মুকুট। আর পরনের উর্ধ্বাংশের জমকালো পোশাক। এছাড়া স্বর্ণের বালা বা খাম্বা দেখা যায়। তবে নিচে লুঙ্গির মতো যে অংশ ,তার ডিজাইনে আমরা একটু মারমা ছোট লতানো ডিজাইনের মতো দেখি যদিও উভয়ের কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আরও একটি বিষয় দেখা যায়, দেহের উপর ব্যাজ পরিয়ে দেওয়ার মতো কাপড়ের দুইটি লম্বা বন্ধনী । আরো আছে মেয়ের পোশাক, নাম থুইবি, সাথে স্বর্ণের মালা, এখানে দুই/তিন টি মালা দেখা যায়। মাথায় মুকুটটি সামান্য ছোট। মাজায় উত্তরীয়র মতো (উড়নার মতো কাপড়) হালকা স্বচ্ছ কাপড় খণ্ড দেখতে পাই যা গোলাপী ও হালকা সাদা রঙের। (মেয়েদের) পোশাক অংশটিতে চিকন স্ট্রাইপ দেওয়া, গোলাপী সাদা সমান্তরাল রেখা দেখি, তবে (চেকের মতো না) এটি চাকমাদের পিননের রং থেকে আলাদা, বুনন- ডিজাইনেও আলাদা। এখানে কোনো উল্টা বিপরীতমুখী রেখার দেখা পায় না। চাকমাদের পিননের পাড় খুবই রং

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ, মণিপুরীদেরটি এরকম নয়, শুধুমাত্র সহজ সরল পাড় সমৃদ্ধ কাপড়। রাসনৃত্যের পোশাকটি ছাড়া মণিপুরীদের পোশাকে একটি হালকা ও সাদা ওরঙেরপ্রাধান্য দেখি। যা ঐ জাতীয় সংস্কৃতির ধ্যান মগ্নতাকে প্রকাশ করে। এই কাপড়গুলির নকশা ও পরার প্রক্রিয়াও অন্য নৃ-গোষ্ঠী থেকে আলাদা। আর এদের বড় তাঁতের বোনা কাপড়গুলি হালকা ,স্বচ্ছ ও আভিজাত্যে ভরা, বিশেষ করে শাড়িগুলি যেন আভিজাত্যের প্রতীক।

তাদের সৌন্দর্য কর্মের মধ্যে আরেকটি কারুশিল্পের অংশ হলো তাদের করা মুদ্রা বা কয়েন যা রং ও আকৃতির দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, কতকগুলো চারকোণা কতকগুলো গোলাকৃতি হয়। এগুলো রৌপ্য, স্বর্ণ, দস্তা ইত্যাদির প্রকরণে নির্মিত। এছাড়া অন্য ছবিতে–

তাদের বিশেষ করে মহিলাদের উপর অংশে পরিহিত বহুল পরিচিত কাপড়ের নাম "ফানেক"দেখা যায়।[৬০] এটা সাধারণ পোশাক, এটা সাধারণত ঘরে পরা হয়। আরেকটি আছে যা হচ্ছে বিশেষ কাপড় নাম "লেই ফানেক"। এটা খুবই সুন্দর। এটা কোনো অনুষ্ঠান বা বাইরে বা উৎসবে পরতে হয়, দামও অনেক। বড় তাঁতে বুনতে হয় এই কাপড়। এটি অনেক হালকা ,স্বচ্ছ হয়ে থাকে। এটা সাধারণত গোলাপী রঙের (উপরের ,উত্তরীর অংশ) ও নিম্নাংশে গোলাপী ও খয়েরী স্ট্রাইপ হয়ে থাকে। তাদের ছেলেদের পরিহিত পোশাকও বৈচিত্র্যপূর্ণ।[৬১]

মণিপুরীরা বলে থাকে যে ড্রেস দিয়েই তাদেরকে চেনা যায় , মূলত মণিপুরী জাতি চেনা যায় পোশাকে। তাদের এই সব কাপড়ের/পোশাকের ভিন্ন ভিন্ন রং হয়ে থাকে। তবে এই সর্বোচ্চ দামের উন্নত কাপড়টি অবশ্য এখন "ইম্ফল" (এই ইম্ফলই মণিপুরীদের আসল বাসস্থান) বা "ত্রিপুরা" থেকে পাওয়া যায়, সিলেটে এটা পাওয়া যায় না বললেই চলে। ওরা যে মুকুট পরে যা সাদা ও লাল কাপড়ের সমন্বয়ে তৈরি, এটি উপরের দিকে ৩টা পাতার ডিজাইনের মতো ,যা অত্যন্ত দর্শনীয়-নান্দনিক। এছাড়া এরা গামছাকে "খুদেই" বলে। তারা পাগড়ী (কয়াক) পরে কীর্তনের সময়। পাগড়ীর সৌন্দর্য ও সাদা কাপড়ের শুভ্রতা তাদের সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের অন্যতম অংশ।

তাদের একটা কাপড় ছিল যার নাম "আসন"। উৎসব অনুষ্ঠান হলে এটি বিছানা চাদরের মতো বিছিয়ে দেওয়া হয়। এটিতে খয়েরী ও সাদা মিশ্রণে মোটা স্ট্রাইপ হয়। মাঝে পাতলা সোনালী স্ট্রাইপের ডিজাইন। এ ছাড়া কাঠের ফ্রেমে রিলিফ ভাস্কর্যের মতো একটি লেজওয়ালা বড় ড্রাগন দেখা যায়, যা

Dhaka University Institutional Repository

কাঠ খোদাই শিল্পকলার নির্দশন। এ ড্রাগনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয় । আর এখানে পূজারী ও পূজারিণীকে দেখা যায়। পূজারীর মাথায় সাদা পাগড়ী যা অত্যন্ত পাতলা, হালকা সূতায় তাঁতে নির্মিত। পূজারীকে বলে মাইবা। পাশে পূজারিণী তাকে বলে মাইবি। তাঁর গায়ের যে কাপড় তা কিন্তু সাদা রঙের কাপড়, গলায় ঐ ইনাফি জড়ানো, কমলা রঙের। মাথায় ফুল ও কানে অংলকার পরিহিত।

অন্য ছবিতে পিতলের পাত্র দেখছি যা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যের অন্যতম কারুদ্রব্য। এটির নাম "চাইটেংগ" বিয়ের সময় এটিতে প্রসাধনী বা অন্য দ্রব্য দেওয়া হয়। অন্য পাত্রটি পানের বাটার মতো দেখতে পাচ্ছি। এরপর আমরা 'চন্দন বাক্স' দেখতে পাই মানে "Beauty Box" যাকে "চন্দন লুপাক" বলে, যাতে থাকে কনের সাজার বিভিন্ন দ্রব্য।

তারা "সাগর কানজেয়ি" বলে– পোলো খেলাকে। মণিপুরীরা দাবি করে যে তারা পোলো খেলার উদ্ভাবক। তবে নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন Hockey on Pony back-এর কথা।[৬২] তাদের জাতীয় খেলা হলো -Hun Chong, at which the national game of hockey.

ছবিতে খেলার দুইটা লাঠি দেখা যায় (চিত্রমালাতে ছবি দেওয়া হয়েছে)। পাশে পোলোর বল দেখা যায়। কাংস-নামে একটি কড়ির মতো খেলার জিনিস ও দেখা যায়, যা হাত দিয়ে ছুড়ে ফেলে, সাতজনে খেলতে হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থানে গুলি লাগাতে হয়। ৪৫ ফিট দূর থেকে এখানে গুলি দ্বারা লাগাতে হবে। এর 'বল' বাঁশের মোড়া দিয়ে তৈরি (বাঁশের গিরা দিয়ে তৈরি) হয় । খেলার মধ্যে 'যুগনা' অর্থাৎ কুস্তি খেলা তাদের প্রিয় খেলা।

বাদ্যযন্ত্র:

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে 'পেনা' বেহুলার মতো বাদ্যযন্ত্র যা 'লইহারাবা' অনুষ্ঠানে বাজানো হয়। আরেকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'নামড়া'। অন্য বাদ্যযন্ত্রটির নাম 'সুড'। এটিও একই রকম দেখতে। এটি আমাদের কাছে পরিচিত বাদ্যযন্ত্র।

তারা মৃদঙ্গ কে 'পুং' বলে যা উৎসবে বাজানো হয়। অন্য ছবিতে আমরা ঢোলক দেখতে পাই, একে 'খংজন' ঢোলক বলে। এছাড়া আমরা করতল দেখতে পাই যা কাসার তৈরি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া পূজায় ব্যবহৃত বাসনাদি জাদুঘরে ছিল। যেমন 'খোজাই' বা লোটা, ছোট বাউল বা বাটি। এতে পানি দেওয়া হয় পূজা বা অনুষ্ঠানে।

এছাড়া ছিল কিছু মাটির পাত্র, 'হুক্কার' পাত্রের মতো , নাম 'নাংঠাক'। এতে তাদের হুক্কা খাওয়া প্রকাশ পায়। নকঁশার দিক থেকে এটি অত্যন্ত দর্শনীয়বস্তু।

এছাড়া চৌংখিবাং অর্থাৎ ড্রাগন আঁকা পতাকা ছিল যা পূজাতে লাগে। এটিও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ, নান্দনিকভাবে সাজানো উৎসবের উপাদান। এটি বড় অনুষ্ঠান বা সমাবেশে ব্যবহৃত হয়।

অন্য ছবিতে লম্বা তরবারী দেখি, তরবারীটি লোহার তৈরি। তীর ধনুকের ব্যবহার খুঁজে পায় তাদের ইতিহাসে। ব্রিটিশ সময়ের তরবারী এটি। ঢালও দেখতে পাই। তীরকে তারা বলে 'সেইবাং'। শুড়কির মতো লম্বা একটি অস্ত্র দেখি, এটিতে লাল 'বল্টু' লাগানো।

এছাড়া বেত ও বাঁশের নান্দনিক বুননে অনেকগুলি পাত্র দেখতে পাই। 'লুকমেই' পান রাখার/শাকসব্জি রাখার পাত্র, যা বেতের তৈরি। বেতের জিনিসের মধ্যে দুই রং দেখা যায়। ডিজাইন ও ভিন্ন ভিন্ন। 'পিরুক' নামের পাত্র ছিল যাতে বিয়ের সময় মিষ্টি নেওয়া হয়, অন্যটি হলো বাঁশ দিয়ে তৈরি শাকসব্জি রাখার বড় পাত্র। নিচে চারটি পা লাগানো পাত্র দেখতে পাই। অন্য ছবিতে দেখি বাঁশের তৈরি কলসির মতো পাত্র, মাছ বা অন্য দ্রব্য রাখার পাত্রের মতো এই পাত্রটি। এছাড়া দেখি কলসির নিচে রাখার দ্রব্য 'সাইজা' যাতে কলসি না পড়ে। এটাও বাঁশের তৈরি ব্যবহৃত দ্রব্য, যার বুনন শৈলী চোখে পড়ার মতো ।তাদের 'চুমক মাচা' নামে টুকরি ছিল, যাতে ছোট জিনিস রাখা যায়।

মণিপুরীদের চারুকলা

চারুশিল্প : চারুশিল্পের মধ্যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাচ, নাটক উল্লেখযোগ্য।

চিত্রকলা : East Pakistan District Gazetteer, Sylhet, ১৯৭১ বলা হয়েছে, জৈন লেসওয়ারী মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, হাতি ও ঘোড়ার মোটিফ আঁকা দেখা যায়; যা তাদের চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জায়গাটি সিলেটের জয়ন্তিয়াপুরে অবস্থিত।[৬৩]

মাঝে মধ্যে কিছু ভাস্কর ও চিত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়। যেমন : শিবগঞ্জে শংকর সিংহ নামে একজন মৃৎশিল্পী আছেন, তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, তবে ভাল কাজ করেন। মৃৎশিল্পেও তার কাজ মান সম্পন্ন। এছাড়া কেউ কেউ ছবি আঁকেন যেমন : উৎপলেন্দু সিংহ,

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ি লালার দিঘীর পাড়। চন্দ্রধন সিংহ কাঠের কাজ করেন, আবার স্বর্ণ, কারুশিল্পেও জড়িত।অন্যজন রবীন্দ্র কুমার সিংহ, বাড়ি লালার দিঘীর পাড়। মাইবাম আতিয়া[৬৪] নামের একজন নারী ভাল ছবি আঁকেন, তিনি কম বয়সী। 'বাবুতন' (মৃত) নামের একজন চিত্রশিল্পীর কাষ্টঘর-বন্দর এলাকার সরকারি স্থাপনাতে কিছু কাজ দেখা যায়, এখানে বেশ কিছু ছবি দেখা যায়। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কম বয়স্ক দুই একজন জন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন : অমৃত সিংহ রাখি, বাড়ি শিবগঞ্জে, ১৯৯৩ একাডেমিক সেশনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। বয়স চল্লিশের মতো (সিলেট শিল্পকলা একাডেমীর আর্টের শিক্ষক ছিলেন)। তিনি ছবি আঁকেন, হালকা রঙে, মণিপুরী সেই হালকা, সাদা, ঘিয়ে, গোলাপী রঙের সমাবেশ আছে, আছে স্বপ্ন আবেশ। অন্য একজন শিল্পী হলেন জহর সিংহ[৬৫] (বান্দরবন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক)। ভাস্কর্য বিষয়ে ঢাকাতে পড়াশুনা করেছেন বয়স ৩৫/৩৭ বছরের মতো । তাদের চিত্রকলায় রং মিষ্টি, আধ্যাত্মিক, ড্রইং হালকা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চারুকলা চর্চায় মণিপুরী (বাংলাদেশী) সমাজ এখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে পারে নি।

ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারু শিল্প

ত্রিপুরাদের কারুশিল্পের মধ্যে অন্যতম হলো তাদের ব্যবহৃত বৈচিত্র্যময় অলংকার শিল্প। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই একসময় অলংকার ব্যবহার করত। এছাড়া তাদের পেশাগত ঐতিহ্যের মধ্যে আছে শূকর পোষা। চোলাই মদ তৈরি করার জন্য তারা বিখ্যাত। তাদের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে তারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ।[৬৬] গীতি-বাদ্য ও শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ ত্রিপুরাদের অন্যতম বিশেষত্ব।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইন :

অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতোই ত্রিপুরাদেরও রয়েছে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। সাধারণত ত্রিপুরা পুরুষরা ঐতিহ্যবাহী তাঁতের গামছা পরিধান করত। এছাড়া ধূতি পরার চলও ছিল। কেউ কেউ মাথায় সাদা কাপড় জড়িয়ে থাকত। মেয়েরা পরিধান করে রিনাই নামের একপ্রকার বস্ত্র, যা কোমর তাঁতে তৈরি। রিনাইয়ের জমিন লাল রঙের এবং উপরে নিচে কালো রঙের পাড় থাকে। কোমর তাঁতে তৈরি বক্ষবন্ধনীর নাম রিসা। সাধারণত রিসা দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও প্রস্থে এক হাত।

বস্ত্রশিল্প :

মাধ্যম– কার্পাস সূতা।

Dhaka University Institutional Repository

রঙের বেলায় তারা চাকমাদের মতো , তবে একটু হালকা রং ব্যবহার করে। তবে ডিজাইন ও গঠন প্রকৃতি কাছাকাছি। যেমন— মেয়েদের পরনের কাপড়ের রং নীল কিন্তু গাঢ় অর্থাৎ প্রুশিয়ান ব্লুর সাথে সবুজ-হলুদ রং দেখা যায়। তারপরও পার্থক্য দেখা যায়, যেমন– এই রংগুলি বিশেষ করে হলুদ-সবুজ রং চাকমারা কম ব্যবহার করে। ত্রিপুরাদের কাপড়ের গঠন প্রকৃতি খুবই সহজ সরল।

চাকমাদের কাপড়ে লাল, নীল ও কমলার প্রাধান্য দেখা যায়। গঠনে ত্রিপুরাদের কাপড় চাকমাদের কাছাকাছি হলেও স্ট্রাইপগুলো অনেক চিকন, সরু । কাপড়ের মাঝামাঝি সাদা সিঙ্গেল সূতার লাইন গেছে অথচ একেবারে বোঝাই যায় না। তারা উপরে প্রায় বাঙালিদের ব্লাউজের মতো ব্লাউজ পরে। হালকা নীল কাপড় পড়ে। তাদের তাঁতের তৈরি খয়েরী ,এ্যাশ, নীল রঙের স্ট্রাইপে তৈরি গামছাটা তারা খুব ব্যবহার করে, অনেকটা উড়না হিসাবে। এখানে তেমন কোনো মোটিফ বা আলাদা কিছু পাওয়া যায় না, মূল কাপড়ে কখনো কখনো কিছু ফুলের মোটিফ, গমের ও ধানের মোটিফ দেখা যায়।

অলঙ্কার : বান্দরবানের ত্রিপুরাদের বলা হয় উসুই। তারা অলংকার হিসাবে পুঁতিরমালা ব্যবহার করতেন। খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ত্রিপুরারা বিভিন্ন রকমের অলংকার পরে থাকে। অলংকারের প্রধান মাধ্যম রূপা। তাদের অলংকারের ডিজাইনে খুমি অথবা মুরংদের থেকে কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। খুমি ও মুরংদের অলংকার অনেক বড় বড় ও বৃত্তাকৃতির হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের অলংকার বড় ও ছোট উভয়ই দেখা যেত । ত্রিপুরাদের হাতে বালা দেখা যায় যা অনেক বড় এবং অনেকগুলি সার্কেল দিয়ে একটিমাত্র বালার (পেঁচানো) সমষ্টি। তাদের কানে ঐতিহ্যবাহী কানের দুল দেখা যায়, যার উপরের অংশ একটি সরল রেখার মতো লম্বা ও নিচের অংশে বৃত্তাকৃতির ডিজাইন আছে।

নাকে, কানে, গলায়, হাতে তারা বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার পরিধান করতে ভালবাসে। নানান ধরনের অলঙ্কার দিয়ে তারা নিজেদের সাজায়। যেমন– গুয়াখুম, তয়া, বালি, (কানে পরার অলঙ্কারবিশেষ), দু'টি কাটা সহ রূপার তৈরি চুলের খোপা, রূপার তৈরি বাজুবন্ধ 'খালচি', হাতের কব্জিতে পরার জন্য বালা। হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া রূপার বালা হাদোক / খাবুক। কোমরে পরার রূফানী চান্দু, পায়ের অলঙ্কার বেংকি এবং হাতের আঙুলে ব্যবহারের আংটি ইয়াইতাম, ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কার হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। তাদের প্রায় প্রতিটি অলংকারে চন্দ্র মোটিফ উৎকীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

থাকে।[৬৭] এই চন্দ্র তাদের প্রাচিন ইতিহাসের ও ঐতিহ্যেও প্রতিক হিসাবে আসে। ত্রিপুরা মেয়েরা খোপা বড় করার জন্য মাথায় বাড়তি চুলও ব্যবহার করে।[৬৮]

প্রসাধনী : কেশ পরিচর্যায় ত্রিপুরা রমণীরা অত্যন্ত যত্নশীল। এক্ষেত্রে তারা সাবান, লেবুর রস এবং একপ্রকার বনজ ফল ব্যবহার করে। এ ফলের ব্যবহার তাদের চুলকে জীবাণুমুক্ত রাখে। ত্রিপুরা ঐতিহ্যে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ীফুল সাময়িক অলঙ্কার কিংবা প্রসাধনী হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– খুম্পেই, খুমতাই, সৌরাং, মাধুরী কোবার, খেত্নাখেসা, কাটানাগেশ্বর ইত্যাদি ফুল প্রসাধনী হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়।

ক্রীড়া ও বাদ্যযন্ত্র : বাদ্যযন্ত্র ও ক্রীড়া তাদের আরণ্যক জীবন ও প্রকৃতিলীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কৃষিনির্ভর প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিতে সৃষ্টি এ সকল লোকক্রীড়া ও বাদ্যযন্ত্র একটি সহজ-সরল নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রত্নরূপটি উন্মোচিত করে। তাদের কিছু লোকক্রীড়া ও বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় দেওয়া হলো :

শুকোই খেলা – পাহাড়ি শুকোই গাছের ছোট একটি খণ্ড নিয়ে দু'দলের মধ্যে খেলা হয়। প্রত্যেক দলের খেলোয়াড় থাকে পাঁচ জন।

বাঁশী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র[৬৯]– শিমুর, ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র – খা-অম, বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র – দাংমুঙ, বে-আনা, টুট-আ ইত্যাদি তারা ব্যবহার করে থাকে।

চারুকলা

চিত্রকলা : ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু চিত্রকরের দেখা মেলে। যারা ঘরের ভেতরে বা বিভিন্ন দ্রব্যে চিত্র আঁকেন, নকশা করেন। কেউ কেউ ছবি আঁকেন অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে চিত্রকলার কাজ করছে এরকম শিল্পীরও দেখা মেলে। যেমন– মৃন্ময় ত্রিপুরা।

ভাস্কর্য : ত্রিপুরা শিল্পীরা হিন্দু ধর্মের নানা দেব-দেবী এবং বুদ্ধের ভাস্কর্য কখনো কখনো তৈরি করে থাকেন। এছাড়া কয়েকজন জুনিয়র শিল্পীকে আমরা পাই যারা ভাস্কর্য করেন। এদের মধ্যে সাপু ত্রিপুরাসহ[৭০] আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়।

বম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারুশিল্প

Dhaka University Institutional Repository

০ বম কাপড় বেশি আদি ও টেকসই

০ সাদা রঙের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশি।

০ এরকম বুননের ব্যবহার চাকমা কাপড়ে নেই বললেই চলে

০ বম কাপড়ের ডিজাইনে এক লাইনের মধ্যে অনেক variation দেখা যায়।

০ একটা কাপড়ে ৮ থেকে ১২ টা বা অনেক গুলো রঙের অবস্থান দেখা যায়।

০ একই লাইনে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার দেখা যায়

০ লাইনের মধ্যে অন্য, মোটা-চিকন লাইনের ব্যবহার

০ এরকম চতুর্ভুজ, চারকোনা ফর্ম, ও stripe খুব বেশি

০ বর্তমানকালের কম্বল গুলো সাদা নয়, অনেক রং ও বিভিন্ন ভাবে সরল রেখায় প্রকাশিত

০ বম, পাংখুয়া ও লুসাইদের সাথে চাকমা কাপড়ের বুনন, রং, ডিজাইন ও মোটিফের পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

বমদের ঐতিহ্যের মধ্যে প্রধান বিষয় হলো জুম চাষ। তারা ধান, ভূট্টা, কার্পাস, হলুদ, আদা অন্যান্য জিনিস চাষাবাদ করে। এরমধ্যে অন্যতম একটি হলো কাজুবাদাম। তাদের কারুশিল্পের মধ্যে সূতা দিয়ে তৈরি কম্বল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তাদের পোশাকের রং ও ডিজাইনের বৈচিত্র্যের জন্যেও তারা বিখ্যাত। জুমচাষের জমির অভাব, তদুপরি উর্বরতা হ্রাস এবং ক্রমাগত বনভূমি উজাড় হওয়ার ফলে বমদের জীবন ধারা বদলে যাচ্ছে। উপরন্ত, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাদের জীবনাচারেও অনেক পরিবর্তন দেখা যায় আর এর প্রভাব তাদের পেশার উপর পড়েছে।[৭১] ব্যাপক জুমচাষের বদলে তারা অন্যান্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেছে। এদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পশুশিকার, তাঁতশিল্প এবং বাঁশ বেতের শিল্পও যথেষ্ট কার্যকর। বমদের মধ্যে শিক্ষার হার কম এবং এ কারণে কর্মক্ষেত্রে চাকুরীজীবীর সংখ্যাও কম। বর্তমানে সব ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায়।[৭২]

বম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইন :

পোশাক-পরিচ্ছদ :

মাধ্যম– মাধ্যম হলো কার্পাস, উল, জরি, মখমল।

বম সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত পোশাক খুব সাদাসিদে। তারা তাদের নিজস্ব তৈরি কোমর-তাঁত প্রস্তুত করা পোশাক-পরিধান করেন। মেয়েরা করচাই (শার্টের মতো) পরে আর বুক বাঁধে এক টুকরা আলাদা কাপড়ে। এছাড়া নকশাযুক্ত মোটা কাপড়ের তৈরি 'নোফেন' (নিম্নাংশের কাপড়) বম মহিলারা কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত পরিধান করেন। বমদের কারু শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প প্রধান। বস্ত্রের মধ্যে তাদের কম্বল বিখ্যাত। বমরা মোটা জিনিস কম্বল, গায়ের চাদর বুনতে অত্যন্ত দক্ষ। তাদের কম্বল পুরু ও নরম।

রং :

চাকমাদের কাপড়ের চেয়ে এদের রং বেশ আলাদা। চাকমাদের প্রধান রং লাল। এদেও কাপড়ে লালের প্রাধান্য না হয়ে অন্য রঙের প্রাধান্য আছে। যেমন– হলুদ, নীল, খয়েরী। বর্তমানে হালকা রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। তাদের রঙের ব্যবহার ও স্ট্রাইপ অন্যরকম। একই রকম চিকন স্ট্রাইপের বদলে ও একই সমান রঙের স্ট্রাইপের বদলে প্রায় জায়গায় মোটা লাইন দেখা যায়। স্ট্রাইপগুলো চওড়া আর গাঢ় নীলের মধ্যে হালকা গোলাপী রং দেখা যায় যা চাকমাদের মধ্যে (একই কাপড়ে দুই রং ,একটি মূল অন্যটি মিশ্রিত রং) দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তারা বুনন ও গঠনের বৈশিষ্ট্যটাও আলাদা যেমন- মেয়েদের পিননটা চাকমাদের মতো অত চওড়া নয় খাটো। ডিজাইন ও গঠনটাও ভিন্ন, যেমন– সোনালী রঙের পিননের মধ্যে সাদা রঙের বড় বড় চারকোণা ডিজাইন। সাদা রঙের ব্যবহার ও বড় খোপ বা চারকোণা গঠন চাকমাদের চেয়ে আলাদা।

'নোফেন' ' এর দুধারে লম্বালম্বিভাবে ছোট ছোট পুঁতি লাগানো থাকে। পুঁতি ছাড়াও নোফেন হয়। রৌপ্য ও ধাতুর তৈরি কোমরবন্ধনী দিয়ে 'নোফেন' কোমরে আটকে থাকে। 'নোফেন' সাধারণত দুধরনের হয়ে থাকে। যথা– ফেনপেল ও ফেনপোম। ফেনপেল পরার জন্য নানান ধরনের কোমরের বিছা ব্যবহৃত হয়। এ বিছাগুলির মধ্যে রাংখাতে, বাংখাপি, রিচিকে, তাংকারী, তাই পিয়ার ইত্যাদি বিছা উল্লেখযোগ্য। 'ফেনপোম' ইংলিশ স্কাট এর ন্যায় সেলাই করা।[৭৩] এটি কাপড় পেঁচিয়ে সেলাই করা হয় বলে পরিধানের সময় কোমর বেল্টের তেমন প্রয়োজন হয় না। নোফেন তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের নকশা ব্যবহার করা হয়। বম পুরুষরা কোমর তাঁতে তৈরি লাইকর ও রেনতাক পোশাক পরিধান করত। এছাড়া পুরুষরা ধূতির মতো ছোটকাপড় পরিধান করত । এইসব কাপড় তারা নিজেরা তৈরি করত ।[৭৪] প্রাচীনকালে বমরা তাদের শিকার করার জন্য পশু চামড়া দিয়ে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরি করত এবং এ পোশাক পরিধান করেই তারা শিকার করত অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হত।

অলংকার :

মাধ্যম: বম রমণীদের ব্যবহৃত অলংকারগুলি সাধারণত রূপা, লোহা, পিতল প্রভৃতির ধাতুর বা পুঁতির দ্বারা তৈরি।

বম রমণীরা আগে গলায় বিভিন্ন ধরনের পুঁতির মালা পরতেন। এগুলি লাল, নীল, সবুজ ও সাদা রঙের হত। এছাড়া তারা গলায় রূপার মালা, আধুলী মালা, সিকি মালা, রূপার চেইন জাতীয় অনেক রকম অলংকার ব্যবহার করতেন। বম রমণীরা কানে নুবেহ অর্থ হলো কান ফুল, হাতে জাকসিয়ার অর্থাৎ রূপার চুড়িসহ বিভিন্ন অলংকার পরতেন। পুরুষ ও রমণী উভয়ই চুলে নিজেদের তৈরি কাঠের অথবা বাঁশের চিরুণী (সামথিহ্) গুজে রাখে। এছাড়া মেয়েরা মাথায় চুলের কাঁটা (রিকিলহ্), কোমরে কোমরবন্ধ হিসেবে ঐতিহ্যবাহী রূপার বিছা ব্যবহার করেন। অধিকন্তু বিশেষ গলার হার অর্থাৎ 'তাংকা ভাল' ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। বম পুরুষেরা অতীতে মহিলাদের ন্যায় কান ফোটাতেন এবং চুলে ঝুঁটি বাঁধতেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন সময় মৌসুমী ফুল নিজেদের কানে ও খোঁপায় পরতেন। বম পুরুষরা রূপার

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত বালা হাতে পরতেন। তবে আধুনিক কালে বম পুরুষেরা কান ফোটায় না বা তাদেরকে চুলের ঝুঁটি বাঁধতে দেখা যায় না। বমরা অতীতের হাতির দাঁতের তৈরি কান ফুল, হাতের কুচি, আংটি ইত্যাদি পরতেন। জুমের ফুল দিয়ে বম রমণীরা বৈচিত্র্যপূর্ণ ফুলের মালা তৈরি করে এবং গির্জা সাজান। বমদের অংলকার ঐতিহ্যবাহী। তারা তাদের অলংকার পরিধানের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিকে পরম যত্নে ধরে রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, আগে বমরা মাথায় খণ্ড কাপড় পরতেন ও পালক ব্যবহার করতেন ।[৭৫]

হস্তশিল্প ও গার্হস্থ্য সামগ্রী : বমরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছে। তারা বন থেকে প্রাপ্ত গাছ, বাঁশ, ছণ, পাতা, তুলা, ঝুমুর পাতা এবং পশুর চামড়া, পাখির পালক ও লেজ ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতেন। তারা বেত ও বাঁশ দিয়ে নানা জাতের ঝুড়ি, বর্ষার দিনে ব্যবহৃত 'ফালাউ' টুপি ও 'সিলিকন' (অর্থাৎ ঝুমুর বাঁশ থেকে প্রস্তুতকৃত) তৈরি করতেন। বাচ্চাদের দোলনা ও মাছ ধরার ফাঁদ ইত্যাদি জিনিস তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি করতেন । কাঠের ব্যবহারও বম সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

তারা মাচাং ঘরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে বাঁশ বা কাঠ ব্যবহার করেন। চরকা, ভাতের পাত্র, শূকরের খাদ্য পরিবেশনের পাত্রসহ অন্যান্য কাজে বমরা কাঠের ব্যবহার করে থাকেন। তারা ধান ভানার কাজে এক জাতীয় দুখল ('সুমতৌ') কাঠ দিয়ে তৈরি করেন। আর তাদের ('সুমমানখং') 'ঢেঁকি'ও কাঠের তৈরি। জুমে উৎপাদিত লাউয়ের খোলকে তারা পানি রাখার কাজে ব্যবহার করেন। এ জন্য প্রথমে লাউয়ের আগার দিকে মুখ তৈরি করে ১০-১২ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে পঁচানোর পর ভেতরের বিচি ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করে রৌদ্রে অথবা চুলায় শুকিয়ে তারপর পানি রাখার কাজে ব্যবহার করেন। অতীতে বমরা পানি রাখার কাজে শুধু লাউয়ের খোল ব্যবহার করতেন। লাউয়ের খোল বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। বমরা উঁচু পাহাড়ে বাস করে বিধায় তাদের গ্রামের নিচে ছোট ছোট ঝিড়ি থাকে। ঝিড়ি থেকে পানি তোলার কাজে লাউয়ের খোলের ব্যবহার খুবই উপযোগী। আকারে ছোট ছোট লাউয়ের খোল বম ছেলেমেয়েরা পানি ভর্তি করে তাদের ঝুড়িতে বহন করে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। ছোট-বড় সবাই 'তি ওম' অর্থাৎ লাউয়ের খোল ভর্তি করে ঝুড়িতে বহন করে বাড়িতে নিয়ে যান, বাড়ির লোকজন সবাই এই পানি ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জুমের উৎপাদিত লাউয়ের মধ্যে এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি লাউ চামচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।[৭৬] এ জাতীয় লাউ আত্মরক্ষার কাজে ধারালো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। লোহার তৈরি দা-এর সাহায্যে বনজঙ্গল কাটা হয় এবং জুমঘর ও বাড়িঘর তৈরি করা হয়।

উল্লেখ্য আদিকাল থেকে বমরা লোহার তৈরি দা ব্যবহার করেন। বন্য ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার কাজে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হত। বমদের ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রগুলির মধ্যে বল্লম, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি রয়েছে।

বমদের আহার্যের মধ্যে ভাত ও মদ প্রধান দ্রব্য।[৭৭] বমরা ভাতের সাথে মাছ ও মাংস খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে মাছ পাওয়া না যাওয়ায় পরিমাণমতো মাছ তারা খেতে পান না। বমরা লতাপাতা অর্থাৎ শাকসব্জি তেমন বেশি খান না।তারা শুটকি মাছ খেতেও অভ্যস্ত। বমরা কাঁচা বাঁশের ভেতর নানা জাতীয় তরকারি রান্না করেন। ঝিড়ি থেকে নানান জাতীয় মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি পেলে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করেন।[৭৮] প্রাচীনকাল থেকে বমরা শিকারী জাতি। তারা বন্য জীবজন্তুর মাংস বেশি খেয়ে থাকেন। বমরা মাংস আগুনে সেক দিয়ে শুকায় এবং শুকনা মাংস রান্না করে খায়। শুকনা মাংস দীর্ঘ দিন রাখা যায়, তাই বমরা শুকনা মাংস বেশি পছন্দ করেন। পাহাড়ী এলাকায় সবুজ শাকসব্জি কম পাওয়া যায় বলে বমরা শাকসব্জি কম খান। পাহাড়ী অঞ্চলে সুস্বাদু খাদ্য হলো বাঁশ কোড়ল। জংলি তালগাছের কচি শাঁস, বেতের কচি-শাঁস, জংলি কলাগাছের থোড় ও মোচা এদের অন্যতম উপাদেয় খাদ্য। পূর্বে কলাপাতায় বেঁধে শাকসব্জি আগুনে সিদ্ধ করে তৈরি খাবারই তাদের পছন্দ ছিল।

গৃহ ও বাসস্থান : বমরা দু'চালা বিশিষ্ট মাচাংঘর তৈরি করে বসবাস করেন। বাসগৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রেও বমদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতে ভালবাসেন। মাচাং ঘরে থাকতে অভ্যস্ত। বন্য ও হিংস্র জীবজন্তু থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মাচাং ঘর তৈরি করা হয়। সাইক্লোন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা আলাদাভাবে সাইক্লোন শেলটার তৈরি করেন। সাইক্লোন শেলটারটি বম ভাষায় 'থিলইনতে' বলে অভিহিত করে। অতীতে বমরা ঝুমুর পাতা দিয়ে ঘরের চাল আবৃত করতেন এবং পরবর্তী সময়ে ছন দিয়ে আবৃত করেন। বর্তমানে টিন দিয়ে পাড়াগাঁয়েও ঘরের ছাউনী দিতে দেখা যায়। বমরা পাহাড়ের সম্পদ গাছ, বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতির উপকরণ দ্বারা মাচাং ঘর তৈরি করে। মাচাং ঘরকে বম ভাষায় 'ইনচুংচয়' বলে থাকে।[৭৯] ঘরের নিচে গৃহপালিত শূকর , ছাগল, গরু প্রভৃতি রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খড় দিয়ে তৈরী বসার পিঁড়ি

মূল ডিজাইন

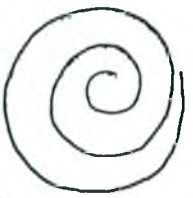

শামুক মোটিফ

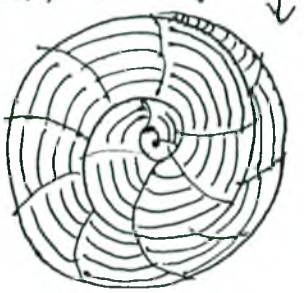

পাট ও কাঠ দিয়ে তৈরী টুল।

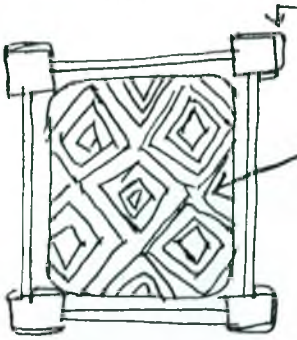

ঢেউ খেলানো "লিক লহরি" ডিজাইনে এটা বোনা হয়েছে।

ছাতার হাতল

বাঁশ দিয়ে তৈরী

ছাতার ভেতরের বাঁধন।

ঝাড়ু, পাট ও নারিকেল গাছের শলা দিয়ে তৈরী।

ঘরের দেয়ালে লাল রঙে লেপে নকশা করা যেন নারিকেল গাছের পাতা।

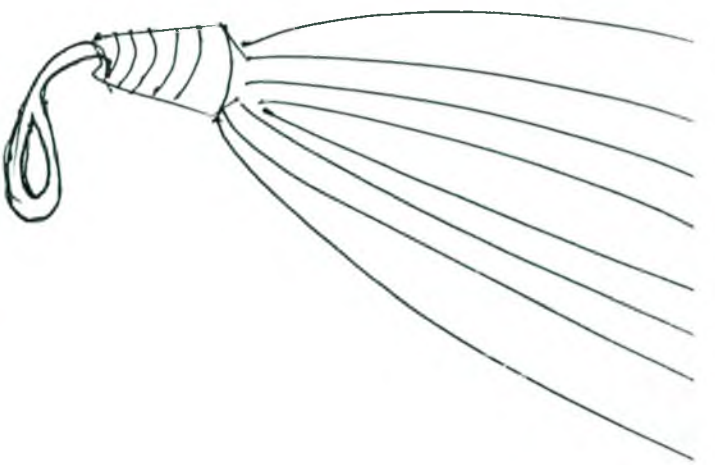

Dhaka University Institutional Repository

মাচাং ঘরের নিচের অংশ বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়। বমদের ঘর ছোট বা বড় তা পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কারও পরিবারে যদি যুবক থাকে তা হলে মূল ঘরের সাথে সংযোগ রেখে আলাদাভাবে ছোট আরেকটি ঘর তৈরি করা হয়।

চারুশিল্প : চারুশিল্পে তাদের অভিজ্ঞতা সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'একজন শির্ক্ষাথী শিল্পকলায় শিক্ষা নিয়ে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে একজন নাথান বম। তিনি ভাস্কর্য বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। তিনি ছবিও আঁকেন। তার ছবির মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। তিনি আদিবাসীদের চিরাচরিত চিত্রই ফুটিয়ে তুলেন। যেমন– ধান কাটারত মানুষ, নদী বয়ে যাচ্ছে ,হরিণ বা কুকুর বনের মধ্যে দেখা যায়, দূরের পাহাড়ে জুম চাষ হচ্ছে।[৮০] আরেকজন শিল্পীর খোঁজ পাওয়া যায়, নাম জিন মুন বম। দুইজনই বান্দরবনের অধিবাসী। জিন মুন বম এর ছবিও একই ধরনের।

সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারু শিল্প

সাঁওতালদের ঐতিহ্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাদের তীর ও ধনুক।[৮১] এছাড়া কারুশিল্পের মধ্যে পড়ে তাদের ঘরের মধ্যে আঁকা আল্পনা, ঘরের দেওয়ালে অঙ্কিত নকশা এবং খড় দ্বারা নির্মিত বসার পিড়ি[৮২], বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন রকমের ঝুড়ি ও ছাতা, পাটের বুননে ও কাঠ দিয়ে তৈরি বসার টুল, নারিকেল পাতার শলা দিয়ে তৈরি ঝাটা[৮৩], ঢোল বা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

তাদের কারুশিল্পের মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইন :

গৃহ ও গৃহস্থালী : তাদের গৃহ ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকৃতির । গৃহ শণ ও খড়ের[৮৪], দেয়াল মাটির, দরজা একটি। তাদের ঘর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। গৃহে আসবাব-পত্র কম, কাঠ, বাঁশ ও পাটের রশি দিয়ে তৈরি খাটিয়া দেখা যায় যা আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।আগে তাদের থালা ও বাসন কাসার তৈরি ছিল। রান্নাঘরে শিলপাটাও দেখা যেত। এছাড়া সাঁওতালরা চাড়ি, টুকরি, কুলো, চালুন, ডালা, ঝাঁটা, নাঙ্গল-জোয়াল ব্যবহার করে যা অন্য আদিবাসীদের থেকে একটু আলাদা সংস্কৃতি, জীবন মনে করিয়ে দেয়।

শিকারের হাতিয়ার : বিভিন্ন ধরনের তীর ও ধনুক তাদের পুরনো হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্কার ও প্রসাধন : সাঁওতাল রমণীরা সৌন্দর্য প্রিয় । মাথায় মহুয়ার তেল ও কপালে, সিথিতে, হাত-পায়ে আলতা ও মাথায় সিঁদুর দিয়ে থাকে। চোখে কাজল ও সুরমা ব্যবহার করতেও দেখা যায়। নানা উৎসবে রূপা ও অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করে। তারা গলায় হাসুলি মালা ও তাবিজ, কানে দুল, নাকে নথ ও মাকড়ী, সিথেই সিথিপট্টি, হাতে বালা ও বটফল, বাহুতে বাজু, কোমরে বিছা, পায়ে বাঁকী বা বঙ্কী ,হস্তাঙ্গুলে অঙ্গুরী ও পদাঙ্গলে বটরী ব্যবহার করে।[৮৫] তারা চুলে শিমুলফুল, চম্পাফুল পরে। খোপায় কাটা পরে, রঙিন ফিতাও চুলে বাঁধে। সাঁওতালরা গা পরিষ্কার করতে মাটি ব্যবহার করত।

বাদ্যযন্ত্র : বাঁশী, সিঙ্গা, মাদল প্রভৃতিসহ ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সাঁওতালরা ব্যবহার করে থাকে। এই সব বাদ্যযন্ত্র তাদের নৃত্য ও গীতকে সমৃদ্ধ করে, সমৃদ্ধ করে জীবনকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ : সাঁওতালদের পোশাকের বিশিষ্টতার কথা স্বীকার করতেই হবে। আগে গরীব ঘরের পুরুষদের প্রধান পরিধেয় ছিল নেংটি। গ্রাম বাংলার মানুষ সবাই এই পোশাকটি চেনে, এমনকি এটা পরিধানের অভিজ্ঞতাও রয়েছে অনেকের। এক হাত চওড়া তিন হাত লম্বা একখণ্ড কাপড় দিয়ে নেংটি তৈরি করা হয়– কোনো মিল-ফ্যাক্টরিতে নয়, বাড়িতে হাত দিয়ে টেনে কাপড় ছিঁড়ে। নেংটি ছাড়া সাধারণত গরীব পুরুষ লোকেরা অন্য কাপড় পরত না। তবে হাট-বাজারে ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার সময় একটা চাদর পরত । এটা আকারে ৩ থেকে ৫ হাত লম্বা হয়। ধনী অধিবাসীরা ৫ হাত লম্বা ধূতি কাপড় পরত এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধত । উল্লেখ্য, স্বচ্ছল পরিবারের সাঁওতাল পুরুষরা মোটেও নেংটি পরিধান করত না। তাদের কেউ কেউ ধূতি, কেউ কেউ লুঙ্গি পরিধান করে। এছাড়া শিক্ষিত সাঁওতালরা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অনুরূপ প্যান্ট-শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি প্রভৃতি ধরনের আধুনিক পোশাকই পরিধান করে। তাদের ঐহিত্যবাহী পোশাক উৎসবে দেখ যেত ।[৮৬]

মেয়েদের পোশাক মোটা এবং তারা মোটা কাপড় পরিধান করত।[৮৭] আগে তারা এক খণ্ড ফতা কাপড় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কোমরে পেঁচাত এবং অন্য একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে উপর দিকে বাম কাঁধ দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিত। আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রমণীদের টিপিক্যাল বেশভূষার এই পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য অনন্য। উল্লেখ্য, যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তারা কিন্তু বাঙালি মেয়েদের মতোই শাড়ি, ব্লাউজ এবং সায়া পরিধান করে। তবে গ্রামের সাঁওতাল রমণীরা বা ব্রা ব্যবহার করে না।

Dhaka University Institutional Repository

চারুকলার বিবরণ : সাঁওতাল সংস্কৃতি উচ্চাঙ্গ শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ, উদাহরণস্বরূপ নৃত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার নাম করা যায়।

চিত্রকলা : চিত্রকলায় উল্লেখযোগ্য সাঁওতালদের ব্রত-অনুষ্ঠানের পূজামণ্ডপ, ঘর-বাড়ির দেয়াল ও হাড়ি কলসির (চিত্রমালাতে ছবি দেওয়া হয়েছে) গায়ে যে চিত্রের সমাবেশ তা আধুনিক যুগের চিত্রশিল্পকে হার মানায়।[৮৮] এই সব চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে দেব-দেবীর বন্দনা চিহ্নও থাকে। এইসব চিত্রে টোটেম সম্পর্কিত ধারণাও স্পষ্ট। এছাড়া সাঁওতালদের গৃহে, দেয়ালে বিভিন্ন চিত্র দেখা যায়।[৮৯] যেমন– ফুল, গাছ, উড়োজাহাজ, বেজি ও পাখির ছবি। এতে নানারঙের সমারোহও পরিলক্ষিত হয়। দু'একজন শিক্ষিত চারুশিল্পীর কথা শোনা যায় তবে তাদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি।

উল্কি আঁকা : সাঁওতালরা উল্কি-চিহ্ন অঙ্কিত করে।[৯০] পুরুষরা বামহাতে তিন, পাঁচ, সাত বেজোড় সংখ্যায় উল্কি আঁকে। তেমনি মেয়েরা হাতের কব্জিতে, বাহুতে, বুকে এসব আঁকে। বার থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে উল্কি আঁকা হয়।[৯১] নারীর মুখেও উল্কি আকাঁ দেখা যায়। [৯২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১ C.Von.fuerer, Edited, *Asian Highland and Societies : An Anthropological perspective*, Almut mey, New Delhi, 1981, Page- 223

২ জিতেন চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ব্যবহৃত বাঁশের তৈরী বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত সংস্কৃতি*, সুসময় চাকমা সম্পাদিত, *বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, সংখ্যা-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৪

৩ বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৭৯

৪ প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, *পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি*, সুফিয়া খান অনূদিত, বাংলা একাডেমী-১৯৯৭, পৃষ্ঠা -০৫

৫ জিতেন চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ব্যবহৃত বাঁশের তৈরী বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত সংস্কৃতি*, সুসময় চাকমা সম্পাদিত, *বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, সংখ্যা-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৬

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৫৬

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৫৮

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৫৯

৯ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৬০

১০ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৬১

১১ বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত ,*পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৭৮

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৭৮

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৭৮

১৪ প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, সুফিয়া খান অনুদিত, বাংলা একাডেমী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-০৫

১৫ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৭৫

১৬ H.H. Risely,*Tribes and Castes of Bengal*, Printed at the Bengal Secretariat Press, Calcutta, India, 1891, V-I, Page No-171

১৭ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৭৭

১৮ বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮০

১৯ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৮২

২০ অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৪, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৫২৮

২১ বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, *চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি*, বিপ্রদাস বড়ুয়া সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮২

২২ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৮৩

২৩ প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, সুফিয়া খান অনূদিত, বাংলা একাডেমী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-০২

Dhaka University Institutional Repository

২৪ উদ্ধৃত, প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, সুফিয়া খান অনূদিত, বাংলা একাডেমী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫

২৫ প্রফেসর পিয়েরে বেসাইন, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, সুফিয়া খান অনূদিত, বাংলা একাডেমী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-০২

২৬ জাফর আহমেদ হানাফি, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা নং-৬৩

২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং-৬৩

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং-৬৩

২৯ হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা নং-৪৫

৩০ *প্রাগুক্ত*

৩১ *প্রাগুক্ত*

৩২ www.chakma.org

৩৩ *www.chakma.org*, (Proffessor Richard Crevier, Institute of Fine Arts, Rennes, France.)

৩৪ Ibid

৩৫ মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *কনক ও তার চিত্রকলা*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৬

৩৬ মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *কনক ও তার চিত্রকলা*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৮, পৃষ্ঠা-৫৫

৩৭ *প্রাগুক্ত* (*কনক চাঁপার লেখা থেকে*), পৃষ্ঠা-১৫

৩৮ মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *কনক ও তার চিত্রকলা*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৮, পৃষ্ঠা-২২

৩৯ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৯০

৪০ E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent of Govornment Printing, Calcutta, India, 1872, Page No-62

৪১ *Ibid*, Page No-61

৪২ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪০০

৪৩ E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent of Govornment Printing, Calcutta, India, 1872, Page No-66

৪৪ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২২৬

৪৫ জামদানী শাড়ির সাথে ডিজাইনে মিল পাওয়া যায়

৪৬ E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent of Govornment Printing, Calcutta, India, 1872, Page No-66

৪৭ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৪০৩

৪৮ গারো পরিবারের প্রধান প্রফুল্ল দিব্রাসহ তার পরিবারের সদস্যদের মধুপুরে পায়, তারিখ , ১০ আগস্ট ২০১০

৪৯ Robbins, Burling, *The Strong Women of Modhupur*, UPL, 1997 Dhaka, Page no-112.

৫০ *Ibid*, Page no-112. (MCC একটি NGO পুরা নাম Menonite Central Committee)

৫১ গারোদের মাছ ধরা পাত্রটি দেখা যায় মধুপুরের গারো মিউজিয়ামে (২৮/৮/২০১০)

৫২ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭,পৃষ্ঠা- ৪০৬

৫৩ আধুনিক Installation Art হলো "স্থাপনা শিল্প"

৫৪ *সোল হাওচার ৩য় যৌথ প্রদর্শনী, (ক্যাটালগ থেকে নেওয়া ছবি ও সমালোচনা)* চারুকলা অনুষদ, জয়নুল গ্যালারি, ২০০৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

৫৫ E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, India, 1872, Page No-48

৫৬ এ.কে শেরাম সম্পাদিত, *মৈরী*, বার্ষিক মণিপুরী ভাষা উৎসব সংখ্যা, ৭ম ২০১০, সিলেট, পৃষ্ঠা-৫১

৫৭ অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৪, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৫৬৯

৫৮ *প্রাগুক্ত*

৫৯ পোশাকটি দেখা যায় মণিপুরী মিউজিয়াম, সুবিদ বাজার, সিলেটে, ৮ মে ২০১০

৬০ মহিলাদের দেহের উপরি-অংশে পরিহিত পোশাক 'ফানেক'। পোশাকটি দেখা যায় মণিপুরী মিউজিয়াম, সুবিদ বাজার, সিলেটে

৬১ E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, India, 1872, Page No-51

৬২ *Ibid*, Page No-50

৬৩ S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetter- Sylhet*, Dhaka, 1971, Page-113

৬৪ এ.কে শেরাম সম্পাদিত, *মৈরী*, বার্ষিক মণিপুরী ভাষা উৎসব সংখ্যা, ৭মে ২০১০, সিলেট, পৃষ্ঠা-৬১

৬৫ সাক্ষাৎকার, কবি এ.কে শেরাম, প্রধান সম্পাদক মৈরী, ৮ মে, ২০১০, সিলেট

৬৬ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১১১

৬৭ *প্রাগুক্ত* ,পৃষ্ঠা নং-১১৭

৬৮ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৭৬

৬৯ বান্দরবন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে এগুলি দেখা যায়, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০

৭০ সাপু ত্রিপুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের এমএফএ ক্লাসের ছাত্র(২০১১)

৭১ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১৩৯

৭২ ফরমাং বমের সাক্ষাৎকার , ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০, ফারুকপাড়া, বান্দরবন

৭৩ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১৪০

৭৪ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২০২

৭৫ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২০১

৭৬ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১৪১

৭৭ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা-২০২

৭৮ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-১৪১

৮৯ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা নং-১৪২

৮০ বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলার স্টলে তার সাথে (জিম মুন বম) দেখা হয়

৮১ কাজমা-কাকলহাট পৌরসভার গোদাগাড়ি উপজেলার ভিম হাসদার (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) বাড়িতে তীর-ধনুক দেখা যায় (৬/৯/২০১০)

৮২ সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট রাজশাহীতে খড় দ্বারা নির্মিত টুল দেখা যায় (৬৭/৯/২০১০)

৮৩ সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট রাজশাহীতে নারিকেল পাতার শলা দ্বারা নির্মিত ঝাটা দেখা যায়(৬/৯/২০১০)

৮৪ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩০১

Dhaka University Institutional Repository

৮৫ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৩৩১

৮৬ বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলায় তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরুষের পোশাক দেখা যায়

৮৭ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩০১

৮৮ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২৯৮

৮৯ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৩৩২

৯০ আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩০০

৯১ মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা নং-৩২৫

৯২ মুখে উল্কি অংকনকৃত নারীর ছবি শেষে চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারু ও চারুশিল্পের পরিবর্তন এবং বর্তমান অবস্থা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনে, সংস্কৃতিতে, উৎসবে তথা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। এ পরিবর্তন এসেছে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রয়োজন ইত্যাদির তাগিদে। সারা পৃথিবী এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনে তাল মিলিয়ে চলার কারণেও এ পরিবর্তন এসেছে। এ অধ্যায়ে এ সকল পরিবর্তন সর্ম্পকে আলোকপাত করা হয়েছে।

চাকমা কারু ও চারু শিল্পের বর্তমান অবস্থা :

কারুশিল্প নৃ-গোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে আপাদমস্তক সম্পৃক্ত। তাদের জীবন ও সংস্কৃতি একই। আর তাদের কারুশিল্প বলতে আমরা বস্ত্রশিল্প, বুনন শিল্প, অলংকার বাদ্যযন্ত্র, প্রসাধন শিল্প, হাতিয়ার, খাদ্যদ্রব্য, পাদুকা, প্রতিদিনের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, ক্রীড়া, এমনকি ঘর, কাঠ, বাঁ ও বেতের নানাপ্রকার দ্রব্য ,তথা প্রকৃতি নির্ভর দ্রব্য ইত্যাদি বুঝি। সামাজিকভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের পরিবর্তন হচ্ছে। তারা শিক্ষাগ্রহণ করছে। অন্য দিকে বন উজাড় হচ্ছে, হচ্ছে জুম চাষের জমির স্বল্পতা। এনজিও কর্মতৎপরতা, ধর্মান্তর, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জীবনধারণ কলাকৌশল রপ্ত করার ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। তারা চাকুরী করছে, এনজিও-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে, আধুনিক পেশায় যুক্ত হচ্ছে। তাদের বাঙালি ও অন্যান্যদের সাথে মিলে মিশে কাজ করা লাগছে। এতে করে গ্রাম ছেড়ে শহরে, শহর থেকে নগরে বসবাসও করতে হচ্ছে, নিজেদের প্রয়োজনে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।

চাকমাদের ঐতিহ্যের প্রাচীন দিকগুলো ছিল :

১। বাঁশের বিভিন্ন ধরনের পাত্র আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ি

২। তাঁতের বস্ত্র

প্রথমে তাঁদের বাঁশের দ্রব্যতে আসি, এই ঐতিহ্য আর আগের মতো নেই। এই দ্রব্যসামগ্রীর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল Natural বাঁশের তৈরি, তাতে রং করা হত না। রাঙ্গামাটি শহরে বনরূপা,তবলছড়ি এলাকায়

Dhaka University Institutional Repository

ও খাগড়াছড়ির (কলেজ রোড) এলাকাসহ বাবুছড়া-পানছড়ি এলাকাতে ঘুরে দেখেছি। তাদের ঐতিহ্যবাহী ঘর এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়, তবে রাঙ্গামাটির মারিষ্যার ঐদিকে ঘরগুলোতে বাঁশের ব্যবহার বেশি দেখা যায়, এগুলো চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী ঘরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। খাগড়াছড়ির তবলছড়ি বাসাগুলোতে উপরে ছনের/টিনের চাল, বাঁশের বেড়া, খুঁটিগুলো কাঠের, রান্না ঘরের চূলাও বাঙালিদের মতো । ফসল রাখার জন্য বাঁশের তৈরি বড় পাত্র দেখা গেল যা চাকমাদের ট্রাডিশনাল কারু দ্রব্য, (পিঠে বাঁধা, ফসল রাখার পাত্র)। হাতির দাঁতের তৈরি ফুলদানী, অলংকারপাত্র, বাঁশের দোলনা, চালোন, পানসুপারী রাখার বাঁশের/বেঁতের তৈরি পাত্র কিছুই দেখা গেল না।[১]

শহরের মধ্যে ঘর দেখলাম, সেখানে চাকমাদের ঘরের ঐতিহ্য আর নেই। বাঁশের চাঁটাই ও আধুনিক বুনন সেখানে দেখা যায়। মোটা চওড়া কাঠ দিয়ে পিলার দেওয়া হয়েছে। রাঙ্গামাটির মন্টু বিকাশ চাকমার বাড়িতে উপরে টিন দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে শুধুমাত্র হুক্কাকে ক্রাফট হিসাবে পেলাম, যা বাঁশের তৈরি। প্রতিদিন রাতে খাওয়ার পর এ বাড়ির গৃহিণী এটি ব্যবহার করেন । শোবার ঘরের মধ্যে ছোট্ট বাঁশের কসমেটিক রাখার একটি পাত্র দেখেছিলাম। এছাড়া কোনো ট্রাডিশনাল দ্রব্য, কারুদ্রব্য চোখে পড়ে নি। ঘরের ভেতওে,দেখলাম আধুনিক বাঙালি নকশার আলমিরা, তাতে আধুনিক ফুল-লতার ডিজাইন, ড্রেসিং টেবিল কাপড় রাখার ওয়্যারড্রোপ, কেনা বিছানা চাদর, চাদরের রং হলুদ ও গোলাপী। বাড়িতে কাঠের সোফা ছিল। ঘরের টিভিতে আধুনিক পর্দা দেয়া। কোণায় ছোট্ট টুল, সেখানে তাদের তৈরি ছোট্ট বাঁশের পাত্রের মধ্যে ফুল দেখা গেল যা কৃত্রিম, প্লাস্টিকের ফুল। অতএব আগের ঘর নেই, বাড়িতে একটু বাঁশের ছোঁয়া আছে তবে তার ডিজাইন আধুনিক ধাঁচের।

কাপড় প্রসঙ্গে আসি। এক সময় চাকমা ছেলেরা দেহের উপর দিকে গেঞ্জির মতো , ফতুয়ার মতো একটা পোশাক পরত যা সাদা। নিচে পরত ধূতি। ৫০ থেকে ৬০ বছর আগে এটাই ছিল কাপড়। এখন ২/১ জন বৃদ্ধকে এভাবে দেখা যায়। মূলত মেয়েরাই তাদের বস্ত্রশিল্পকে ধরে রেখেছে ।

গ্রামেও দেখেছি, শহরেও দেখছি মেয়েরা তাদের ট্রাডিশনাল কাপড় পরছে। তবে তারা কাজের সময় ব্লাউজের মতো একটি কাপড় উপর পরে, তখন খাদী বা বক্ষবন্ধনী পরে না।

ঐ বাসাতে ছোট একটি বাচ্চার ছবি দেখি।জিজ্ঞেস করে জানলাম এটা মন্টু বিকাশের নাতনি। এরপর তাদের রান্না ঘর দেখি সেখানে প্লাস্টিকের চাল রাখার বড় পাত্র, এনামেলের ঘড়া, ঘটি, প্লাস্টিকের সকল ছোট্ট পাত্র দেখি, মিটসেফ দেখি কাঠের, চূলা মাটির। ছিকাটাও ট্রাডিশনাল না, শুধুমাত্র রান্না ঘরটা

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ডিজাইন নিচের ৪টি ধারার মধ্যে ১টি হয়ে থাকে।

আবার Hand loom এর কাপড় বোনার ধারা ও ২ ধরনের

১ম – pattern weaving
সুতার সাথে সব জায়গায় একই ডিজাইন বোনা।

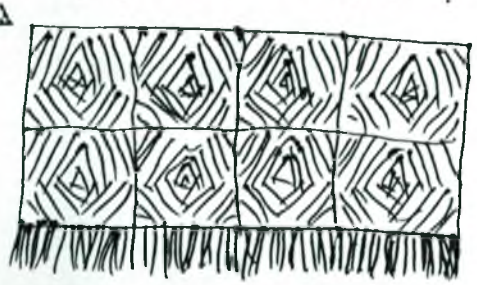

২য় – embroidery weaving.
plain বুনন এর উপর হেভি Texture ও Different কালার দিয়ে জায়গায় জায়গায় বোনা হয়।

চাকমা কাপড়ে pattern weaving-টাই বেশি।

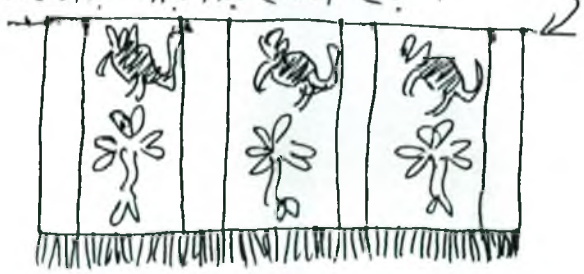

চাকমা plain কাপড় বুননে পদ্ধতিটা সাধারণত এ রকম

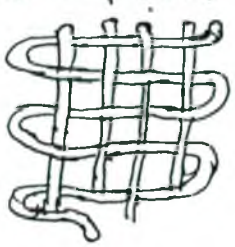

চাকমা কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের pattern দেখা যায় যেমন :-

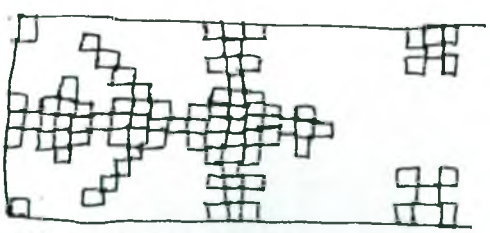

এটা Honey Comb weave মোটিফ

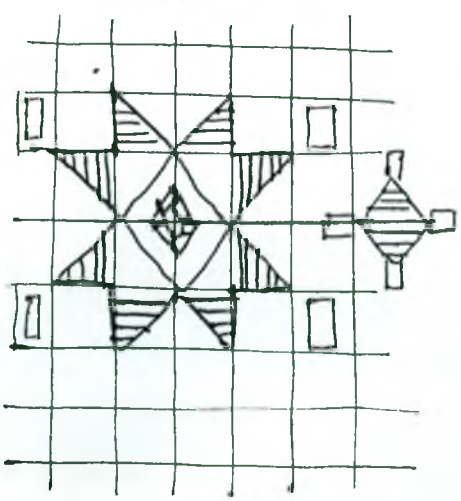

এখানে স্টার ফল মোটিফ দেখা যায়। সেলাই টা চাটাই নকশার মত।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের থেকে অন্যরকম,এখানে বাঁশের বুননের ব্যবহার বেশি । কাঠ না দিয়ে ভেতরে টেবিলের মতো জায়গা করা হয়েছে বাঁশ দিয়েই।বাড়ির ছেলে শহরে চাকরী করে, থাকে অন্য এলাকায়, মেয়ে স্কুলে পড়ছে। তাদের বাসার অধিকাংশ জিনিস বাজার থেকে কেনা। এছাড়া উঠানে নেড়ে দেওয়া কাপড় দেখা যায়, যেখানে মেয়েদের কাপড় বিশেষ করে ৫ থেকে ৬০ বছর বয়ষের, যা বাঙালিদের পোশাক। সোফাতে কুশন দেখলাম সেখানেও ডিজাইন তাদের নয়। হাত পাখাতে দেখলাম বাঙালিদের নকশা, এক সময় তাদের নিজেদের বাঁশের তৈরি হাত পাখা ছিল।

আমি ঐ ফ্যামিলির গ্রুপ ছবি তুলি যেখানে বাবা সাদা শার্ট-প্যান্ট আর মা বাঙালি ব্লাউজ সাথে খাদি পিনন এবং কিশোর ছেলে হাফ হাতা শার্ট-প্যান্ট ও যুবতী মেয়েটি সালোয়ার কামিজ পরা। মোটামুটি ওটাই তাদের বর্তমান পোশাক। যখন পার্বণ আসে তারা চাকমা ড্রেস পরে। তাদের সবচেয়ে শিক্ষিত মেয়েটি শিক্ষকতা করেন ঢাকা শহরে।[২]

বস্ত্রশিল্পের-ড্রেসের মাধ্যম, ডিজাইন, মোটিফ, রং ও আকৃতির পরিবর্তন :চাকমা মেয়েদের পঞ্চাশ বছর আগের পোশাক অতো রঙিন ছিল না– অনেক কাপড়ই একরঙা ছিল বা দুই রঙের ছিল। কাপড়ের পাড়ও কাপড়ের অন্য অংশ আলাদা-আলাদা রঙের ছিল।

সূতা গাব দিয়ে রং করা হত, তা টেকসই ছিল। গত ৩০/৪০ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই চাকমা খাদি ও পিননে সাধারণ লাল, নীল, সবুজ ও কালো রং বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কমলা ব্যবহৃত হয় তবে হলুদের ব্যবহার কম। সোনালী রঙের ব্যবহারও আছে। এই খাদি ও পিননের (বুনন ক্ষেত্র বিশেষে) কাপড়ের দাম ৩,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকার ব্যবধান দেখা যায়।

খাদি ও পিননে ডিজাইনের ক্ষেত্রে সরলরেখার প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ সরল রেখায় তাঁত বোনা সহজ। আগে এই বস্ত্রের মাধ্যম ছিল কার্পাস তুলা, যা ছিল সহজলভ্য। আধুনিককালে খাদি ও পিননে এসেছে পরিবর্তন যেমন : বেগুনী রং মূল রং হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রঙের ভিন্নতা যেমন রঙের সেড অর্থাৎ বেগুনী রংয়ের হালকা সেড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে মূল রং হলো বেগুনী গাঢ়। বর্তমানে এক রঙা খাদি ও পিনন বোনা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

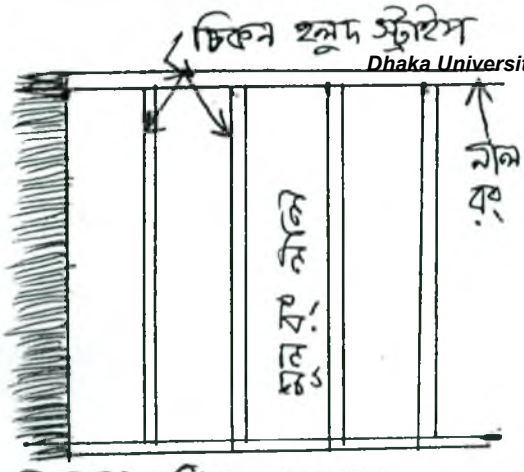

আগের খাদি'র, একাংশ
(সম্পূর্ণ সুতি কাপড়)

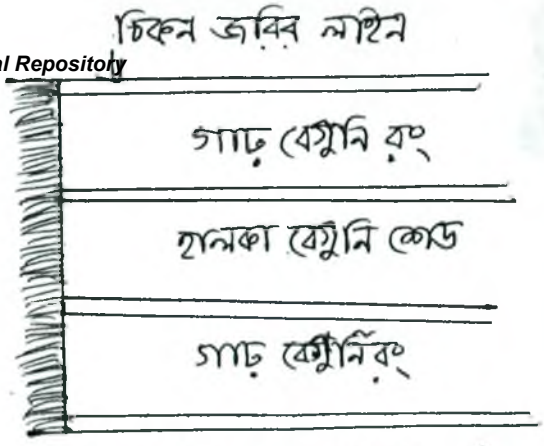

(Silk এর কাপড়)
বর্তমান সময়ের কাপড়, "[redacted]" "পিনন"

পার্থক্যটা দেখুন, সুতার-মাধ্যম, রং ডিজাইন সব খানেই ভিন্ন, আগের খাদি ও এখনকার খাদি ও পিনন।

চাকমাদের কাপড়ে অনেক মোটিফ দেখা যায় :-

১. কাকড়া মোটিফ

২. বিজলো ফুল

৩. আনারস

৪ কুকি ফুল

৫. বড় সতরং

৬.

আদারো বিয়্যা কারাঙ ক্যাপা
(Star Fruit)

৭.

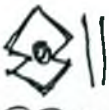

বাইগুন বিজি ফুল

৮.

হেত্ত বা হাতি

৯.

মাচ বা মাছ।

১০. আম/[redacted] কলকা মোটিফ

বর্তমানে চাকমা কাপড়ের অনেক পরিবর্তন এসেছে। তারা তাদের কাপড় দিয়ে সালোয়ার কামিজ, নাইট গাউন, ছোটদের জামা, বড়দের ফতুয়া পাঞ্জাবী, শার্ট এমনকি শাড়ি তৈরীর চেষ্টা করছে (তাদের কাপড়ের ডিজাইন, রং বহাল রেখে)। এছাড়া তারা নিজেদের কাপড়ে অত্যন্ত আধুনিক কাটিং এ কাপড় সেলাই করে ইদানিং পরিধান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বস্ত্রের মাধ্যম : কার্পাস তুলার ব্যবহার কমছে। সূতায় রেশমের ব্যবহার হচ্ছে, জরির ব্যবহার হচ্ছে।

ডিজাইন : ডিজাইন বা গঠন প্রকৃতিতে Change দেখা যাচ্ছে, যেমন খাদিতে পাড়টা খুবই চিকন জরি দিয়ে তৈরি হচ্ছে। মাঝখানে চওড়া লম্বালম্বি মোটা লাইন, তার দু'পাড়ে চিকন জরির লাইন ।এই কাপড়ের মাঝখানে হালকা রং (বেগুনী সেড) দুপাশে গাঢ় বেগুনী চিকন জরির লাইন। এতে রং ,গঠন প্রকৃতি বা মোটিফে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরকম রং ,গঠন প্রকৃতি ও রেশমের ব্যবহার ৩৫ বছর আগে দেখা যায় নি।[৩] কার্পাস তুলার অপ্রতুলতা আধুনিকতা ও আধুনিক বস্ত্রশিল্পে বাঙালির জরির ব্যবহারও এই পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। এখানে শেড এর ব্যাবহার হলেও আসলে রং কিন্তু একটা। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ, ব্লাউজ এমন কি লিপস্টিক, ঘড়ি সবই মিলিয়ে এক রং কিন্তু হালকা গাঢ় কাছাকাছি সেড পরে। এটা তার প্রভাবও হতে পারে। যেহেতু চাকমা বস্ত্র বর্তমান সময়ে বাণিজ্যমুখী, শুধু তাদের পরার জন্যই তৈরি করা হয় না, বিক্রির জন্যও তৈরি হচ্ছে। আধুনিক সময়ে বা এখন হালকা রং কামিজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেড ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন তাদের ডিজাইন বই (আলাম) তে আগে হাঁস, বক, হাতি, পোকার মতো , মাছ বা কচ্ছপের পিঠের মতো কিংবা অষ্টভূজ এর ডিজাইন দেখা যেত। আধুনিক সময়ে তা সরলীকরণ করা হয়েছে। লাইন দিয়েই করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেশি মোটিফের ব্যবহার না করে, Simplification করে সোজা লাইন দেওয়া হয়েছে। লালের ব্যবহার কমে এসেছে। যেমন– সেপ্টেম্বরে (২০১০) রাঙ্গামাটি শহরে দেখলাম নতুন ধরনের বেডসীট। সেখানে ওদের মোটিফটা পরিবর্তন হয়েছে, ওখানে হরিণের মতো (ফোক আর্টে যেমন জ্যামিতিক ফর্মে আঁকা থাকে) মোটিফ দেওয়া হয়েছে, রং খয়েরী-ঘিয়ে যা সচরাচর তাদের কাপড়ে দেখা যায় না।

কাপড়ে সিল্ক ব্যবহার চাকমারাই প্রথম করেছে। ডিজাইন বলতে গেলে কাপড়ে লাইনের ব্যবহার ও স্ট্রাইপ দেখি । স্ট্রাইপটাই বহুল প্রচলিত এবং চারকোণা ডিজাইন, ত্রিভূজ ডিজাইন দেখি, যা সর্বপরি জ্যামিতিক। আগে তাদের কাপড়ের রং খুব গাঢ় ছিল। বর্তমানে আমরা এইসব পরিবর্তন দেখছি রং ও মোটিফে।

এ বছরে তাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে আরেকটি ট্রেন্ড দেখা যায়। চাকমা কাপড় থেকে শাড়ির মতো তৈরি করা হয়েছে। এখানে রং-টা একটু হালকা করা হয়েছে। তবে এখানে ওদের পিননের স্ট্রাইপ,

Dhaka University Institutional Repository

ডিজাইনটাই রয়েছে।এছাড়া বেশ কবছর ধরে তারা তাদের কাপড় দিয়ে বাঙালিদের জন্য পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শার্ট, ছোটদের কাপড়, জামা, ফ্রক তৈরি করছে। পাঞ্জাবী ও ফতুয়ায় তারা তাদের গাঢ় রং বিসর্জন দিয়ে হালকা রঙে তৈরি করছে।[৪] সূতা দিয়ে লাইন দেখা যায় ডিজাইনে। চাকমাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের জামা-কাপড় দেখা যায়। এছাড়া বিমলিনী চাকমা নামে একজন বেইন বুনিয়া রাঞ্জুনি (রংধনু) ও সকাল সন্ধ্যা নামে নতুন ডিজানই করেছেন বলে জানা যায়। এই দুইটি ডিজাইন বাঙালিদের থেকে প্রভাবিত হয়ে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য নতুনত্বের ক্ষেত্রে ভারতের নাগা উপজাতীরা অত্যন্ত আধুনিক ডিজাইনের জামা-কাপড় ব্যবহার করে।

এছাড়া চাকমারা তাদের পোশাকে জ্যামিতিক নকশা, লাইন, রং অনেকখানি ধরে রেখে ছোটদের বেলায় তা গ্রামীণ চেকের মতো , তবে আরও গাঢ় কালার ও স্ট্রাইপ ব্যবহার করছে। ফলে বোঝা যায় এটা ওদের কাপড়।

অলংকারে মোটিফ পরিবর্তন : তাদের ঐতিহ্যবাহী অংলকার এখন দেখা যায় না বললেই চলে। এখন এর বদলে তারা ইমিটেশন পরছে, পুথি পরছে। এমনকি প্লাস্টিক ফুলও পরছে। অবশ্য অনুষ্ঠান হলে রূপার পয়সার গহণা দেখা যায়। বিয়েতে যে পারে সে সোনার গহণা ও আধুনিক মোটিফের হার ব্যবহার করে। যেখানে তাদের মোটিফগুলো ছিল মোটা বড় গোলাকৃতি সেখানে এখন চিকন আধুনিক সকল ডিজাইন ব্যবহার করছে।

বাঁশের বিবিধ পাত্র ও দ্রব্যাদির মাধ্যম, রং, মোটিফ ও ডিজাইনের পরিবর্তন : বর্তমানে বাঁশ দিয়ে দুই-তিন রং– সবুজ, খয়েরী ও গাঢ় খয়েরী দিয়ে পাত্র বোনা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বাঙালি ও আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের, প্লাস্টিক নল দিয়ে এমন ব্যাগ তৈরি করতে দেখা যায় যা মেয়েরা বহন করে ।[৫] এটা টেকসই, ডিজাইনও আধুনিক। তারা এটা বিক্রি করছে, ব্যবহারও করছে। অবশ্য এটা বাঙালিদের দেখাদেখি তারা শুরু করেছে।

তাদের এই সব পরিবর্তন মূলত সূচনা হয়েছে বিংশশতাব্দীর শুরু থেকে। অবশ্য ৬০ দশকের পর থেকে পরিবর্তনটা বেশি এসেছে। এর মূল কারণগুলি হল–

১। শিক্ষা ও জীবিকার পরিবর্তন

২। কৃষি-জমি, জুম নির্ভর জমির অভাব

Dhaka University Institutional Repository

৩। বাঁশ, কাঠ ও বনের অপর্যাপ্ততা

৪। পারিপার্শ্বিক আধুনিক ছোঁয়া

তবে তাদের অধিকাংশই এই পরিবর্তনে অতোটা বিচলিত নন।তারা এটাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে চান, তারা খুশি যে বাঙালিরা কেউ কেউ তাদের উড়না, কাপড় পরিধান করছে।

ত্রিপুরা জীবনঘনিষ্ঠ কারুশিল্পের পরিবর্তন

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গীতিবাদ্য, নৃত্য ও শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ, ঐতিহ্যগতভাবেই আছে। তবে বিশেষ করে তাদের মধ্যে বোতল নৃত্য বিখ্যাত ছিল। মদ তৈরিতেও তাদের নাম ছিল, আর ছিল রাজকীয় আতিথেয়তার গুণ।

কারুশিল্পের মধ্যে তাদের অন্যতম পরিচয় বহন করত তাদের অলংকার-শিল্প। আগে একজন তরুণী কিংবা বৃদ্ধা সবার গায়েই অলংকারের সমারোহ ছিল। হাতে বড় বালা, কোমরে বিছা, কানে দুল গলায় কয়েক প্রস্থ মোটা হার যেটা কমপক্ষে ছয় প্রস্থ। তাদের সাথে বম, খুমি, চাকমা, চাক অন্যদের অলংকারের বেশ পার্থক্য ছিল।

ত্রিপুরাদের হাতের বালা যেমন সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত তেমনি গলার হাসুলি পাতলা কারুকার্য শোভিত ছিল। গলায় হারের মধ্যে নিচের ৪টি স্তর সেখানেও সূক্ষ্ম পুঁথি ফর্মের সঙ্গে পাতলা শিকলের কারুকাজ। এইসব সূক্ষ্ম কারুকাজ তাদের অলংকার পরার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অলংকারের মধ্যে অন্যদের যে বড় বৃত্ত বা পয়সা ফর্ম আছে সেটাও দেখা যায়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম কারুকাজ বম, চাক, খুমি, খিয়াং এদের অলংকারে কম ছিল। আরেকটি ফর্ম বা মোটিফ ছিলঃ হার্টের মতো আকৃতির অলংকার, যা অন্যদের মধ্যে কম দেখা যেত। কানের অলংকারটি বেশ বড়, দুই ইঞ্চির মতো মোটা গোলাকার আকৃতির ঢালের মতো দেখতে ছিল। এ অলংকারের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকাজেও তাদের অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখি। অন্য নৃ-গোষ্ঠীর বালাগুলোতে যেমন শুধুমাত্র একটা সার্কেল দেখা যেত এবং সাধারণত এখানে কোনো কারুকাজ চোখে পড়তনা, আর দেখা গেলেও তা ত্রিপুরাদের মতো অত মসৃণ ছিল না।

ত্রিপুরা ঐতিহ্যবাহি রিনাই

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানকালের ত্রিপুরা "রিসা"

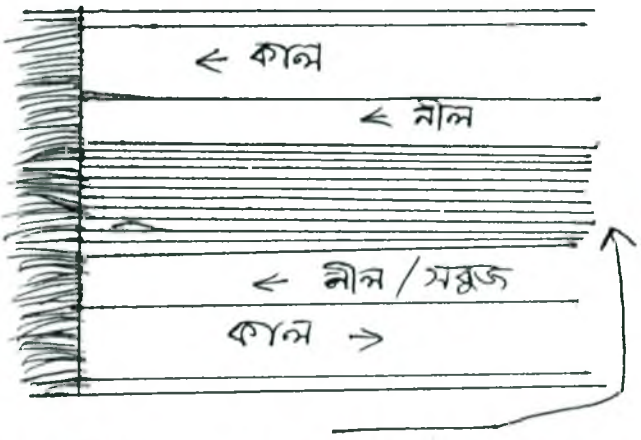

অতিরিক্ত সাদা লাইন (জমিন সবুজ বা নীল)
বর্তমানে লাল, হলুদ ও কালো রং দেখা যায়।

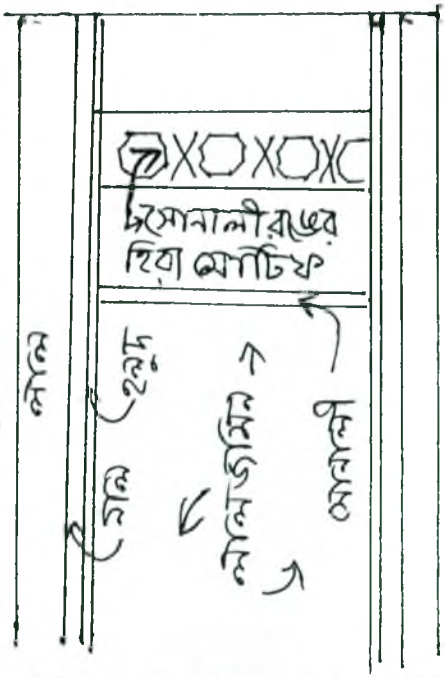

বর্তমানে ত্রিপুরা 'রিসা'তে আর যে সব মোটিফ দেখা যায় তা হল:

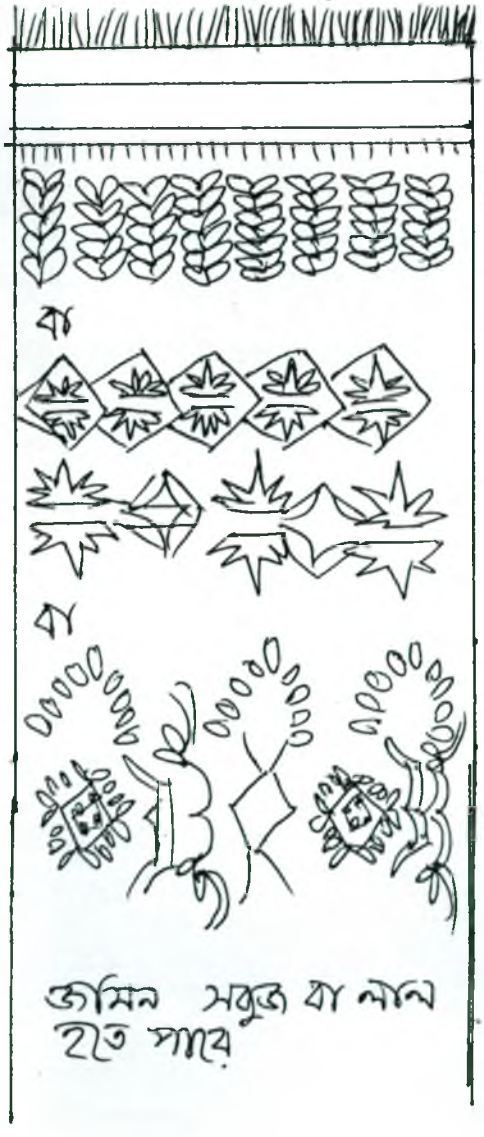

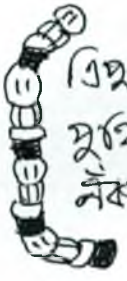

জমিন সবুজ বা লাল হতে পারে

ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহি পুঁথির মালার নকশা

(প্যাঁচানো চুড়ি)
ঐতিহ্যবাহি ত্রিপুরা চুড়ি "কুচি খাড়ু"
আর বর্তমানে তারা — প্লাস্টিকের চুড়ি পরছে বা সিটি গোল্ডের তৈরি বালা/চুড়ি পরছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০১০-এর ১৪ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি শহর থেকে ১৪-১৫ কিলোমিটার ভেতরে কিল্লাপাড় গ্রামের ত্রিপুরা বসতিতে গেলে দেখা যায় বাসার সামনে শূকর চড়ে বেড়াচ্ছে। শহরের বাসা মাটি থেকে কম উচুতে করা হত, গ্রামে অবশ্য দুই-তিন হাত বাঁশ দিয়ে উঁচু বাসা করা হয়। তবে এখানে পুরাপুরি সিমেন্টের ঢালাই দেওয়া বাসাও দেখা গেল। অন্যান্য ঘরে বাঁশের বেড়া গেল। ঘরেও বাঁশের ব্যবহার দেখা যায়। তবে সেই ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত ঘরের ৮০% শতাংশ বৈশিষ্ট্যই এখন নেই।[৬]

ঘর, পোশাক, অলংকার ও আসবাবপত্রে পরিবর্তন : তাদের ঘরের ভেতরে ঢুকলাম ঐ ঘরের (ঘরের মালিক সন্তোষ ত্রিপুরা, বয়স-৪২, পেশা-জেলে) ভেতরে নৃ-গোষ্ঠীদের যে আসবাবপত্র থাকে সে রকম কিছুই নেই, আধুনিক সব সামগ্রী, ডিজাইনও আধুনিক। সন্তোষ ত্রিপুরা খ্রীষ্টান হয়ে গেছে, তার স্ত্রী এখনো ত্রিপুরা সনাতনী ধর্মে আছেন। স্ত্রী রিয়া ত্রিপুরাকে ঘরের মধ্যে পেলাম। হাতে কোনো শঙ্খ বা অন্যকোনো অলংকারই দেখা গেল না,[৭] শুধু মাথায় সিঁদুর দেখা গেল। তিনি ম্যাক্সি পরা। ভেতরে যেতে চাইলে, রান্না ঘরের ভেতরে যেতে দিতে লজ্জা পাচ্ছিল, কারণ সেখানে চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে। ভেতরে কারুশিল্পের কোনো দেখা মিলন না। এমনকি কোনো ত্রিপুরা ড্রেসও দেখলাম না– শার্ট, প্যান্ট, ছোটদের ফ্রক, গামছা এসব নেড়ে দেওয়া রয়েছে। উঠানে কোথাও কোথাও শূকরের খাবার দেওয়া হয়েছে, ভূসি ও ফ্যান জাতীয় খাবার। একটি বাসার উপরে বিদ্যুতের জন্য সোলার সিস্টেম দেখলাম।

বান্দরবন বা খাগড়াছড়ি শহর এলাকা থেকে এখানকার ঘরবাড়ির সামান্য পার্থক্য আছে। কিছু বাড়ি কাঠের ছোট মাচার উপর অথবা সামান্য উঁচু করে কাঠের উপর বা এক অংশ কাঠের উপর। অধিকাংশ বাড়ির সামনে সামান্য বারান্দা আছে কাঠের বা বাঁশের। এই বারান্দা তাদের ট্রাডিশনকে ধারণ করে রেখেছে।

মহিলারা পোশাক হিসাবে নিচে পরেছে সায়ার মতো বস্ত্র, উপরে ব্লাউজ এবং তা বাঙালিদের উড়নায় জড়ানো। পেশা হিসাবে তারা শূকর পোষে, যা তাদের ঐতিহ্যগত পেশা। আগে অবশ্য তারা ধান চাষাবাদ করত বলে জানা যায়। এ ছাড়া এখন এ এলাকার নতুন পেশা হলো মাছ ধরা। বর্তমানে তাদের অনেকেই এনজিওতে চাকুরিও করছে। সব বাচ্চারা স্কুলে যায়-পড়াশোনা করে। তাদের নাক মুখ ও অনেকটা বাঙালিদের মতোই দেখতে (অবশ্য ত্রিপুরারা আগে থেকে দেখতে চাকমা বা অন্য নৃ-গোষ্ঠী থেকে একটু আলাদা।)। তবে সনাতন ধর্মের চিহ্ন এখনও আছে। যদিও তারা অধিকাংশই খ্রীষ্টান হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। বান্দরবানেও অধিকাংশ ত্রিপুরারা খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। খাগড়াছড়িতে এই হার কম। অর্থাৎ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে কারুশিল্প, কাপড়, ঘর, অলংকার এগুলো এখন বিলুপ্ত প্রায়। বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা শুধুমাত্র তাদের ঐতিহ্যের কাপড় পরে তাও অনেক দামী বলে অনেকেই কিনতে পারেন না। মেয়েদের অলংকারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো তারা এখন বাঙালিদের মতো ইমিটেশন গহণা পরে। ত্রিপুরা-চাকমারা প্লাস্টিকের বালাও পরছে । পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে তারাই একমাত্র সোনার গহণাতে বেশি আগ্রহী। কম বেশি সাধ্য অনুযায়ী এখনও তারা তা বানায়। অন্যদের মধ্যে স্বর্ণ ব্যবহার কম। তবে চাকমাদের মধ্যে যারা শহরে থাকে তারা তাদের বিয়েতে এখন সাধ্য অনুযায়ী স্বর্ণ কিনে থাকে।

ত্রিপুরা গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব নির্মলেন্দু ত্রিপুরার[৭] (বিসিক-এর সাবেক পরিচালক,বয়স -৭৫) মতে তাদের খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার একটা কারণ; তারা না হিন্দু না বৌদ্ধ , কাজেই তাদের যোগাযোগটা অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর সাথে কম। এর জন্য অন্যরাই দায়ী, ফলে তারা খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে। শিক্ষার হারের দিক থেকে চাকমাদের পরই ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী। নির্মলেন্দু ত্রিপুরার মতে, অলংকারের যে পরিবর্তনটা এসেছে তা অর্ধশত বছর আগে। এর আগে অন্যরকম ছিল। আগে তারা আরও ভারী বড়, সোনা-রূপার গোলাকৃতি সরল ডিজাইনের অলংকার পরত। তার মতে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ত্রিপুরারা সোনা পরার চাইতে পুঁথির মালা বর্তমানে বেশি ব্যবহার করে, কারণ হয়তো স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় তাই।

ত্রিপুরারা সকলেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ–

১। পারিপার্শ্বিক চাপ, আধুনিকতা

২। অর্থনৈতিক অবস্থা

৩। উৎসবগুলোও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে

৪। ধর্ম পরিবর্তন

তারা খ্রীষ্টান হচ্ছে কারণ– সরকারি সুযোগ সুবিধা কম, অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে সারাজীবন। আর উন্নতির জন্য বাঙালি-আদিবাসীর সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাবতো রয়েছেই । সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকলে হয়তো কিছু কিছু ঐহিত্য ধরে রাখা সম্ভব হত। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উভয়েই বঞ্চিত-

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎপদ। চাকমারা দলবদ্ধ ও সুবিধা পাচ্ছে বিধায় তারা খ্রীষ্টান হয়েছে কম। তারা ঐতিহ্য কিছুটা ধরে রাখতে পেরেছে। এর মধ্যে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে মুরং-রা অবহেলিত থেকেও খ্রীষ্টান হয় নি। নির্মলেন্দু ত্রিপুরা আরেকটি চমৎকার তথ্য দিলেন, বান্দরবানে ত্রিপুরাদের "উসুই" বলে ডাকা হয়, উসুই অন্য কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নয় ।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে বান্দরবন যাই।(কালিঘাটা,সদর,বান্দরবন এলাকা) সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে সাক্ষাৎকার নিই সত্যপাণ্ডি ত্রিপুরার, তিনি পেশায় শিক্ষক, বয়স ৫৫ বছর। তিনি বলেন,হ্যা পরিবর্তন হচ্ছে, আগে ৬/৭ বছর পর্যন্ত ছোট ছেলেরা উলঙ্গ থাকত, এখন কিন্তু সেটা থাকছে না, কাপড় পরিধান করছে ছোট থেকেই। এই পরিবর্তনটা তো অবশ্যই পজেটিভ। পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। বয়স্করা অবশ্য এখন অনেকেই কাপড় চোপড়ের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। অনেক মধ্য বয়সীরাও ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরছে। ইউনিভার্সিটিতে ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনে বাঙালি পোশাক পরছে। চাকুরী করতে গিয়ে যে বাঙালি পোশাক পরছে তা তারা প্রয়োজনেই পরে থাকে, কিন্তু অনেকেই একেবারে পরিত্যাগ করছে যেন লোহার খাঁচা থেকে তারা মুক্ত হয়েছে।[৯] সমাজে আগের মতো তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই,তাই শৃংখলাও কম। পেশা হিসাবে এখন অনেকেই চাকুরী করছে, বেশীর ভাগ এনজিওতে। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করছে তবে তা কম। তার মতে আগের চেয়ে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত হয়েছে। তবে তা তেমন বেশি নয়। কিল্লাপাড় গ্রামের এলাকাগুলো বাদে শহর এলাকাতে এইসব নৃ-গোষ্ঠীর কাছে যে অর্থ এসেছে ,তা তাদেরকে দেখে সহজেই বোঝা যায়। তার মতে, ৭০-৮০ দশক থেকে ত্রিপুরাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন বেশি করে শুরু হয়েছে। তিনি ত্রিপুরা ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেন যে সংগীত, নৃত্যের সঙ্গে অলংকারেও ত্রিপুরাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

বম কারুশিল্পের রং, মোটিফ ও ডিজাইনের পরিবর্তন

খ্রীষ্টান হওয়ার ফলে বমদের উৎসব, অনুষ্ঠান কমে গেছে। এখন তাদের নাচ, গান, অলংকার পরা এবং বিয়ে নিজেদের মতো হয় না বলে নিজেরা ঐতিহ্যবাহী কাপড় পরে না। বর্তমানে তাদের সামাজিকভাবে উৎসব, অনুষ্ঠানে ভাটা পড়েছে। উৎসবগুলো লোপ পাওয়ার ফলে কারুশিল্পগুলোও লোপ পাচ্ছে। কিছু বিষয় যেমন– কম্বল, কিছু কাপড়, চাদর, ট্রে ও মাফলার তারা তৈরি করছে। কারণ হলো বান্দরবানের প্রতি বিদেশীদের মনোযোগ বেশি। দু'ভাবে বিদেশীরা এদেরকে কাজে লাগাচ্ছে। এক, খ্রীষ্টান করছে। দুই, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে কিছু কারুশিল্প তৈরি করছে। বাণিজ্যিকভাবে তৈরি এসব কাপড়ের সাথে বম,

Dhaka University Institutional Repository

০ বমরা কম্বল ও মাফলার বোনার জন্য বিখ্যাত।
০ একটি মাফলারের একাংশের ডিজাইন।

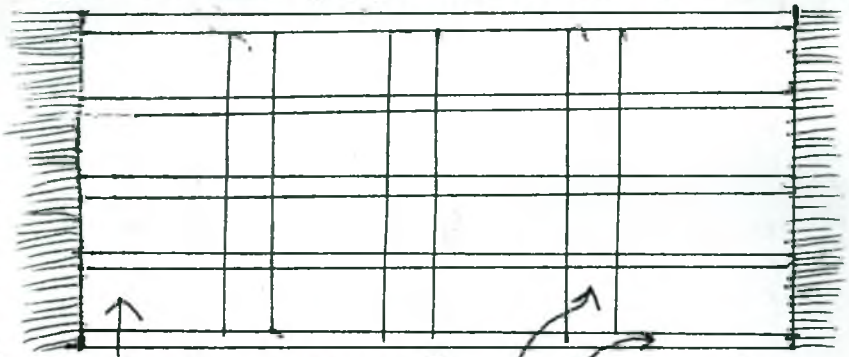

... লম্বায় মাজা থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত।

২০ বম পিননের রং, ডিজাইন, আকার সবই- চাকমাদের থেকে আলাদা

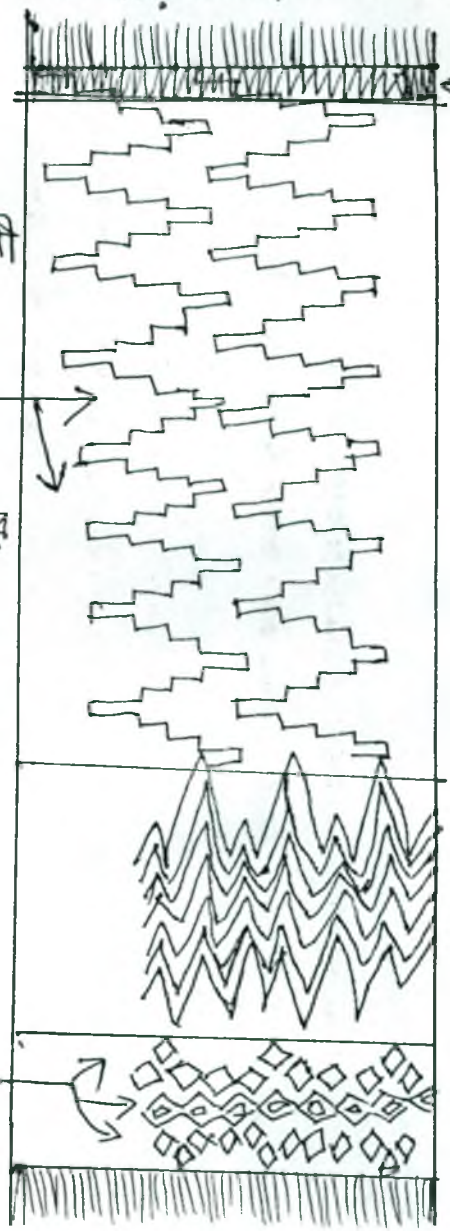

০ গাঢ় কমলা/নীল পাড়

০ জমিন গাঢ় গোলাপী বা নীল

০ সমকালীন বম পিননের রং ও ডিজাইনের নতুনত্ব

০ গাঢ় নীল ও হাল্কা নীলের সাথে সাদা

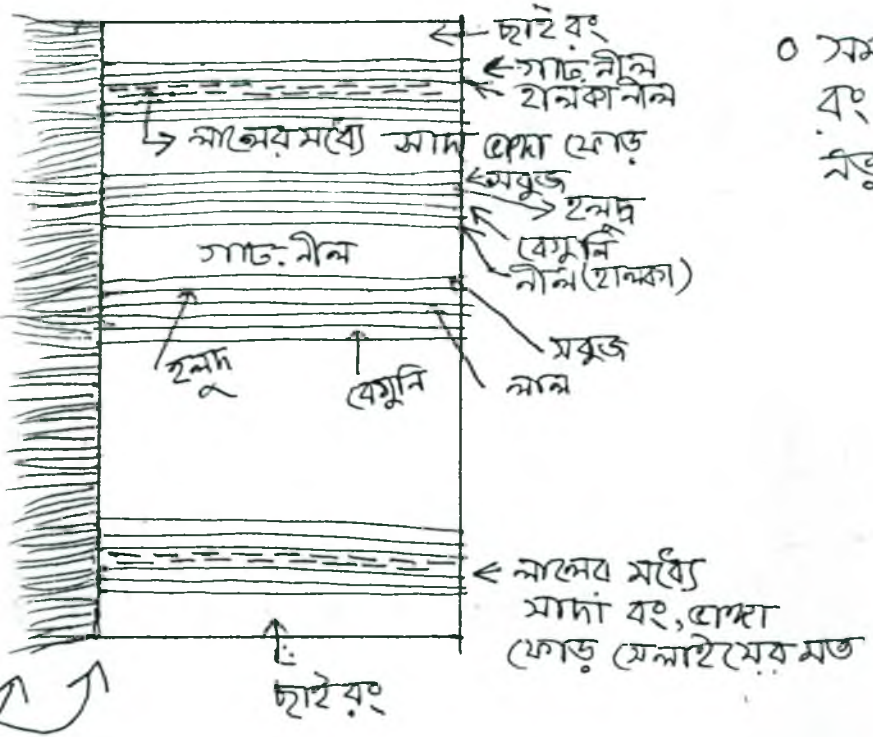

Dhaka University Institutional Repository

চাক, খিয়াং, খুমি, ম্রো, মুরং এদের তেমন বাস্তব সম্পর্ক পাওয়া যায় না। নিজের সংস্কৃতি তখনই টিকে থাকে যখন আমরা নিজের জন্য কিছু করি, নিজেরা তাকে উপভোগ করি, ব্যবহার করি এটাই তাদের বিশ্বাস। তাদের অনেকেই উল্লিখিত কারুশিল্পগুলো বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করছে। এর একটি দিক হলো তাদের অর্থনৈতিক দিক, তবে এটি তাদের জন্য দরকারও ছিল । কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে এর পেছনে সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নেই। কার্যত যে লক্ষ্য আছে তা হল– টাকা ইনকাম ও কিছু ব্যবসা করা, যা বিদেশীরাও করছে। তারা তাদেরকে চাকুরী দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। যে পরিশ্রম তারা করে তার প্রাপ্য তারা পায় না বলেই মনে হল। তবে ফারুকপাড়া, (লাইমিপাড়া) শৈলপ্রপাত এলাকাতে দেখলাম তারা নিজেরা বাণিজ্যিকভাবে দোকান দিয়েছে, এখানে অবশ্য তাদের লাভটা ভালই হচ্ছে বলতে হবে।[১০] বাঁচার জন্য এর দরকারও আছে। বান্দরবানে চাক, খুমি, ম্রো, খিয়াং এ কয়েক গোষ্ঠীর মধ্যে কারুশিল্প কিছুটা বেঁচে আছে। তার অন্যতম কারণ হলো বান্দরবন গহীন অরণ্য এলাকা। এখানে শহরে সংস্পর্শে থাকলেও তারা অরণ্যের কাছাকাছি থাকে। রাঙ্গামাটি শহরে ট্যুরিস্টদের যাওয়া সহজ, খাগড়াছড়িও তাই। চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, তঞ্চঙ্গা এদের থেকে এই বান্দরবানের কুকিচিন গোষ্ঠীর চেহারা রং, স্বভাব, পোশাক, ঘরবাড়ি সবদিক আগে থেকেই বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। এখনও কিছুটা সেই পার্থক্য ধরে রেখেছে। যেমন বমরা বেশ সুন্দর দেখতে, নাক অনেকটা ত্রিভূজ বা গোল আকৃতির হয়। এদের কাপড়ের ডিজাইনে চাকমাদের চেয়ে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার লুসেই বা লুসাইদের কাপড় আর ল্যাটিন আমেরিকার নৃ-গোষ্ঠীদের কাপড়ে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বম মেয়েদের কাপড়ের নিচের অংশে দেখা গেল কমলা রঙের প্রাধান্য ছিল। উপরে এক রঙা ব্লাউজ বা জামা ছিল। এগুলি সাধারণত লাল সাদা হত। নিচের ঐ (কোরচাই) কাপড়ের রং-টা গাঢ় কমলার পাশাপাশি সোনালীর মিশ্রণ ছিল, যা চাকমা ত্রিপুরা কাপড়ে দেখা যেত না। আর কাপড়ের ডিজাইন সম্পূর্ণ আলাদা, ধরনটা মোটা, একটা লাইন ব্যবহার করা হত, যেখানে ঐ লাইনের মধ্যে পাশাপাশি একটা লাল স্কয়ার– পাশে নীল স্কয়ার, তারপরে কালো। মাঝে সাদা বা ঐ কমলা রং অথবা কমলা ও সোনালী থাকত। পুরো কাপড়ের উপর বড় বড় খোপে চারকোণা ঘরের মতো নকশা করা। ঐ ঘরটি সাদা রং দিয়ে করা হত। এ ধরনের ডিজাইন এখনও চাকমা, ত্রিপুরা, মারমাদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

আবার লুসাই বা লুসেইদের কাপড় বমদের থেকে আলাদা, যদিও বমদের মতো তাদের স্ট্রাইপগুলোও বড়। লুসাইদের কাপড় অনেকটা আমাদের পুরনো আমলের বেডসিটের মতো কাল, লাল-

Dhaka University Institutional Repository

নীল (সূতি কাপড়ের মতো) মোটা লাইনের কাপড়। বড় মোটা মোটা স্ট্রাইপের মাঝে চিকন অন্য কালার থাকে (মোটা সাদা, লালের পাশে, হলুদ নীলের পাশে লাল চিকন লাইন)। লুসেইদের পোশাকে এই স্টাইপের পাশাপাশি একটা জায়গা থেকে দেড় ফিটের মতো জায়গা জুড়ে উল্টা লাইনও দেখা যায়, হরাইজন্টাল লাইনের উপর ভার্টিক্যাল লাইন দেখা যাবে। তবে বমরা ছোট কুচি কুচি অনেক লাইন থাকে। তারা ছোট জমকালো কালার ফুল লম্বাটে ডিজাইনের কাপড় তৈরি করে পরত। তবে বমরা উৎসব ছাড়া তাদের ঐতিহ্য গত এই পোশাকগুলো এখন তেমন পরে না । এমনকি মহিলারা ঘরেও এটা পরে না। তবে সায়ার মতো একটা কাপড় তারা পরে, যা এক রঙের।

বর্তমানে তারা পোশাকের কাপড় ছাড়া মাফলার, চাদর, কম্বল, ব্যাগ, লাউপত্র (পানির পাত্র), গামছা, শীতের গায়ের চাদর, মখমলের চাদর, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি খেলনা, ব্যাঙ ইত্যাদি তৈরি করছে। তারা এগুলি বিক্রির জন্য তৈরি করছে। বর্তমানে কালারটা আরও Weighty, Soft হয়ে যাচ্ছে।এখনও বম কাপড়ের মূল বৈশিষ্ট্য রাফ বড় ডিজাইন যা এখনও খুমি, চাক খিয়াং ও লুসেইদেরও বৈশিষ্ট্য। এটা চাকমা, ত্রিপুরা, মারমাদের থেকে ভিন্ন।

ফারুকপাড়া ও লাইমি পাড়ায় ২০১০-এর ১৬ সেপ্টেম্বর গিয়েছিলাম। দেখলাম একজন বম যুবতী মেয়ে ছোট তাতে কাপড় বুনছে। তার বয়স হবে ১৮ থেকে ২০ বছর। কিন্তু সে পরে আছে অত্যন্ত আধুনিক ডিজাইনের সালোয়ার কামিজ।[১১] আগে বমদের অলংকারগুলো বড় বড়, গোলাকৃতি রূপার পয়সার মতো ছিল। তাদের এক লাইনের মালা ছিল, মালাগুলি বাঙালিদের মতো আকৃতিতে লম্বায় ছোট নয়, বেশ বড় বড় ছিল। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে আসত এখন এগুলো কম দেখা যায়।

গলার সঙ্গে আটকে থাকে, লেগে থাকে এমন একটা অলংকার তাদের গলায় দেখা যেত। যা বেশ সূক্ষ্ম ছোট ছোট ফর্মের অলংকার। সেটাও কাউকে পরা অবস্থায় দেখা গেল না। মাথার উপর ব্যান্ড বাঁধার মতো একটি অলংকার ছিল সেটাও চোখে পড়ে নি।

তারা লোহা, পিতল, রূপা বা পুঁথির তৈরি গহণা পরত, সেই লোহা পিতল অর্থাৎ বর্তমানে অলংকারের মাধ্যমেরও পরিবর্তন এসেছে। লোহা পিতলের ব্যবহার এখন নেই বললেই চলে। এর বদলে এখনকার আধুনিক পুঁথির ব্যবহার কিছুটা দেখা যায়। অতীতে তারা বাঁশের চিরুণী ব্যবহার করত সেটিও নেই। এছাড়া তারা ঘরের শোভাবর্ধনের জন্য জন্তু শিকার করে তার মাথার খুলি, ভীমরাজ পাখির লেজ,

Dhaka University Institutional Repository

(৩) "ওয়াক্লাই"
(ছোট একপ্রস্থ কাপড়)

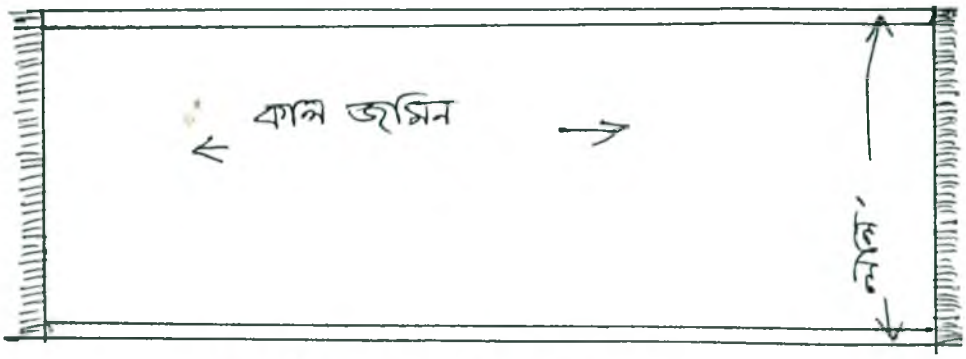

কাপড়টি একহাত চওড়া।

এই ধরনের কাপড়টি অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের কাপড়ের থেকে অনেক ভিন্ন (রং ও আকারে)।

০ রাখাইন রা বা মার্মারা থামী বা লুঙ্গির মত কাপড় শরীরের নিম্নাংশে পরে থাকে। এই কাপড় আবার অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা। এই কাপড়ে লতা, পাতা, ফুল ও বঙ্কিম রেখা বেশি দেখা যায়। রাখাইন দের এই সব কাপড়ে বার্মার কাপড়ের প্রভাব দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

হরিণের মাথা সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরকে শোভামণ্ডিত করত। এখন এগুলো খুব কম সংখ্যক ঘরে দেখা যাবে। অর্থাৎ এই গুলোর ব্যবহার একেবারেই সীমিত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তবে বর্তমানে বাঁশের তৈরি কিছু ছোট পাত্র দেখলাম। বাঁশ দিয়ে তৈরি হাতের বালা দেখা গেল, এই বালাগুলিতে ডিজাইন করা।[১২] পুঁথি দিয়ে তৈরি মালা দেখলাম যার রং—সাদা, লাল, কালো, হলুদ।এগুলো বর্তমানের কারুশিল্প এবং এখানে নতুনত্বও আছে । বর্তমানেও তাদের কম্বলে কালো, লাল ও হলুদের ব্যবহার আছে। তারা কম্বল, মাফলার ইত্যাদি কারুশিল্পে (মফস্বলের কম্বল) বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেছে, বেশি কাজ করছে বলে মনে হয়। তাদের বুকে পরার কাপড়টাতে চাকমাদের থেকে পার্থক্য হলো যে, চাকমাদের জমাট ডিজাইনটা উড়নার দুই প্রান্তে হয় আর বমদেরটাতে কাজ থাকে উড়নার আরও উপরে বা মাঝামাঝি থেকে একটু নিচে। এদের ডিজাইনে পার্টিশন অনেক চওড়া। চাকমা কাপড়ে সাধারণত লম্বা লাইনের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বমদের মতো কাপড়ের মাঝখানে জমকালো কাজ দেখা যায় না, বমরা এই বৈশিষ্ট্য এখনও ধরে রেখেছে ।

আবার বর্তমানে তৈরি কিছু বাঁশের ট্রেও দেখা গেল। এই ট্রে-এর কাজে মারমা ও গারোরা সবচেয়ে ভাল ও পরিবর্তনমুখী কাজ করেছে। দেখা গেল একটা ট্রে সাধারণ, গতানুগতিক এবং অন্যটার ডিজাইনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাঁশকে পোড়ানো হচ্ছে, বাঁশকে পোড়া দিয়ে কাজ করা হচ্ছে । ট্রে-এর ভেতরে আলাদা চৌকোণো ডিজাইন করা হয়েছে । বর্তমানে কালারেও ভিন্নতা এসেছে যেমন : খয়েরী, হালকা খয়েরী ও সবুজ – এই তিনটি রং এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আগে মূল রং ছিল একটি, খয়েরী রং। এছাড়া কিছু বাঁশের পাত্র দেখা গেল, যা অতি পাতলা ডিজাইনে তৈরি। বাঙালিদের মতো ট্রেতে পেরেক লাগানোটাও সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়। আর ঐ ট্রেতে পোড়া যে দাগ দেখা যায়, তা সাধারণত মারমাদের মধ্যে প্রচলিত। ইদানীং গারোরাও এই কাজ করে। তবে আমার মনে হয়েছে, এই কাজটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে প্রভাবিত হয়ে তারা করেছে। যদিও গারো কারুশিল্পী বলেন এটা তাদের ঐতিহ্যগতবিষয় । বর্তমানে কিছু কাপড়ের ব্যাগ ও দেখা গেল, এক কালার মাঝে দু-একটি লাইন দিয়ে তৈরি করা, রঙের হালকা সেড দেওয়া। এই হালকা সেডের ব্যবহারটাই হলো বম কারুশিল্পে নতুন পরিবর্তন। তারা বাণিজ্যিক-স্বার্থেই লাওয়ের খোলে- পানি ধরে রাখার ঐতিহ্যবাহী পাত্রের ব্যবহারের প্রচলনটা ধরে রেখেছে। তবে আগে এটা হত ন্যাচারাল রঙের, এখন লাউয়ের খোলে পোড়া রং দেওয়া হচ্ছে। মন্টু বিকাশ বলেছিলেন তাদের অন্যতম ঐতিহ্য হচ্ছে, বাঁশের যে ন্যাচারাল রং তাই

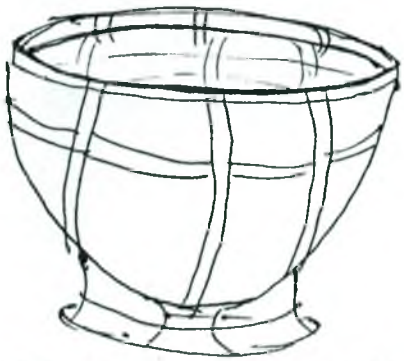

ঐতিহ্যবাহি একটি পাত্র। Dhaka University Institutional Repository বর্তমানে তৈরী কৃত পানির পাত্র

পাত্রটির নিচের অংশে কাঠ উপরের অংশ মাটির। বেত জাতীয় বাঁশি দিয়ে সবখানে বাঁধন তৈরী করা হয়েছে।

মাটির তৈরী, রং ও চমৎকার।

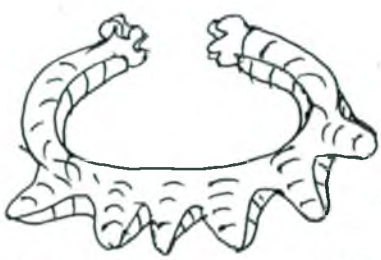

এটি পুরাতন লাউ পানি-পাত্র কে অনুসরণ করে তৈরী করা হচ্ছে।

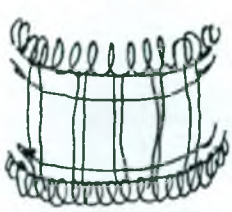

মাটির এই পাত্রটিও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে গারো ফাইল, কলমদানি টিস্যু বক্স তৈরী করছে সেখানে

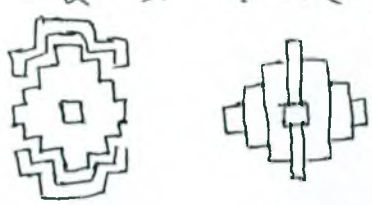

এসকল ডিজাইন ও মোটিফ ব্যবহার করা হচ্ছে উল্লেখ্য যে এখানে এখন আগের একরঙের রিপারিতে ২/৩ টা রং ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ রং, ডিজাইন ও বিষয়গত নতুনত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অতীতের বাজুবন্ধের ডিজাইন

নতুন বাজুবন্ধের ডিজাইন

বর্তমান কালের আরও কিছু অলংকার

কানের দুল

গলার হার

মাধ্যম গত ভাবে এগুলো এ্যালুমিনি-য়ামের তৈরী।

Dhaka University Institutional Repository

ঘর বানাতে গিয়ে ধরে রাখা। বর্তমানে এসব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেছে, ঘরে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে বমদের খাদ্য দ্রব্য বহনের জন্য নির্মিত পাত্রগুলোতে এই পরিবর্তন দেখা গেল। ন্যাচারাল রঙের বুননের মধ্যে গাঢ় খয়েরী রঙের ব্যবহার বা কালো লাইনের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যদিকে কিছু কাজ আছে যেখানে বাঁশের ন্যাচারাল রং ও ন্যাচারাল (কাঁচা বাঁশের) সবুজ রং দিয়ে করা হয়েছে। এই সবুজ রং যা বাঁশের গা না ছিলে করা হয়, তাও সাম্প্রতিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যেই পড়ে, এধরনের কাজ আগে তেমন ছিল না । এছাড়া বর্তমানে কলমদানী, ফুলদানী, কাপ তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে তাপ দিয়ে গাঢ় খয়েরী রং ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নতুন। তারা বস্ত্রে বর্তমানে রঙের ভেরিয়েশন নিয়ে এসেছে। হালকা গোলাপী, সবুজ, সবুজের হালকা সেড অর্থাৎ নরম, মোলায়েম কালারগুলো ব্যবহার করছে ও মাধ্যম হিসাবে মখমলের উল ব্যবহার করছে। বাঁশের মোবাইল রাখার পাত্র, বাঁশের গ্লাস এগুলোও বম কারুশিল্পের সাম্প্রতিক সংযোজন। হয়তো আগে বাঁশের গ্লাস ছিল তবে এগুলোর মতো নয়। এগুলোতে হাতল লাগানো হয়েছে ।বর্তমানে ফুলদানীতে 'মানুষের' ছবি ডিজাইন হিসাবে দেখা যায় যা অত্যন্ত আধুনিক । তবে গত বিশ/ত্রিশ বছর আগেই এরকম কাজ ঢাকার কারুশিল্প জগতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, নাথান বম নামে একজন বম ভাস্কর্যে পড়াশুনা শেষ করে এখন বান্দরবনে থাকেন, তিনিই হয়তো এ বিষয়গুলো তুলে আনছেন।[১৩]

তাদের পরিবর্তন বিষয়ে রবিন বম (বয়স -৩২) নামে একজন যুবকের সাথে আলাপ হয়। তিনি বলেন যে, কম্বলের রঙে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ফর্মগুলো বড় থেকে ছোট হয়েছে, রঙের ভ্যারিয়েশন ও সেডও দেয়া হচ্ছে এখন। বরিন বম বা বম জনগোষ্ঠীরা শুধু খ্রীষ্টান হয়েছে তাই নয় তারা রীতিমতো ইউরোপীয় হ্যাট পরে এবং নিজেদেরকে 'আধুনিক' ভাবে। হ্যাট, টি-শার্ট, জিন্স পরা তাদের কাছে রীতিমতো অত্যাধুনিক ব্যাপার। তিনি তার দোকানেই একটি নতুন জিনিস ,নতুন ডিজাইন দেখালেন। দেখা গেল, দেওয়ালে ওয়াল ম্যাট ঝোলানো। ঐ ওয়াল ম্যাটে বাংলার ঐতিহ্যবাহী রুমাল শিল্পকলাতে যেরকম ডিজাইন ও লেখা থাকে, সে রকম ডিজাইন দেখা গেল , রুমালে 'ভুলো না আমায়' লিখে লতা-পাতা-ফুল ডিজাইন, নকশা দেখা গেল। এই লতা পাতার যে ব্যবহার তা তাদের কারুশিল্পে নিতান্তই নতুন এবং বাণিজ্যিক-স্বার্থেই এর জন্ম।

এরপর ফারুকপাড়ার হেডম্যান (রবীন্দ্র খোয়াজা সাঈম) বা কারবারীর সাথে দেখা হয়। তিনিও হ্যাট পরা ভদ্রলোক অর্থাৎ তারা মানসিকভাবে হ্যাট, প্যান্ট, শার্ট– উচুশ্রেণীর পোশাক বলে মেনে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছে। এই পরিবর্তনটা বেশ বড় পরিবর্তন বলেই মনে করি। একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হয়, নাম ফরমাং বম, বয়স- ৩০ তিনিও খোলামেলাভাবে কথা বললেন। এইসব দ্রব্য যে আগের চেয়ে বেশি বাণিজ্যিকভাবে বোনা হচ্ছে তা স্বীকার করলেন। কম্বলগুলো আগে বেশি মোটা, পুরু ছিল এখন এটা পাতলা হয়েছে। সাদা রঙের কম্বলই বমদের বিখ্যাত কম্বল। মফস্বলে এখনও এ জাতীয় কাপড় তৈরি হয়, তার বুননটাও আগের মতো আছে তবে আগের মতো পুরু নেই। তাদের প্রায় ১০০% ছেলেমেয়ে পড়তে যায় বলে তিনি জানালেন। তারা বর্তমানে ১০০% খ্রীষ্টান।[১৪] সর্বোপরি তাদের অর্থনীতি এগিয়েছে , তবে যখন আমি লাইমিপাড়া বা ফারুকপাড়ায় ভেতরে গেলাম দেখলাম সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব ভাল নয়। তাদের ঘরগুলো মাটি থেকে দেড় থেকে তিন ফিট উচু সিঁড়ি দিয়ে তৈরি। তারা তাদের ট্রাডিশন কিছুটা অবশ্যই বহন করে চলেছে। যদিও বাসার মধ্যে আসবাবপত্র টিভি থেকে শুরু করে অন্যান্য সব আধুনিক সরঞ্জাম আছে। ঐ এলাকার বাঙালি ডাবলু ভাইয়ের (যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন) বন্ধু লিয়াং সাং-এর বাসায় গেলে তার মা আমাদের পেয়ারা খেতে দিলেন। তার রান্নাঘরের মধ্যে গেলাম দেখলাম কাঠ বহন করার ঝুঁড়ি ও খাদ্য বহন করার পুরনো কিছু পাত্রে দরিদ্রতার ছাপ। এদের বাড়িগুলি বাঁশের উপরে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে– যা বাঙালি দরিদ্র পরিবারের মতো কোনক্রমে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয়। বর্তমানে বমরা যারা শিক্ষিত তারা দেশী ও বিদেশী সংস্থায় চাকুরি করে এবং অন্যরা ছোট ছোট ব্যবসাও করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

গারো কারু ও চারু শিল্পের বর্তমান অবস্থা

গারো কারু-শিল্পের মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের ঘর। এর মধ্যে নকমান্দি ঘর দো'চালা লম্বা। আর নকপান্থে এক ধরনের বড় আকারের বাসগৃহ। মজবুত গাছের উপর বাঁশের তৈরি বড় মাঁচা, সামনের দিকে খোলা, এখানে বাঁশের বুননটি দেখার মতো। ঘরের খুঁটিগুলিতে লক্ষণীয় বিষয় ছিল কারুকাজ। তবে এইগুলো এখন শুধু স্মৃতি হয়ে দাড়িয়েছে। গত ২৮ আগস্ট ২০১০, মধুপুরে জনিক নকরেক-এর সাথে কথা হয়। তাঁর বয়স ১০৪ বছর। এই বয়সে তিনি অনেক স্মার্ট। তিনি বলেন,

> "ব্রিটিশদের সময় আমরা ১৬ আনা ফসল তুলেছি, জুম চাষ করেছি। তাদের জমিতে শাক-বাঙ্গি-ধান সবই বোনা হত। পাকিস্তান আমলে জুম চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশদের সময়েও তাদের ঐতিহ্যবাহী এইসব ঘর ছিল। এখন ঐগুলি শুধুমাত্র স্মৃতি হিসাবে কয়েক জায়গায় আছে। পাকিস্তানের শেষ দিকে বাঙালির মতো ঘর হতে থাকে"।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন বাঁশ দিয়ে তৈরি খাট ছিল, এগুলো এখন দেখা যায় না। তারা নিজেদেরকে গারো না বলে মান্দি বলে। আগে মহিলারা ছি ইখিং নিচে পরত আর পুরুষেরা পরত গান্দু লেংটি। এখন পুরুষেরা সকলেই প্যান্ট, লুঙ্গি পরছে। মেয়েরা এক রঙা একটি ব্লাউজ ও কিছুটা লতাপাতা ধরনের অনেকটা ম্রো মহিলাদের পরনের কাপড়ের মতো (সায়ার মতো) কাপড় পরে। মহিলাদের গলায় আগে অলংকার দেখা যেত । হাতে বাজু ছিল। নাকে আংথা, কানে কানপাশা ছিল। আগে জবা, গাঁদা ফুল মাথায় দিতো মহিলারা। এখন কোনো যুবতী মেয়ে যদি শখ করে দিয়ে থাকে, তবেই দেখা যাবে। তিনি কথা বলার সময় পাশে দুইজন নাতি-নাতনী ছিল, তারা ঐ ১০৪ বছর বয়সী দাদুর (জনিক নকরেক-এর) কথাই শুধু হাসছিল। নাতনীর নাম হচ্ছে শাপলা (নামটাও বাঙালি নাম)। দাদু বলছিলেন, ২০৮টা দেবতা আছে এবং উৎসবের সময় তারা এখানে হাজির হয়, এই কথা শুনে শাপলা মিটমিট করে হাসছিল ও আমার দিকে তাকাচ্ছিল।[১৬] এখানে যুবক-যুবতীদের বর্তমান জীবন ও বিশ্বাসের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

গারোরা অতীতে সিংগা বাজাত। নাচ, গান, ফূর্তির সময় তারা মেষের শিং দিয়ে তৈরি বাঁশি ব্যবহার করতো। এখন তা আর নেই। বাবুল মারাক নামের এক কারুশিল্পী, বয়স ৩৫ বছর। তিনি বলেন,

> "মৃতের গা ধোয়ার সময় পিতলের ঐতিহ্যবাহী পাত্র ছিল এখন এটি নাই। খ্রীষ্টান মিশনারিরা আসার পর সংস্কৃতি পরিবর্তনের সাথে সাথে ওটা শেষ হয়ে গেছে। খ্রীষ্টানরা গারোদের কালচার খেয়ে ফেলেছে।"[১৭]

আমি তার কাজ দেখতে লাগলাম। জুম চাষ করার জন্য তাদের এক ধরনের ছোট পাত্র ছিল। যা বর্তমানে আরেকটু পরিবর্তন করে কলমদানীরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। সে এরকম দ্রব্য তৈরি করছে । এছাড়া সে টিস্যু বক্স, ফাইলবক্স, ট্রে প্রতিটি কারুশিল্প তৈরি করছে যা গারোদের কারুকলাতে নতুন সংযোজন।[১৮] আগের মতো বাঁশের সেই এক রং আর নেই। বাঁশকে ধোঁয়া দিয়ে কালো বা গাঢ় খয়েরী রং তৈরি করছে। আঠা দিয়ে জোড়া দিচ্ছে, নতুন ডিজাইন ও রঙের যোগ হচ্ছে তাদের এই কারুদ্রব্যে। তারা এই রং করার স্টাইলটাও জানালো, রান্নার ঘরে উপরে বাঁশের দ্রব্য রাখা হয় নিচে রান্নার ফলে তাপে তা কালো বা গাঢ় খয়েরী রং ধারণ করে ওখান থেকেই এই আইডিয়া, পাত্রে ঐ রং ব্যবহার করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

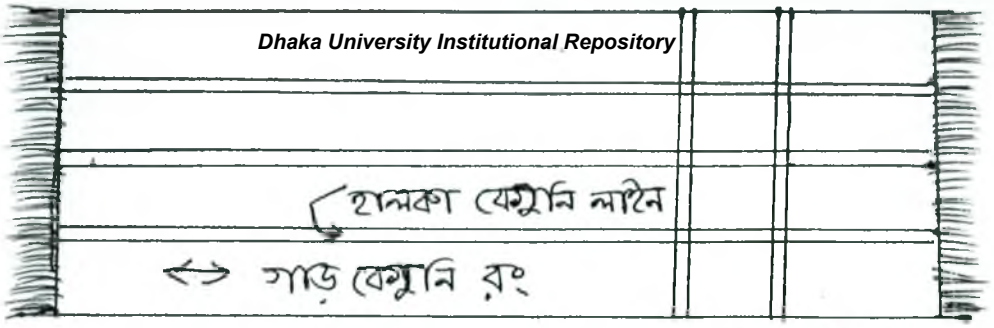

সাধারণত গারো পোশাকে বেগুনি, ম্যাজেন্টা ও নীল রঙের প্রাধান্য দেখা যায়।

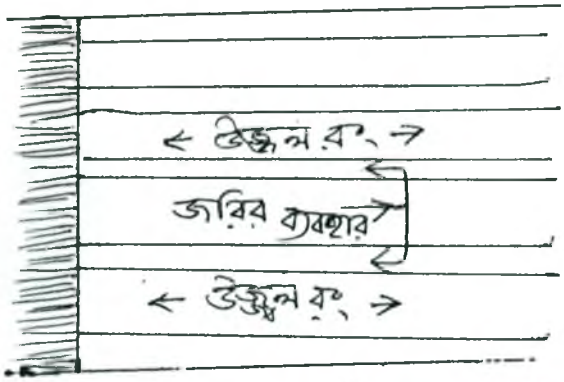

শাড়ির একাংশ ↘

বর্তমানে লাল-হলুদ উজ্জ্বল রং ও জরির ব্যবহার হচ্ছে।

বর্তমানে রং এর শেড ছাড়াও হালকা গোলাপী, খয়েরী, এ্যাশ ক্যাডমিয়াম হলুদ, সবুজ এবং stripe ছাড়াও ফুল ও লতাপাতা, চরকা ইত্যাদি মোটিফ এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

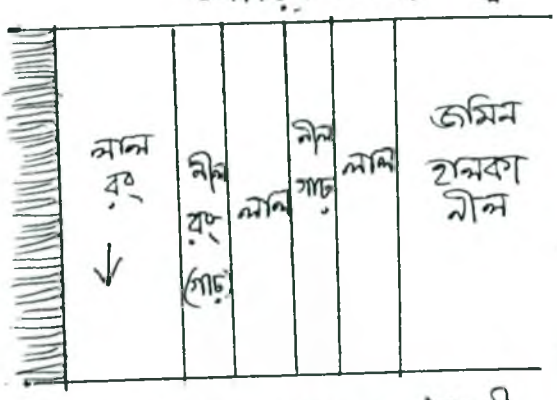

সমসাময়িক কালে (২০১০ এ) তৈরী Silk শাড়ি।

এই শাড়ি কারিতাসের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এই নতুন শাড়িতে এক রং ও তার শেড ব্যবহার করা হচ্ছে। Silk এর মধ্যে, রং হিসাবে লাল, নীল কমলা, সবুজ, সাদা, কালোর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

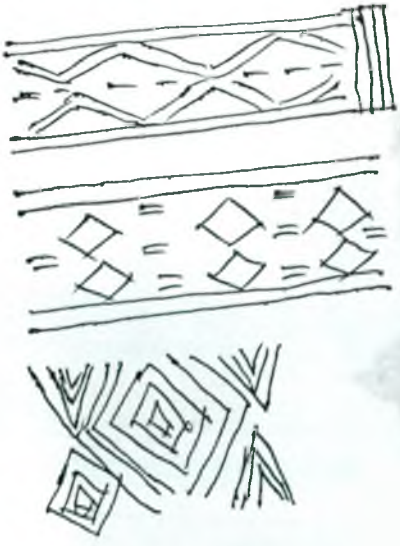

Dhaka University Institutional Repository

এইসব দ্রব্য তৈরিতে মারমাদের দক্ষতা ও ভ্যারিয়েশন অনেক বেশি। তবে ফাইল বক্স ও টিস্যু পেপার আমি গারোদের ওখানে প্রথম দেখি। এটা তাদের নুতন কারুদ্রব্য ও কারুশিল্পের বাণিজ্যিক বা ব্যবহারিক রূপান্তর বলতে হবে।

আগে তাদের অন্যতম আরেকটি কারুশিল্প ছিল মৃত ব্যক্তির স্মৃতি বা মূর্তি স্থাপন। এটা অখ্রীষ্টান (সাংসারিক) গারোরা করে থাকত। বাড়ির সামনের উঠানে এটা করা হত। দাদু, মুরব্বী, বাবা, মা, বা সংসারের কারোর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এটা তৈরি করা হত। তাতে বোঝা যেত যে কে বেশি মুরব্বী, কে তার চেয়ে কম বা কম বয়সে মারা গেছে। কম বয়সের চিহ্নটা নকশা দ্বারা বোঝা যেত। ফর্ম কেটে ফেলে এটা করা হত। এখন এটা নেই বললেই চলে। তবে একটা জিনিস এখনও আছে তা হচ্ছে, যে হাড়িতে বা পাত্রে মদ তৈরি করা হয় সেই পাত্র।

প্রফুল্ল দিব্রার বয়স পঞ্চাশ বছর ,বাড়ি তেলকি, জলছত্র, মধুপুর। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখলাম, তার মেয়ে বাঙালি সালোয়ার কামিজ পরা এবং তার স্ত্রী ব্লাউজ ও সায়া জাতীয় কাপড় পরে আছেন। তবে রান্না ঘরে গিয়ে ঐ মদ তৈরির পাত্র পেলাম। উঠানে দেখলাম বাঙালি ড্রেসের উড়না নেড়ে দেওয়া। আরও দেখলাম প্রফুল্ল দিব্রার ঘরটি টিনের, দেওয়াল মাটির । প্রফুল্ল দিব্রা হলেন একজন চাষী।

কারুশিল্পী বাবুল মারাক আরেকটা পাত্রের নতুন মাত্রা দিয়েছেন। পাত্রটির উপরের অংশ আর নিচের অংশ মিলে অনেকটা ঢোলের মতো , উপরে খোলামুখ। বাবুল মারাক ঐ পাত্রের নিচে কাঠ দিয়ে বেত জাতীয় বাঁশ সংযুক্ত করে দেন, যাতে পাত্রটি এমনি-এমনিই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যা আমি কারুশিল্পের জগতে অন্য কোথাও দেখতে পাই নি। মাটির পাত্র এর সাথে কাঠ ও বাঁশের মিশ্রণ অর্থাৎ মাধ্যমগত পরিবর্তন চোখে পড়ে। মোটিফগত পরিবর্তন আর পাত্রটির গায়ে নকশা দেখতে পাই। আবার দেখলাম ঐ পাত্রের নিচে মানুষের পা লাগানো হচ্ছে যা মাটির তৈরি। এটিতে মোটিফগত পরিবর্তন বা আকৃতিগত পরিবর্তন দেখা যায়। এছাড়া বর্তমানে গারোরা বাণিজ্যিকভাবে ফুলদানী তৈরি করছে ।

হাতির মাথা, গরুর মাথা, ঘোড়ার মাথা যা বাঙালিরা করে থাকে ঐগুলি কিনে এনে ঐ বিষয়গুলির সঙ্গে বাবুল যুক্ত করেছেন নিজের রং, বাঁশ, বেত ও কাঠের ডিজাইন। ফলে নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে।[১৯] নিতেশ নকরেক নামের একজন কারুশিল্পীকেও এই কাজে জড়িত দেখতে পাই। এইগুলি ঢাকাতে

Dhaka University Institutional Repository

এমএমসি নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করছে। সিলেট অঞ্চলেও গারোদের এই পাত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

তাদের তাঁতের বস্ত্রশিল্পে আগে তারা ছোট উড়না বুনতো। আগে দোকসারি ও দোকমান্দা নামের কাপড় মেয়েরা পরত। ঐ কাপড়গুলি চাকমাদের সাথে মিল হলেও অনেক পার্থক্য ছিল। গারোদের কাপড়ের রং কিছুটা অনুজ্জল ছিল। তাদের কাপড়ে সবুজ, হলুদ, খয়েরী, নীল ইতাদি রঙের ব্যবহার বেশী ছিল। কিন্তু তারা বর্তমানে যেসব কাপড় পরে তাতে ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন দেখা যায়, যা মোদের কাপড়েও দেখা যায়। রাখাইন ও মারমাদের পরিহিত নিচের কাপড়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায়, যেখানে অন্যদের (চাকমা, ত্রিপুরা, বম, খুমি, লুসাদের) কাপড়ের ডিজাইন সম্পূর্ণ জ্যামিতিক। অর্থাৎ মারমাদের কাপড়ের মোটিফে লতাপাতার ব্যবহার বেশী। গারোরা এখনও বেশি করে লতাপাতার ওরকম ব্যবহার করতে পারে নি। এছাড়া বর্তমানে তারা চাকমাদের মতো বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য জামা, প্যান্ট, ছেলেদের ফতুয়া, শার্ট তৈরি করছে। এই ফতুয়াতে তারা সবুজ ও খয়েরী এবং হালকা নীল রঙের ব্যবহার করছে। এটা ডিজাইনে চাকমাদের মতো নয়। এই কাপড়ে অনেক জায়গায় হঠাৎ করে গ্রামীণ চেকের মতো পাতলা লাইনের ব্যবহার দেখা যায়। যা চাকমা কাপড়ে তেমন দেখা যায় না। তবে ছোট-খাট কারুদ্রব্য তৈরির বিষয়ে তারা চাকমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

গারোরা এখন প্রায় ৯৫% খ্রীষ্টান। বাবুল মারাকের ভাষায় খ্রীষ্টান হওয়ার পর তাদের উৎসবগুলো হারিয়ে গেছে। আগে বিয়ে হত সামাজিকভাবে এখন বিয়ে হয় গীর্জায়। সেখানে নাচ,গান, উৎসব, আনন্দ হত এবং সাথে সাথে কারুশিল্পগুলোও পুরোদমে ছিল, এর সাথে ছিল নানারকম অলংকার শিল্প। এগুলো এখন নেই বললেই চলে। এখন ছেলেমেয়েরা আধুনিক পোশাকে অভ্যস্থ। তাদের পোশাক ছাড়া, সংস্কৃতি ছাড়া যা আছে তাও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও এনজিওদের স্বার্থ রক্ষা করছে। যেমন- তাদের কাপড় এখন রেশমী সূতায় তৈরি হচ্ছে। এখানে সিন্থের কাপড়ের রং অনেকটা মিশ্র রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। আর রঙের মধ্যে প্রধান রং না থেকে মিশ্র রং ব্যবহৃত হয়েছে, রঙের সেড ব্যবহার হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যে কিছুটা লতাপাতার মোটিফ ছিল সেখানে জ্যামিতিক ফর্মটা বেশি দেখা যাচ্ছে। যা তাদের কারুশিল্পে নতুন (২০১০ সালে কারিতাসের সহায়তায় তৈরি) লক্ষণীয় যে, এটাকে গারোরা (যেমন– কারুশিল্পী বাবুল মারাক) তাদের ঐতিহ্যের কাপড় মনে করে না। সাম্প্রতিককালে তারা পার্স, ভ্যানিটি ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, বাচ্চাদের জামাকাপড়, তৈরি করছে।[২০] কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

জামদানি প্রভাবিত ডিজাইনের ধরন লক্ষ্য করা যায় । এখানে তারা কালো বা খয়েরী রঙের জমিনের উপরে ডিজাইনের মধ্যে বাঙালি প্রভাবিত লতাপাতা ফুল ইত্যাদির নকশা করছে। এছাড়া বর্তমানে তারা অলংকার হিসাবে তারা রূপা, এলুমুনিয়াম, তামা, রং-বেরঙের পাথর ব্যবহার করছে। তারা এখন বিভিন্ন রঙের প্লাস্টিকের নানা ধরনের চূড়ি ও ইমিটেশন পরছে।

বর্তমানে তাদের তৈরি কাপড় দেখে এটা যে গারোদেও কাপড় তা বোঝা যায়। রং ও ডিজাইনে এখনো কিছুটা নিজস্বতা বজায় রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ তাদের বস্ত্রশিল্প নতুন ধারার বস্ত্র, রং ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নকশায়ে ভরে উঠছে। অবশ্য এর কিছু অংশ চলে যাচ্ছে এনজিও কারিতাসের পকেটে। অর্থাৎ গারো কারিগররা অর্থনৈতিক সুফল পাচ্ছে কম।

সাঁওতাল কারু ও চারু শিল্প পরিবর্তনের ধারায়

রহননগর, তানোর, আর কাকনহাটে বেশি সাঁওতাল বসবাস করে। এ কারণে সাঁওতালদের আবাসভূমি স্বচক্ষে পরিদর্শন করতে, তাদেরকে বুঝতে ও তাদের সম্পর্কে তথ্য নেয়ার জন্য কাকনহাটে যায়। সাঁওতালদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তি অনীল মারান্ডির কাছ থেকে জানতে পারি যে, এ অঞ্চলে সাঁওতালদের সাথে নৃত্য ও গানে এবং পোশাকে শুধুমাত্র মাহলে ও ওরাঁওদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সাঁওতাল কারুশিল্পের অন্যতম বিষয় ছিল ঘরে অঙ্কিত চিত্র, ঘরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র বা ঘরের দেওয়ালে অঙ্কিত ডিজাইন। তাদের গৃহগুলিতে তাদের পরিচয় বিদ্যমান ছিল । তাদের ঘরের দেয়াল মাটির আর ছাউনী ছন ও খড়ের হয়ে থাকে। নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল এলাকাতে মাটির দোতলা দেখা যায়। তাদের ঘরের বৈশিষ্ট্য, ঘর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । ঘরের দেওয়ালে বিচিত্র নকশা দেখা যায়। ঘরের রং কমলা বা লাল, তার মধ্যে পাতার মতো বা লতার মতো মোটিক। এই বিষয়টি আমরা ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ রাজশাহীর 'ফুলবাড়ী', কাজমা, কাকনহাট এলাকায় গিয়ে বেশ কিছু ঘরে দেখতে পাই। এর মাঝেও ঘরভেদে ডিজাইনে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়, অবশ্য প্রত্যেক বাড়িতে এই রং ও ডিজাইনটা দেখা যায় নি।

উল্কি ছিল সাঁওতালদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারুশিল্প। যুবক ছেলেমেয়েরা ছাড়াও অন্যরাও শরীরে উল্কি আঁকত । রাজশাহীতে আমার সঙ্গে থাকা ১৭ বছরের সলোমান সাঁওতালের ডান হাতের কব্জীর উপরে আমি এটা দেখেছি। আগে মেয়েরা হাতে, বাহুতে এমন কি বুকেও উল্কি আঁকত। এটি ধিরে

Dhaka University Institutional Repository

ধিরে উঠে যাচ্ছে। তাদের ঐতিহ্যের আরেক প্রধান বৈশিষ্ট্য তীর-ধনুক। সাঁওতাল মানেই তীর-ধনুক। এই বিষয়টি এখন আর নেই। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০, ৩.১০ মিনিটে আমরা ভিম হাসদার বাড়িতে যায়। তিনি শিক্ষিত। আগে শিক্ষক ছিলেন, এখন ধর্ম প্রচারক (কাঁকনহাটে বাড়ি, বয়স-৭০)। তিনি বললেন, ৩৫/৪০ বছর ধরে এটা বিলুপ্তির পথে চলেছে, এখন বিলুপ্ত প্রায়। তিনি আরও জানালেন, আমার শরীরেও উল্কি আঁকা ছিল এখন সেটা হালকা হয়ে গেছে। এটা একসময় মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে তীর-ধনুক তার বাসায় পাওয়া গেল। তবে তা দেখে বোঝা যায় এটি অব্যহৃত অবস্থায় অনেকদিন পড়ে আছে।

তাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল করতাল, ঢোল, বাঁশের বাঁশি, নাগরা ইত্যাদি। তবে এখন এদের মধ্যে ঢোলটা কারও কারও বাসায় দেখা যায়। উৎসবের সময় ঢোল চোখে পড়ে। এর মধ্যে নতুন যে যন্ত্রের ব্যবহার তারা করছে তা হচ্ছে হারমোনিয়াম। আগে মেয়েদের মাথায় কাঁটা, ঝুমকা কাঁটা, ফুল-পাতা, কোমরের বিছা এগুলি ছিল, হাতে বালা , পায়ে বাফ পরত। এই অলংকারগুলির একটিও ঐ বাসার কর্তার স্ত্রী মার্গারেট হাসদার শরীরে দেখা গেল না। তবে গলায় একটি পুঁথির মালার মতো দেখা গেল । অবশ্য বাড়িতে কখনো কখনো তারা সাজসজ্জা করে থাকেন, এটা দেখে তাদের সামাজের পরিবর্তনটা বোঝা যায়।

৫০/৬০ বছর আগে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে নির্মিত খাটে তারা ঘুমাতো; বাপদাদার আমলে এটা ছিল এখন নেই। সাঁওতালদের জাদুঘরে, রাজশাহী শহরে পুরানো কিছু পাত্র ,ঝুড়ি, পাখি রাখার ফাঁদ ইত্যাদি দেখেছি, যা এখন দেখা যায় না। এখন তারা সবাই আধুনিক জিনিস ব্যবহার করছে। তার মতে সাঁওতালরা ৫০/৬০ বছর আগেও কৃষি কাজ করেছে। প্রায় ২০০ বছর আগে তাদের শিকার করা পেশা ছিল বলে জানা যায়। তারা যে আলাদা কাপড় পরত তা বিহারের, জুলহা/জুলা দ্বারা তৈরি ছিল। এখন এটি বোনার কারিগর নেই, তাই এগুলো তৈরি করা হয় না।[২১]

আগে সাঁওতালরা পরত পানচি[২২]; গামছার মতো লম্বা, লাল রঙের নকশাকৃত, আর পাড়হাড়ি পরত; লুঙ্গির মতো, এটি উপর থেকে আলাদা। এগুলো আগে এখানে আসত, '৪৭-এর পর থেকে আসা কম হয়ে যায়। পুরনোরা অনেকে এখনো ধূতি পরে। তাদের কারুশিল্পের মধ্যে দুল পিঠা (রস পিঠা) ভাপা, ধুপি পিঠা অন্যতম। এগুলো বেশীর ভাগই উঠে গেছে। তাদের "হাড়িয়া" নামক যে মদ তারা চাল থেকে তৈরি করে তা কিছুটা চালু আছে এখনো, অবশ্য তা উৎসবকে উপলক্ষ করে।

Dhaka University Institutional Repository

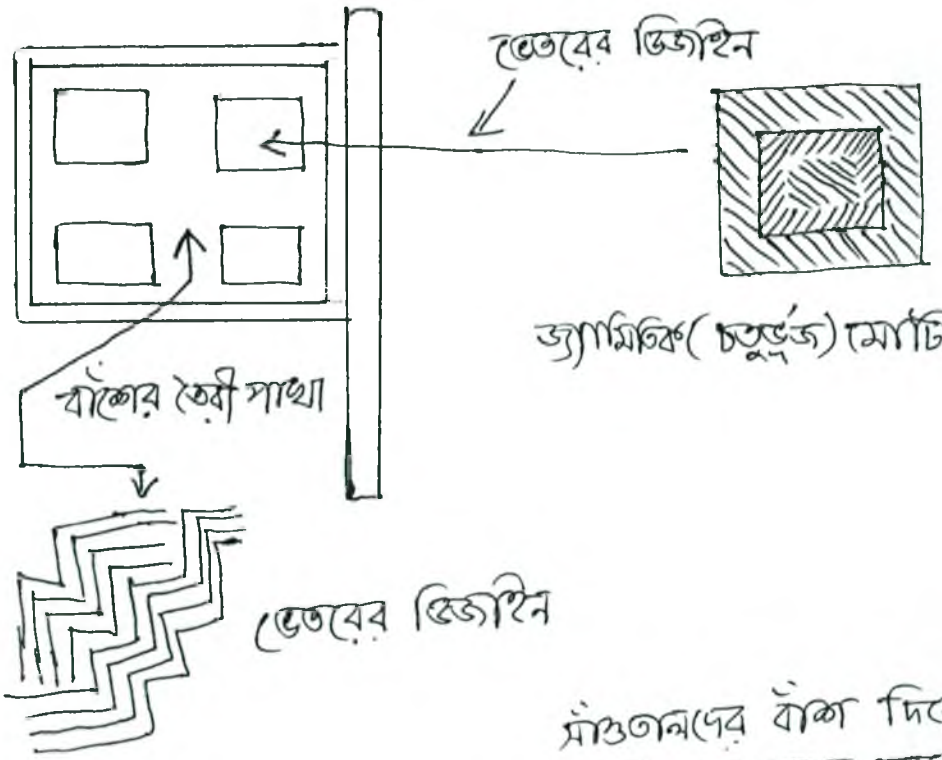

সাঁওতালদের বাঁশ দিয়ে তৈরী ঝুড়ি বা অন্যান্য দ্রব্যের বুনন প্রায় বাঙালীদের মত, তবে বর্তমানে এই বুননে তাদের ডিজাইনে ও রং ব্যবহারে নতুনত্ব দেখা যায়।

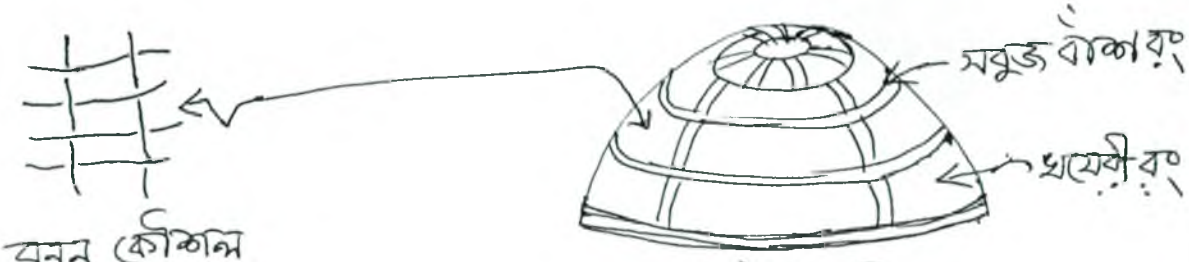

বর্তমান রঙের এবং ডিজাইনের যে পরিবর্তন তা হল বাঁশ চেঁচে "হালকা খয়েরী" চামড়াই ও না চেঁচে "সবুজ রঙের" চামড়াই দিয়ে বোনা হচ্ছে, তাতে ঝুড়িতে, — ২টি রং দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ব্যবহারকৃত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁসার থালা-বাটি। তবে তার দাম বেশি হওয়ার জন্য এখন তারা ব্যবহার করে না । রহনপুর ১৯০৩ সাল থেকে খ্রীষ্টান এলাকা হতে শুরু করে । এখন তারা ৮০% এ উপরে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে বলে জানা যায়। কারুশিল্পের, সমাজের ও উৎসবের এই পরিবর্তন গত ১০০ বছরে বেশি হয়েছে। এখন এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল, ৫ বৎসর আগে বিদুৎ এসেছে। কেউ কেউ সরকারি, আবার অনেকেই এনজিও-তে চাকরি করছে। ব্যবসা করে কম, পুঁজি নাই তাই সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে এখনও এই সব এলাকার দারিদ্র্যতা চোখে পড়ার মতো । এই এলাকার মুসলিমদেরও একই অবস্থা। কাকণহাট যাওয়ার পর , ভিম হাসদার বাড়িতে যে মুসলিম কৃষক আমাদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এলো, তার পরনের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। তবে যেভাবে ঐ মুসলিম এসে তাকাল ঐ বাড়ির কর্তীকে ডাকলো, কর্তা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলো– তাতে বুঝা গেল আন্তরিক এক সম্পর্ক রয়েছে তাদের মধ্যে।

আগে সাঁওতাল মেয়েদের পায়ে ঘুঙুরের মতো অলংকার ছিল, যার নাম নিপুর। তারা রূপার গহণা পরত, রূপার মালা, সোনা তেমন ব্যবহার করত না, বাজু পরত রূপার, বানকি পায়ের গোড়ালিতে পরত। এখন সাঁওতালরা ইমিটেশন ও অন্য গহণা ব্যবহার করছে। তবে যারা সামর্থবান তারা আধুনিক সোনার গহণা পরছে।[২৩] এখন নাচ, গান আছে কিন্তু, উৎসব-বিয়ে-ধর্ম-সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে, যেমন নাচের সময় তারা মাদুলি পরত, যা পায়ের নিচ দিকে চওড়া ঘুঙুরসহ পেঁচানো হত , এখন মাদুলি নাই। আগে বিয়েতে ডালি ছিল, যেখানে কনে উঠে বসত তাতে ফুল, পাতা থাকত, ডালিটা এখন নাই।

এখন বিয়ে হয় চার্চভিত্তিক, আনন্দ উৎসব নেই, রেজিস্ট্রি করে এখন বিয়ে হয়। আগে সামাজিকভাবে বিয়ে হত, গ্রামের সবাই থাকত। এখন এইসব আনন্দ নেই , বিয়ের সেই পালকিও এখন নেই । গত ১৯৮৫ সালে বিয়েতে শেষ পালকি দেখা গেছে। তাদের গায়ে উল্কি করায় নিয়ম ছিল সূচ দিয়ে, মেডিসিন দিয়ে খোদাই করে । আট/দশ বছর বয়স হতে যা মুত্যু পর্যন্ত থাকত, নাম, ফুল, পাখি উল্কিতে আঁকা থাকত। ছেলেরা আগে মাথায় পাঁগড়ি পরত তাতে ময়ূরের পাখা লাগানো থাকত, ছেলেরা নাচে পারদর্শী ছিল এখন এগুলোর আর চর্চা নেই।

সাঁওতাল গণেশ মাঝির (বয়স ৪২ বছর) ওখানে আমরা বাঁশের ছাতা দেখতে পাই যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এই Change-গুলো কেন হচ্ছে ? তাতে তার উত্তরে ছিল–

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জাতিরই একজন গুরু থাকে সাঁওতালদের এখন সেই রকম নেই, Orientation নেই। এগুলো কিছুটা ফিরে আসা সম্ভব যদি কারুশিল্প সংগ্রহ করে, নতুন করে তৈরি করে এবং প্রচার-প্রসার করে দক্ষ কারিগর তৈরি করা যায়।

গণেশ মাঝি বলেন, জাতীয়তাবোধ তৈরি করতে হবে। ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রতিযোগিতা করে তা আনার চেষ্টা করতে হবে। আর ভীম হাসদার কথা হল–বর্তমানের এই পরিবর্তনের পিছনে পারিপার্শ্বিক একটা বিষয় আছে, ছেলেমেয়েরা এখন পড়াশোনা করছে, তারা পুরোনো কায়দা-কানুনে বিশ্বাস করে না। ফলে এই Change-গুলো অনেকটা এমনিতেই হচ্ছে যা থামানো যাবে না।

মণিপুরী কারু ও চারু শিল্পের বর্তমান অবস্থা

মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাংলাদেশে নৃ-গোষ্ঠীগুলোর থেকে বিশেষভাবে আলাদা। তাদের জীবন বোধ ও শিক্ষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাদের আনুমানিক ৩০০০ বছরের ভাষা চর্চার ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের ঐতিহ্যের অন্যতম বিষয়– তারা শিক্ষায় অনেক আগে থেকেই অগ্রগামী। তাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ, নাচে তারা বিশ্বখ্যাত, তারা দর্শন চিন্তায় উন্নত। নাচের কারণে অলংকারে তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঐতিহাসিকভাবে তাদের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। তাদের মরমি গান-নাচ তাদের কারুশিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্ত্রশিল্পে তাদের রঙের বিশেষ ব্যবহার যা আর কোনো নৃ-গোষ্ঠী বস্ত্রশিল্পে দেখা যায় না। হালকা নীল, হালকা গোলাপী, হালকা কমলা, হালকা সবুজ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রং দেখা যায়, সেড এর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। যা বস্ত্রতে একটা স্বাপ্নিক আবহ তৈরি করে। তাদের কাপড়ের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো হলো : আগে পরিধানের জন্যে নির্দিষ্ট পোশাক ছিল, তারা শাড়িও পরতো। মাথায় পাগড়ী ব্যবহার পরত। বর্তমানে তারা চাকমাদের মতো বাঙালি সালোয়ার কামিজ, ছোটদের শার্ট-প্যান্ট, বড়দের শার্ট ইত্যাদি তৈরি করছে ও পরছে। তবে রং ও ডিজাইন তারা তাদের মতোই আছে। তারা বাঙালিদের জন্য শাড়িও তৈরি করছে। শাড়ির পাড়ে একটি চিহ্ন দেখা যায়। যা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতীক। সিলেট শহরের মণিপুরী মহিলা সমিতির সভানেত্রী এস রিনা দেবী (বয়স ৬৮) বলেন– ধর্মীয় স্থাপনার (মন্দিরের)প্রতীক হিসেবে এটা শাড়িতে এসেছে।[২৪] বর্তমানে বাঙালিরা পরতে পারে সেভাবেই– তারা শাড়ি তৈরি করছে । তবে ডিজাইন ও মোটিফে আরও আধুনিক ফর্মের

Dhaka University Institutional Repository

মনিপুরীদের কানের দুল,

বালা

বালাতে নাগএর মাথার মোটিফ আগে দেখা যেত।

বর্তমানকালে তাদের কাপড়ে লতা পাতা, ফুল ও বিভিন্ন ধরনের মোটিফ দেখা যাচ্ছে।

এই মোটিফ গুলো ছাড়াও তাদের শাড়ির উপর জামদানি শাড়ির প্রভাব সমসাময়িক কালে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার দেখা দেয়, যেমন : তাদের মোটিফ বা ডিজাইনের সঙ্গে বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ির (জামদানি প্রভাবিত ডিজাইনের) তুলনা করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে তাদের কাপড়ে রেশমী সূতার প্রচলন দেখা যায়। এখন জরির ব্যবহারও লক্ষণীয়। বর্তমানে জরি একটা উড়নার দু'পাশে ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

তাদের কারুশিল্পে সাম্প্রতিককালে লতা, পাতা, ফুল, সরলীকরণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার তারা শাড়ির বডিতে সেই জ্যামিতিক জামদানী ফর্ম ও রাখছে। তারা এখন শাড়িতে কাপড় কেটে ফুল আকারে বসাচ্ছে অর্থাৎ এ্যাপলকও করছে। তাদের সাম্প্রতিক ফুল- পাতার ডিজাইনে অভিজ্ঞতার ছাপ বিদ্যমান, এটা নান্দনিকও বটে। সর্বোপরি তাদের কাপড়ে হালকা সেড ,হালকা কালার ও সাদার ব্যবহারে তারা অধ্যাত্মিকতায় ডুব দিয়ে শুভ্রতার স্নিগ্ধ ভাবটা ধরে রেখেছে বলে মনে হয় ।

তাদের শাড়ির বুনন বাঙালিদের শাড়ির মতো তেমন জমাটবদ্ধ নয়। বাঙালিদের শাড়ির সূতার গাঁথুনী আলাদা করে বোঝা যায় না, সবই এক সাথে লেগে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের কাপড়ের গাঁথুনী এমনভাবে বোনা হয় যেন, এক সূতা অন্য সূতার মাঝে একটা গ্যাপ থাকে। অনেকটা হালকা স্বচ্ছ স্বভাবের। এছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মসলীন কাপড়ের সাথে তাদের বর্তমান কোনো কোনো কাপড়ের হালকা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[২৫] তাদের কাপড়ের বুননটা জমাটবদ্ধ নয় কিন্তু ওজনে বেশ ভারী। বর্তমানে ঢাকা শহরে আলাদা করে মণিপুরী কাপড়ের দোকান দেখা যায়। অর্থাৎ এর প্রসারটা বাঙালি সমাজে ভালই হয়েছে। আর তারা একমাত্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যারা অনেক আগে থেকেই স্বর্ণ অলংকার পরে। অলংকার কারুশিল্পের ইতিহাসে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। অবশ্য তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অলংকারের ব্যবহার এখন শুধুমাত্র উৎসব ও নৃত্য অনুষ্ঠানে দেখা যায়। তবে তাদের অলংকার পরাটা একেবারে কমে যায় নি। তাদের অলংকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সূক্ষ্ম কারুকাজ অলংকারের অনেক জায়গা জুড়ে থাকত এবং বড় হওয়ায় অনেক ভারী হত। তাদের সাথে ত্রিপুরাদের আগের অলংকারের কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে চাকমা, মারমা, বম, ম্রো, এদের সাথে অলংকারে কোনো মিল নেই। এদের কারুকাজ অতুলনীয়, অলংকারগুলো আকারে বড় বড় ছিল। তারা শিক্ষিত, অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, সে কারণে বাড়িতে তাদেরকে স্বর্ণ অলংকার পরা অবস্থায় দেখা যায়। এখন তাদের ট্রাডিশন ও আধুনিক ডিজাইনের সমন্বয়ে অলংকার তৈরি করা হচেছ। এখন আছে

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্য, আছে নতুনত্ব। তাদের এখনকার অলংকারে বাঙালি অলংকারের ডিজাইনের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

তাদের তাঁতশিল্প এখন অনেকখানী বিলুপ্ত প্রায়।[২৬] চাকমাদের মতো বাণিজ্যিকভাবে তাদের একটি অংশ বস্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বর্তমানে তাদের পরিবর্তনটা হচ্ছে বাঙালিদের প্যাটার্নে প্রভাবিত হওয়া ও চাকমাদের মতো বাঙালিদের পরিহিত ফতুয়া, ছোটদের জামা, প্যান্ট শার্ট, চাদর, বেটসীট, কুশন ইত্যাদি তৈরি করা। এগুলো করা হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে। বর্তমানে মণিপুরীরা পাকা দালানে বসবাস করে। অন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মতো পাহাড়ে-পর্বতে বসবাসের ঐতিহ্য তাদের কম। মণিপুরীদের কিছু খেলাধুলা ছিল যেগুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে।

বর্তমানে মণিপুরী ছেলে-মেয়েরা আধুনিক পোশাক পরিধান করছে। বিভিন্ন নাটক ও মডেলিং এ অংশ গ্রহণ করছে। তারা জিন্স প্যান্ট, শার্ট, সালোয়ার কামিজ, টি-শার্ট সব কিছুই পরছে। এক্ষেত্রে তারা অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এস রিনা দেবীর ছেলে অভিরূপ সিন্‌হা বস্ত্রশিল্প নিয়ে (ফ্যাশন) প্রদর্শনী করেছেন, যেখানে– ফতুয়া, টি-শার্ট, শার্ট, সালোয়ার কামিজ এবং মণিপুরী ঐতিহ্যের পোশাক-ধূতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে এখানে আধুনিকতা ও বাঙালি প্রভাবটাই প্রকট। ডিজাইন ও মোটিফে এবং রঙের ব্যবহারে এগুলো সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক। তাদের মধ্যে আগে বাঁশের তৈরি কিছু কারুশিল্প ছিল সেগুলো এখন দেখা যায় না। তারা প্রতিমাশিল্প তৈরিতেও বিখ্যাত ছিল, কারণ তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী।

তাদের কিছু কারুশিল্প যেমন– ঢাক, ঢোল, বাদ্যযন্ত্র, ঘুঙুর, পাগড়ী এবং বিশেষ পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি বর্তমানে শুধুমাত্র উৎসবেই দেখা যায়। এগুলোকে আগের মতো সবার পরিবারে দেখা যায় না। তাদেও কারুশিল্পগুলোও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মতো বিলুপ্ত হতে চলেছে।

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের চারুশিল্পের পরিবর্তন:

অন্যদিকে সকল আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের চারুশিল্পের পরিবর্তন সর্ম্পকে বলা যায় যে– চাকমারা তাদের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বা নিসর্গ, জীবজন্তু ইত্যাদি আঁকত, যা ছিল গতানুগতিক। বর্তমানে মূল দু'টি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় : এক বিষয়গত পরিবর্তন, যেমন– গারো শিল্পী সোল হাঙচা পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে ছবি এঁকেছেন। দ্বিতীয় পরিবর্তন হলো রঙের, যেমন– কনক চাপা চাকমার সাম্প্রতিক ছবির রং

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল ও গঠনের দিক থেকে আধুনিক, কিন্তু আগে দেখা গেছে অধিকাংশ চাকমার ছবির রং ম্রিয়মাণ। আর বমদের দু-এক জন ছবি আঁকা শুরু করেছে, ছবির গঠন আধুনিক, তবে বিষয়ের দিক থেকে পুরনো রীতির, ভাস্কর্যে তারা নবীন। মণিপুরীদের দু-এক জন ছবি আঁকছেন, তাদের রং ও গঠন আধুনিক, তবে তাদের স্বাপ্নিক হালকা রং-গুলো সেখানে আছে। আর ত্রিপুরারা ভাস্কর্য করছেন, তাদের ফর্ম, মোটিফ ও গঠনপ্রকৃতি আধুনিক। সাঁওতালদের মধ্যে ভাল ছবি আঁকছেন এমন কাউকে এখনো পাওয়া যায় নি ।

465381

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ফরেস্ট কলোনির ফিল্ডওয়ার্ক রির্পোট থেকে নেওয়া (রাঙ্গামাটি জেলা)

২ ১৪ সেপ্টেম্বর ,২০১০ ফরেস্ট কলোনির পলিনা চাকমার সাথে আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্য (রাঙ্গামাটি জেলা)

৩ ২৩ মার্চ ২০১১,বেন টেক্সটাইলের প্রধান মঞ্জুলিকা খিসার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য (রাঙ্গামাটি জেলা)

৪ ১৫ সেপ্টেম্বর ,২০১০, কাপড়টি শহরের বিপণী কেন্দ্রে দেখা গিয়েছিল (রাঙ্গামাটি জেলা)

৫ তাদের হাতে বোনা ব্যাগের ছবি চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে

৬ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ -এ ত্রিপুরা পল্লী কিল্লাপাড়, বালুখালী, রাঙ্গামাটির ফিল্ডওয়ার্কের তথ্য থেকে নেওয়া

৭ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ -এ ত্রিপুরা পল্লী কিল্লাপাড়, বালুখালী, রাঙ্গামাটির ফিল্ডওয়ার্কের তথ্য থেকে নেওয়া

৮ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটির নির্মলেন্দু ত্রিপুরার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য (রাঙ্গামাটি জেলা)

৯ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ কালিঘাটা, বান্দরবনের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য

১০ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ ফারুকপাড়ার শৈলপ্রপাত এলাকা, বান্দরবনের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য

১১ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ বান্দরবন, বান্দরবনের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য

১২ ১৬ সেপ্টেম্বর ,২০১০-এ ফারুকপাড়ার শৈলপ্রপাত, বান্দরবন এলাকার রবিন বমের দোকানের তৈরি কারুদ্রব্য, ছবি চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে

১৩ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ ফারুকপাড়া, শৈলপ্রপাত, বান্দরবন এলাকার রবিন বমের দোকানের তৈরি কারুদ্রব্য, ছবি চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে

১৪ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০, এ ফারুকপাড়া, শৈলপ্রপাত, বান্দরবন এলাকার প্রাইমারী শিক্ষক ফরমাং বমের সাথে কথাপকথন থেকে প্রাপ্ত তথ্য

১৫ ২৮ আগস্ট, ২০১০ চুনিয়াম্রাম, পীরগাছা, মধুপুর,টাঙ্গাইল থেকে পাওয়া তথ্য

১৬ ২৮ আগস্ট ২০১০ আচিক মিচিক সোসাইটি, পীরগাছা, মধুপুর টাঙ্গাইলের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য (আধুনিক কালের যুবক-যুবতীরা পুরানো বিশ্বাসের প্রতি এখন আর আস্থাশীল নয়)।

১৭ ২৮ আগস্ট, ২০১০ আচিক মিচিক সোসাইটি, পীরগাছা, মধুপুর টাঙ্গাইলের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য

১৮ ২৮ আগস্ট ,২০১০ আচিক মিচিক সোসাইটি, পীরগাছা, মধুপুর টাঙ্গাইলের ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য

১৯ ২৮ আগস্ট, ২০১০ চুনিয়াম্রাম, পীরগাছা, মধুপুর টাঙ্গাইলের কারুশিল্পী বাবুল মারাকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য

২০ ২৮মে, ২০১০,জলছত্র বাজার , মধুপুর টাঙ্গাইল এলাকার একজন গারো যুবকের দোকান থেকে তোলা ছবি(ছবি চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে)

২১ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ভিম হাসদা, মার্গারেট হাসদা ও পাতরাশ মারান্ডির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, কাকনহাট, গোদাগাড়ি, রাজশাহী

২২ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সদর, রাজশাহী থেকে অনীল মারান্ডির দেওয়া তথ্য

২৩ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০গণেশ মাঝির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, পাঁচগাছিয়া, লাখড়াদি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

২৪ ৮ ই মে,২০১০,সিলেট ফিল্ডওয়ার্ক থেকে পাওয়া তথ্য, মণিপুরীপাড়া, সিলেট

২৫ ২০১০, কারুশিল্প মেলা থেকে নেওয়া ছবি, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা (ছবি চিত্রমালাতে দেওয়া হয়েছে)

২৬ ৮ মে, ২০১০, মণিপুরী মহিলা সমিতির সভানেত্রী এস রীণা দেবীর বাড়িতে অনেক তাঁত ছিল বর্তমানে একটাও নেই, মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট (এস. রীণা দেবীর দেওয়া তথ্য)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

রাঙ্গামাটি সরকারী স্কুল (১৮৯০) প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মণ্ডলসহ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সামগ্রিক এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ছিল ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী, কিন্তু ত্রিপুরারা ধর্মে সনাতন হিন্দু হওয়ায়, বিভিন্নভাবে অসহযোগিতার স্বীকার হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে ৭০ দশক থেকে ২০০০-এর মধ্যে চাকমারা ঐ জায়গা দখল করে। রাঙ্গামাটি জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হযে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনযাত্রা, কারুশিল্প ও খাদ্যাভাস জড়িত। তাদের বস্ত্রশিল্পে ও তাদের জীবনযাত্রাতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন দেখা যায়। চট্টগ্রামে ১৯২৫ সাল থেকে পরিবর্তনটা বেগমান হয়। ব্রিটিশ আমলের শেষের (১৯৪৭) দিক থেকে শুরু হয় আরেকবার পরিবর্তন। ৫০ / ৬০ দশক পর্যন্ত জুম চাষ করা হত এবং জুম থেকে তুলা উৎপাদন ও সূতা তৈরি করা হত। সত্তরের দশকে এটি কমে যায়।এসময় অন্যান্য কারুশিল্পেও পরিবর্তন আসতে থাকে । ব্রিটিশ সময়ে কালো রঙের কাপড় বোনা হত। সাদা রঙের কাপড়ও ছিল। এরপরে কালো, লাল এবং সাদা তিনটি রংই ব্যবহার করা হয়। ৪৭-এ দেশ ভাগের পর অন্যান্য রঙের আবির্ভাব হতে থাকে। সত্তর থেকে আশির দশকে নীল, হলুদ এবং সবুজ রং যোগ হয়। আশি থেকে শুরু নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে বা আরও পরে কমলা, সবুজ এবং সোনালী রঙের প্রাধান্য দেখা দেয়। এসময় সিন্থের সূতা দিয়ে কাপড় তৈরি হতে থাকে। ৭০-এর দশকের পরে আরেকটা পরিবর্তন, বাজার সম্প্রসারণ, ৯০-এর পর আরেকবার পরিবর্তন আসে, খাগড়াছড়িতেও ঐ পরিবর্তন এসেছে। আর বান্দরবনে অনেক পরে এসেছে। গারোদের মূল পরিবর্তনটা এসেছে বাংলাদেশ হওয়ার আগে থেকে, তবে তা ধীরে এবং মণিপুরীদের এসেছে আরও পরে।

সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়– চাকমারা (মেয়েদের)পিনন, সিলুম (শার্ট), হবং (পাগড়ী) ও ছেলেদের পোশাক : কোট, সিলুম ও খাটো ও লম্বা ধূতি এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব বুরগী, মোটা চাদর, হাত-হাবর, গায়ের শাল, ঝোলা, গামছা, মাফলার ইত্যাদি আগে বুনতো, পরতো। আগে জুম চাষ থেকে কার্পাস তুলে চারকায় সূতা বানিয়ে এরপর সূতা ভাতের মাড়ের সঙ্গে খুব ভাল করে মিশানো হয়। তারপর সূতা খুব ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে সূতার মাঝখানে দুইটা বাঁশ ঢুকিয়ে সূতার মাড় ফেলে দেওয়ার পর সূতা রোদে শুকানো হয়। সূতা

Dhaka University Institutional Repository

শুকানোর পর বৃদ্ধাঙ্গুলে পেঁচিয়ে তুম করে নিত । পিননে যে ডিজাইন করা হবে তা বাঁশের সরঞ্জাম দিয়ে 'তানা'-তে ঐ ডিজাইন ঠিক করা হত এবং এরপর বুনন শুরু করা হত। এগুলোর সূতা করমা গাছের পাতা দিয়ে রং করা হত। যেমন– এ গাছ থেকে পরিমাণ মতো পাতা তুলে চুনের পানি দিয়ে মিশিয়ে ৫দিন পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখত , এরপর রঙে পানি মিশিয়ে তাতে পরিমাণ মতো সূতা ডুবালে সূতা নীল রং হয়ে যেত এবং ঐ নীল রঙে পলিমাটি দিয়ে ডুবালে সূতা কালো রং হয়ে যেত। আবার রং গাছের বাকল ও সূতা পানিতে মিশিয়ে সিদ্ধ করলে লাল হয়ে যেত । এভাবে লাল কালো ও নীল সূতা রাঙানো হত। বর্তমানে গাছের বাকল দিয়ে এভাবে রং করা ও জুমের কারপাস তুলে চরকায় সূতা তৈরি করা চাকমাদের থেকে প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। বর্তমানে বাজার সম্প্রসারণের ফলে দেশে বিদেশী সূতা সহজ লভ্য হয়েছে। এগুলো দিয়েই পাহাড়ীরা এখন কাপড় বুনছে। শিক্ষা ও নগরায়নের ফলে পাহাড়ীদের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। স্কুল-কলেজে পড়া, অফিস করা ইত্যাদির জন্যে এখন পোশাক বোনার সময় অনেকে পায় না। সেক্ষেত্রে তারা শাড়ি, সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি পরছে। আর ছেলেদের পোশাকের পরিবর্তন এসেছে অনেক আগে থেকেই। চাকমাদের জীবনে 'বেইন' আর আগের মতো অপরিহার্য নেই। ফলে ডিজাইন অর্থাৎ আলাম ও প্রাচীন লোকগাঁথা চাকমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে ছেলেরা গামছা পরত ও মেয়েদের পিনন যা কেবল কালো রঙেই বোনা হত। এরপরও বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পিননে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, এটা ভাল, মানুষ আধুনিক হচ্ছে ও অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মেয়েরা এই বেইন বোনার পর অর্থ দিয়ে পছন্দের জিনিস কিনতে পারে ও বাচ্চাদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া সংসারের কিছু সাহায্যও করতে পারে এবং বাড়তি আয়ের একটি আনন্দও তারা পেয়ে থাকে। আদিবাসী পরিবারগুলোকে মেয়েদের বেইনের আয় সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না। অধিকাংশেরই স্বামী দিন-মজুরী করে ও স্ত্রীরা বেইন বুনে অর্থ উপার্জন করে। এদের অনেকেরই বাস্তভিটা নেই। বেইন বোনার পর তারা দুই/তিন কিলোমিটার দূরে এসে বাজারে বাকীতে মাল দিয়ে আসেন, এরপর বিক্রি হলে তারা টাকা পান। অনেক সময় তারা অর্ডার পান এবং এতে তাদের উপার্জনটাও ভাল হয়। বর্তমানে সূতার দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া এবং কাপড় বিক্রির সুযোগের অভাব হওয়ার ফলে তাদের পুঁজির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোমরতাঁতে বোনা কাপড় টেকসই ও সূক্ষ্ম কারুকাজ থাকলেও মেশিন-

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতে বোনা কাপড়ের চেয়ে দাম অনেক বেশি পড়ায় পাহাড়ী কাপড়ের চেয়ে মেশিনে বোনা কাপড়ের দিকেই লোকজন বেশি ঝুকছেন। যার ফলে আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কোমরতাঁতে বোনা কাপড় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে টিকে থাকতে পারছে না।

পরিবর্তনের ধারায় চাকমা কাপড়ে ১৯৯০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে কমলা এবং সবুজ রঙের প্রাধান্য আরও প্রকট হয়ে উঠে সাথে লাল, নীলের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে চাকমাদের কাপড়ে এক রঙের আবির্ভাব ঘটে, যেমন– কমলা রং বা বেগুনী বা সোনালী রং এবং শুধুমাত্র ঐ একটিমাত্র রঙেরই সেড তাদের 'থামি'তে লক্ষ্য করা যায়। এসময় রেশমী সূতার প্রচলনটা হয়ে উঠে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বস্ত্রশিল্প, বিশেষ করে চাকমা বস্ত্রশিল্প রাঙ্গামাটি কেন্দ্রীক গড়ে উঠেছে। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনেও এটি গড়ে উঠেছে, তবে তা অনেক পরে গড়ে উঠেছে এবং মূল কেন্দ্র রাঙ্গামাটি। কেন্দ্র বলা হয়েছে এ কারণে যে, অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটিতেই বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাব ঘটে। রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী বস্ত্রশিল্পের বিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমলে জুম থেকে তুলা ও সূতা উৎপন্ন হত বলে সূতা ছিল অত্যন্ত মোটা এবং কাপড়ও মোটা ছিল। বাংলাদেশ সময়ের কিছু আগে থেকে এর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিদেশীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পর্যটকদের আগমনের ফলে তাদের বস্ত্রশিল্পের চাহিদাও বাড়তে থাকে।বাজারের ফলে সহজলভ্য সূতা দিয়ে কাপড় তৈরি হতে থাকে। সূতাও পাতলা হতে থাকে এবং কাপড়ও পাতলা হতে থাকে। রঙের ভ্যারিয়েশন ও উজ্জ্বলতাও বাড়তে থাকে। নতুন নতুন রঙের প্রধান্য দেখা দেয়। অন্যান্য আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের যেমন– বম, ত্রিপুরা, গারো এদের বস্ত্রশিল্পে কালো রঙের প্রাধান্য এখনও প্রকট। কিন্তু চাকমাদের বস্ত্রশিল্পের বিবর্তনটা এতেঠ বেশি যে তাদের বস্ত্রশিল্পে কালো রঙের ব্যবহারটা তুলনামূলক কম দেখা যায়। ২০১০ সালে চাকমারা বাঙালি মেয়েদের জন্য শাড়ির মতো কাপড় তৈরি করা শুরু করে। তবে ডিজাইনটা সেই থামি থেকে নেওয়া বলা যায়। বাঙালিদের কাপড়ে পাড় থাকে একেবারে নিচে। কিন্তু চাকমাদের থামিতে পাড়ের মতো ডিজাইনটা থাকে আট থেকে দশ ইঞ্চি উপরে। তাদের তৈরি করা ঐ শাড়ির মতো কাপড়ে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এ কাপড়গুলি তুলনামূলকভাবে বাঙালিদের বর্তমান কাপড় বা সূতা থেকে একটু মোটা। তাদের বক্ষবন্ধনী বা খাদি বাঙালিরা অনেক আগে থেকেই পরে আসছে, সম্ভবত আশির দশক থেকে। এটা বলা যায় যে, লাল রঙের একটা প্রাধান্য এখনও বর্তমান আছে চাকমাদের বস্ত্রশিল্পে। শুধুমাত্র রেশমী সূতা দিয়ে তৈরি বস্ত্রে এর প্রাধান্য কিছুটা কম। অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাঁশ বেতের পাত্র গুলোতে রঙের ও ডিজাইনের পরিবর্তন ঘটেছে । নব্বই থেকেই এর শুরু বলে মনে করা হয় । অলংকারে গত পনের বছরে ইমিটেশনের ব্যবহার বেড়েছে।

কোনকিছুর ইভালুয়েশনটা আসলে হয়ে থাকে পারস্পারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন, চাপ, পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায়। শিক্ষাগত পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনটাও চলে আসে এবং সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংশিষ্ট বিষয়েও পরিবর্তন হয়। রাঙ্গামাটিতে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য এই সকল বিষয় কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

বমরা প্রচুর কাপড় বুনছে, কিন্তু পরছে না। খুব কমই পরে। বমদের বিষয় সম্পর্কে বলা যায় , বম কারুশিল্পে বস্ত্রের রঙের যে সাম্প্রতিক উজ্জ্বলতা বা বিভিন্ন রঙের সমাবেশ– তা বাণিজ্যিকভাবে বম বস্ত্রশিল্পের চাহিদা ও বিক্রির কারণে করা হয়েছে। এভাবে ঠিক নির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল যে কোন্ দশকে তাদের রং ও ডিজাইনের পরিবর্তন হয়েছে, তবে ১৯৮০-র পর থেকে পরিবর্তনটা ধীরে ধীরে হতে শুরু করে বলে মনে করা হয়। বমদের অন্য জিনিষের চেয়ে পোশাকে পরিবর্তনটা বেশি হয়েছে। তবে বমরা তাদের নৃ-গোষ্ঠীর ভাব বা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। বমসহ এদের বস্ত্রশিল্প পুরু ও ডিজাইনে বুননে আলাদা, চাকমাদের চেয়ে এরা একটু বেশি নৃ-গোষ্ঠীগত ভাব বজায় রেখেছে। মাফলার ও কম্বল বুননে বমরা এখনো শ্রেষ্ঠ। খুমি, লুসাই, ম্রো, খিয়াং, পাংখুয়া এরা এখনো জীবন আচরণে ধরে রেখেছে তাদের বৈশিষ্ট্য। অন্য দিকে বিভিন্ন দিক থেকে মারমারা বেশি আলাদা। তাদের ডিজাইনে, পোশাকে বার্মার প্রভাব বেশি । মারমাদের ছোট ছোট ফুলের নকশা করা কাপড় এখন গারো মহিলারাও পরছে। ম্রো মহিলারা একটু আধটু বাড়িতে ওরকম ফুল লতা পাতা ডিজাইনের কাপড় পরে। ডিজাইনের দিক থেকে মারমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক, তারা ছাপা (Print-এর) কাপড় পরিধান করে। বমদের মধ্যে অলংকার ও অন্যান্য কারুশিল্পে গত ১০ বছর বা এর আরও আগে থেকে রং ও ডিজাইনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রং উজ্জ্বল ও গাঢ় হয়েছে, ডিজাইনে নতুনত্ব এসেছে।

মণিপুরীদের তাঁতের কাপড়ের ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। মণিপুরীরা তাদের শাড়িতে বাঙালি ডিজাইন প্রবেশ করিয়েছে। জামদানী শাড়ির প্রভাবে তাদের কাপড়ে ডিজাইন ও রঙের পরিবর্তন এসেছে তারপরও তারা– হালকা রঙের কাপড় ও ঐহিত্যবাহী অলংকারের জন্য বিখ্যাত। তাদের কাপড়ের রং উজ্জ্বল হয়েছে তবে এখানে একটি কথা হচ্ছে, ইদানীং বাঙালি ও অন্যান্যরাও মণিপুরীদের

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় দেখে একই রকমের কাপড় বোনার চেষ্টা করছে। এ কাপড়গুলির রং উজ্জ্বল ও বুননটা অনেক মিহি এবং পাতলা। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে, মণিপুরীদের কাপড়ে পরিবর্তন আসছে তবে অত বেশি না। মণিপুরী কাপড়ে মন্দিরের মতো যে মোটিফ আমরা পায় তা এসেছে ১৪০০ শতাব্দীতে থাকা মৈরাং নামক এক অঞ্চলের ডিজাইন। এগুলি দেখতে অনেকটা মন্দিরের মতো লাগে– এটি মণিপুরীদের কাপড়ের মূল নক্শা। এছাড়া মণিপুরীদের কাপড়ে অনেক ধরনের ফুল দেখা যায়। জবা ফুল, রজনীগন্ধা ফুল ইত্যাদিও তাদের বস্ত্রে কিছু কিছু দেখা যায়। বিশেষ করে বর্তমানে যে যার মতো বিভিন্ন রকমের ফুল নক্শা হিসাবে ব্যবহার করছে, যা বাণিজ্যিক ও বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী হচ্ছে বলে মনে হয়। মণিপুরীদের রঙের ক্ষেত্রে বাসন্তি রং ও হালকা রং-গুলোই প্রধান। বর্তমানে এখানে মিশ্র কালারের সমন্বয় ঘটেছে। অর্ডিনারী কালারের বদলে অনেক ধরনের রং ব্যবহার হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনগুলি সূচিত হয়েছে ৮০/৯০ দশকে । বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের যে সমস্যা তার মধ্যে প্রধান হলো কাপড় বোনার সূতার দাম খুব বেশি ও সূতার অভাব। আর একটি অন্যতম সমস্যা হলো দক্ষ কারিগরের অভাব। অনেক আগে থেকে মণিপুরীরা তাদের তাঁতশিল্পে কার্যক্রম অত্যন্ত ভালভাবে চালিয়ে আসছিল। তবে বর্তমানে শুধুমাত্র দু'-চার জন দক্ষ কারিগর কমলগঞ্জে কাজ করছেন। বর্তমানে সূতার অভাব ছাড়াও মণিপুরীদের অর্থনৈতিক সমস্যাটাও প্রকট হয়ে উঠছে। এখন সব কিছুই ব্যয় বহুল হয়ে গেছে। সূতা কিনতে হলে নরসিংদী আসতে হয়। আর কিছু কিছু সূতা মৌলবীবাজারে পাওয়া যায় অর্থাৎ সূতা তাঁতশিল্পের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বিশ বছর বা তারও আগে থেকে বর্তমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন বাচ্চাদের শার্ট, প্যান্ট, বেডশীট, বালিশের কাভার, কুশন, রুমাল ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়েছে, বর্তমানে তা চরম পর্যায়ে চলছে। এইসব বিষয়গুলিতে যে ধরনের ডিজাইন দেখা যায় তা অবশ্য আগে ছিল না, আর এ পরিবর্তন সাম্প্রতিককালের পরিবর্তন, যুগের সাথে তাল মিলাতে এটা প্রয়োজন ছিল। এগুলিতে আমরা বাঙালিদের গ্রামীণ চেকের প্রভাব দেখতে পাই। যদিও রং-টা তাদের সেই আধ্যাত্মিক বা সফ্ট রং-ই থেকে গেছে। তাদের বস্ত্রের মূল সূতা ছিল সূতি। বর্তমানে রেশমী সূতার প্রচলনটা বেড়েছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পের মধ্যে উলের কাজগুলো উল্লেখযোগ্য ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে । তাদের কারুশিল্পের মধ্যে অলংকার ছিল অন্যতম। সমৃদ্ধ এই অলংকারে মোটিফে, ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আমরা দেখতে পায় যে, হিন্দু, মুসলিম বা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী মণিপুরী কানের অলংকার, নাকফুল, ইত্যাদি পরিধান করছে। অর্থাৎ তারা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করতে পেরেছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন– নাচের বিষয়ে বাঙালি নৃত্যশিল্পী তামান্না রহমান ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্যরা তাদের নৃত্যের সকল অলংকার ও নৃত্যকলা উপস্থাপন করে বিশেষ খ্যাতী অর্জন করেছেন। মণিপুরীরা বাংলাদেশের একমাত্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যারা বেশি স্বর্ণ ব্যবহার করে। অবশ্য স্বর্ণের দাম বেশি হওয়ায় অলংকার ব্যবহার আগের চেয়ে কমে গেছে।বর্তমানে তারা বস্ত্রশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে বোনা উড়না ব্যবহার করছে। ঐ উড়নার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এটি অত্যন্ত স্বচ্ছ। শরীরের উপরে এটা পরলে ওপাশ স্পষ্ট দেখা যায়। এই কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মুসলিন কাপড়ের একটি প্রভাব লক্ষণীয়। তবে এই কাপড়ের মান খুব একটা ভাল নয়। অলংকার সম্পর্কে বলা যায়– বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী অলংকার খুব একটা নেই এবং এই অলংকার তৈরির কারিগরও কমে গেছে, যেমন– "কান্ধা" নামের মোটা গলার হার মণিপুরীরা আগে পরত। এই অলংকারে আমলকির ফলের বিচির মতো একটা মোটিফ ও ডিজাইন ছিল। আবার "অনন্ত" বালা নামের একটি অলংকার আগে ছিল, যার মোটিফ ছিল "অনন্ত-নাগ বা সাপ" এই সাপের মাথার ডিজাইন ঐ বালার মধ্যে থাকত। কোমরে বিছা ছিল, পায়ের মল ছিল, এগুলো ছিল রূপার তৈরি । এইসব বিষয়গুলি এখন খুব কম দেখা যায় । অলংকার কম-বেশি থাকলেও মোটিফ পরিবর্তন হয়ে গেছে। বস্ত্রশিল্পের যে বাণিজ্যিক পরিবর্তন– তা আশির দশকে এসে জোরেশোরে শুরু হয়। আর নব্বই বা তার পরেও তা গতিশীল রয়েছে। তবে ঐতিহ্যবাহী অলংকার বা বস্ত্রশিল্পের যে সামান্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা বাংলাদেশ হওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমানে যে বাণিজ্যিক পরিবর্তন তা বাঙালিদের দেখা-দেখি ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী হয়েছে।

সাঁওতার প্রসঙ্গ এলে বলতে হয়, এখন সাঁওতালদের গ্রামে শুধুমাত্র ঘরে পরিচ্ছন্নতা ও ডিজাইন লক্ষ্য করা গেলেও তাদের বাঁশের কাজ ও অন্যান্য কারুশিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের পশুশিকারের অস্ত্রগুলোও নেই। সাঁওতালদের কারুশিল্পের মূল পরিবর্তনটা হয় ৭০ / ৮০-এর দশকে, তবে পরিবর্তনটা শুরু হয় ব্রিটিশ আমল থেকে। সাঁওতালদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের মধ্যে বেশ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আগে পুরুষরা লেংটি পরত মেয়েরা বুকে এক খণ্ড কাপড় পেচিয়ে রাখত। নিচের অংশে প্রিন্টের মতো কাপড় পরত। বর্তমানে সাঁওতাল পুরুষরা লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি পরে এবং মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, মেক্সি ইত্যাদি পরে থাকে। কম বয়সী ছেলেরা হাফপ্যান্ট, শার্ট ও মেয়েরা সালোয়ার কামিজ, উড়না পরে। আগে অলংকারের মধ্যে চুড়ি, নাকফুল, মালা, হাসুলী ইত্যাদি দেখা যেত। এছাড়া ছেলে-মেয়েরা এমনকি বড়রাও শরীরে উলকি আঁকতো। এটি তাদের একটি অন্যতম ঐতিহ্য ছিল এগুলো এখন নেই। সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ছোট। তাদের বাড়ি-ঘর তৈরিতে খড়, পাতা, মাটি, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। ইদানীং তারা ঘরের চালে টিনের ব্যবহার করছে। তাদের আসবাবপত্রের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দেখা যেত বাঁশ, কাঠ ও পাটের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য। এছাড়া তারা কোদাল, নিড়ানী, ঝাড়ু, ডালা, কুলাসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার জাল ও ফাঁদ ব্যবহার করতো। বসার জন্যে পিড়ি, টুল ও খড়ের মোড়া ছিল। তাদের ঘরের দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের আল্পনা ও ছবি দেখা যেত। সাঁওতালদের মধ্যে কয়েকটি ভাগ আছে। এর মধ্যে একটি ভাগকে ইদানীং 'মাহলে' বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কারুশিল্পের মধ্যে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা দ্রব্য ছিল অন্যতম। বাঁশ দিয়ে তৈরি উল্লেখযোগ্য কারুশিল্প ছিল ঝুড়ি, কুলা, ধামা এবং বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রয়োজনীয় পাত্র। এখন এগুলি নেই বললেই চলে।

বর্তমানে তাদের সমাজে নানাভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তারা এখন আগের মতো একে অপরের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে না। এর জন্য তাদের সমাজপতিরা ও খ্রীষ্টান মিশনারীরাই দায়ী। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিযোগিতামূলক আচরণ, একচোখা কার্যক্রম সন্তর্পণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পল্লীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। ইদানীং তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক উপাদান ও ধর্মীয় উপাদানের সাথে সাথে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, কারুশিল্প, গান-বাজনা অন্যান্য উৎসবও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।তাদের মধ্যে একটি অংশ ধনী হিসাবে পরিচিত কিন্তু বাকী ৯০% শতাংশই দরিদ্র অংশের মধ্যে পড়ে। মূলত দেখা যায় যে, ধনী অংশটি তাদের সমাজের মধ্যে সংহতিবোধটা নষ্ট করে দিয়েছে। বর্তমানে তাদের সমাজে ঐক্যের খুব অভাব। আগে সাঁওতালদের চিরায়ত সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় উৎসব বিষয়ক যে সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত সে সব আজ ক্রমেই বিলুপ্তির পথে। সাঁওতালরা খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ধর্ম যাজকরা তাদেরকে স্ব-গোত্রীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দিয়ে থাকেন। তাদের সমাজে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি হওয়ায় ও তারা ধর্মান্তরিত হওয়ায় তাদের ধর্মীয় যে সব উৎসব ছিল, তাদের জীবনে যে সব সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে । যেহেতু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ধর্মীয় উৎসবই তাদের জীবনধারণ, সংস্কৃতি, শিল্প ও জীবন পদ্ধতির মূল ধারক বাহক, সে কারণে ধর্মের পরিবর্তনের ফলে তাদের সভ্যতার ঐতিহ্য, খাদ্য অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, কারুশিল্প সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটবে।

গারো কারুশিল্পের মধ্যে আমরা সাধারণত যে সব মোটিফ দেখতে পায়, সেগুলি হলো ফুল, ময়ূর এবং ময়ূরের ছোট নক্শা। গারো কারুশিল্পের পরিবর্তন এসেছে ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমল থেকে। বর্তমানে গারো কারুশিল্পের রং, ডিজাইন, ধরনে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার শুরু ৯০ দশকের পর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ২০১০ সময়কালের মধ্যে। তবে তা চাকমাদের মতো এতো ব্যাপক নয়। ১৫ বছর বা তারও আগে তাদের কাপড়ের মূল রং ছিল গাঢ়, যেমন– নীল, সবুজ, খয়েরী ইত্যাদি। বর্তমানে এগুলির পরিবর্তে হলুদ, লাল, সবুজ, খয়েরী বিশেষ করে বেগুনী রং বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং রংগুলির সবগুলিই উজ্জ্বল। গারোরা এখন বাঙালিদের জন্য জামা কাপড় ব্যাগ, পার্স তৈরি করছে। ঘরে তারা ফাইল, টেবিল লাইট ইত্যাদি তৈরি করছে । অর্থাৎ তাদের অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবে কারুশিল্পে বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নি, কিন্তু তাদের কারুদ্রব্য, ফাইল, কলমদানী, ট্রে ইত্যাদি বর্তমানের কাজগুলি সমাদৃত হয়েছে।

চাকমারা বেশি শিক্ষিত কিন্তু তুলনামূলক এরাই সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন। চাকমারা বাঙালিদের মতো বাঙালি পোশাক পরছে। এরা নিজেদের বোনা কাপড় পরে, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তারা শাড়ি বানাচ্ছে, ছোটদের কাপড় ফতুয়া, শার্ট ইত্যাদি বানাচ্ছো । এদের কাপড়ে Change ও Variation সবচেয়ে বেশি । চাকমাদের বস্ত্রে বিশেষ করে জ্যামিতিক ডিজাইনগুলোর বর্তমান প্রচলন ও বাণিজ্যিকভাবে কাপড় বুনন শুরু হয় মঞ্জুলিকা খিসা নামের একজন চাকমা নারীর হাত ধরে। তার প্রতিষ্ঠানের নাম Bain Textile। ডিজাইন ও রং বিষয়ে এই পরিবর্তনের একজন পুরোধা হিসাবে তিনি পরিচিত। ষাটের দশকে মঞ্জুলিকা খিসার মা পঞ্চলতা খিসা প্রথম রেশমী সূতা দিয়ে কাপড় বোনেন। যদিও তা নব্বইয়ের দশকে এসে তার মেয়ের হাত ধরেই ব্যাপক পরিচিতি পায়। চকমাদের কাপড়ের সাথে ত্রিপুরাদের কাপড়ের পার্থক্য হল, ত্রিপুরাদের কাপড়ে তেমন বেশি পরিবর্তন আসে নি। এমনকি তাদের কাপড়ে রং ডিজাইনের পরিবর্তনও কম চোখে পড়ে । তাদের কাপড়ে সেই পুরনো কালো, সবুজ, নীল রঙের প্রধান্য এখনও রয়েছে। তাদের খাদিতে ডিজাইন খুবই কম। কাপড়ে শুধুমাত্র দুই পাড়ে ডিজাইন দেখা যায়, একটু হলুদ লাইনও আছে। সেখানে রঙের খুব একটা ভিন্নতা নেই অথচ চাকমাদের খাদিতে পুরাটাই ডিজাইন এবং আলাদা করে পাড়ও আছে। ত্রিপুরাদের খাদি অত্যন্ত সিম্পল। ত্রিপুরাদের মধ্যে অবশ্য প্রধান দুই(উসুই ,রিয়াং)গোষ্ঠীর ত্রিপুরা আছে, যাদের এক গোষ্ঠীর কাপড়ের ডিজাইন ও অন্য গোষ্ঠীর ডিজাইন আলাদা। চাকমাদের মতো ত্রিপুরাদের কাপড়ে লালের ব্যবহার এতেঠ বেশি দেখা যায় না। বর্তমানেও ত্রিপুরারা বস্ত্রশিল্পের বাণিজ্যিকীকরণে বেশি অগ্রগামী হতে পারে নি। তবে বৈচিত্র্য হচ্ছে, চাকমারা এক রকমের কাপড় বোনে কিন্তু ত্রিপুরারা ৩৭টি গোষ্ঠী এবং ৩৭ রকমের কাপড় বোনে । ত্রিপুরাদের মূলত যে পরিবর্তন এসেছে তা হল, মাল্টি কালারের অবস্থান। অর্থাৎ বর্তমানে সাদা,

Dhaka University Institutional Repository

লাল, কালো ও সবুজের পরবর্তে অন্যান্য রং-ও ত্রিপুরা কাপড়ে দেখা যাচ্ছে। এই পরবর্তনগুলি এসেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ত্রিপুরা ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার কারণে এবং চাকমা ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর প্রভাবও এখানে রয়েছে। ত্রিপুরাদের অলংকারে ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। তাদের রাজ্য ছিল, রাজা ছিল সেই কারণে তাদের অলংকারের বিরাট একটা ঐতিহ্য ছিল। ঐ সময়ে রাজা বাদশার আশেপাশে যারা থাকতেন তারা রাজাকে অনুসরণ করতেন, সেই কারণে তারা স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত অলংকার পরিধান করতে চেষ্টা করতেন। এবং যারা অনেক দূরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন তারা সাধারণত রূপার অলংকারই ব্যবহার করতেন। এই ভিন্নতার অন্যতম কারণ ছিল যে, সবাই স্বচ্ছল ছিল না এবং বর্তমানেও ঐ একই কারণে তাদের এই ঐতিহ্যবাহী অলংকার শিল্প বিলুপ্তির পথে। ত্রিপুরাদের অলংকারে একটা পরিবর্তন এসেছে, যেমন বর্তমানে ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা যারা শহরে থাকে তারা ইমিটেশনের অলংকার পওে, সোনার গহণাও পরতে দেখা যায়। এই গহণাগুলো বাঙালিদের ডিজাইনের গহণা। আর তুলনামূলকভাবে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী গহণাগুলো গ্রামেই বেশি পরা হয়, অবশ্য চাকমাদের অলংকার আর ত্রিপুরাদের অলংকারে কিছু কিছু মিল আছে। শহরে বাঙালি ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর প্রভাবে ত্রিপুরা ঐতিহ্যের পরিবর্তনটা বেশি চোখে পড়ে। তারা কাপড় বোনা বলা যায় ছেড়ে দিয়েছে। চাকমাদের কাছ থেকে খাদি কিনে নিয়ে পরে অথবা চাকমাদের কাছ থেকে কাপড় বুনে নিয়ে পরে।

চাকমা আর গারোদের মধ্যে পার্থক্য হলো গারোরাও চাকমাদের অনেক জিনিস ব্যবহার করে। কিন্তু চাকমারা তাদের বোনা কাপড়ই পরে থাকে। গারোরা ইন্ডিয়া থেকে কিছু কাপড় নিয়ে আসে। বর্তমানে গারোদের কোমর তাঁত নেই বললেই চলে। কিন্তু চাকমাদের মধ্যে এখনও কোমর তাঁতের প্রচলন অত্যধিক। ত্রিপুরাদের কাপড়ে আমরা তেমন কোনো বিশেষ মোটিফ খুঁজে পায় না। শুধুমাত্র ২০১০-১১তে তৈরি কাপড়ের রঙে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ঐ কাপড়গুলিও চাকমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৈরি করা হতে পারে। চাকমাদের কাপড়ের মধ্যে আমরা অনেক ধরনের ফুল দেখতে পায়। আবার চাকমারা যে ব্লাউজ পরে সাধারণত এক রঙের হয়ে থাকে। তবে ত্রিপুরা, গারো, খুমি, বম এরা সাধারণত ছাপার মতো কাপড় পরে থাকে,আবার এক রঙের কাপড়ও পরে।

পূর্বে ত্রিপুরা ছেলে মেয়েরা মাথায় পাগড়ী পরত এবং মেয়েরা দেহের উপরের অংশে ব্লাউজ ও খাদি পরত। তাদের বস্ত্রশিল্প ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। অনেক আগে এই পোশাকগুলি ছিল বেশির ভাগই সাদা। বর্তমাানে তাদের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই, তার শুরু

Dhaka University Institutional Repository

অনেক আগে থেকে হলেও বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে তা প্রকট আকার ধারণ করে। বর্তমানে চাকমারা ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যগত সকল জায়গা দখল করে নিয়েছে।

বর্তমানে ত্রিপুরারা যে কোনো পোশাক পরিধান করছে, যে কোনো অলংকারই পরিধান করছে। তাদের অলংকারের ঐতিহ্য কিছুটা থাকলেও অধিকাংশই নেই। বিশেষ করে রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরাদেরকে দেখা যায় বাঙালি ও চাকমাদেরকে অনুসরণ করতে। কি পোশাক কি অন্যান্য দ্রব্য, সবখানেই তারা তাদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। ত্রিপুরারা না বাঙালি না আদিবাসী বা বৌদ্ধ এ রকম ধারায় পড়ে দ্রুত বদলে গেছে । বাঙালি কালচারে আকৃষ্ট হয়েছে, হচ্ছে ধর্মান্তর। তবে বর্তমানে বান্দরবনে যেসব ত্রিপুরা বসবাস করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা যেমনি সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে, তেমনি ঐতিহ্যের দিকেও যতেষ্ঠ সচেতন হচ্ছে। ত্রিপুরারা নৃত্য, বস্ত্রশিল্প, বাদ্যযন্ত্র ও অলংকার শিল্পে সমৃদ্ধ, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জগতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আসলে পৃথিবীতে ১৯ শতকের মধ্যভাগে যে শিল্পায়ন শুরু হয় তা হাতের এইসব কারুশিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাড়িয়েছিল। তবে বাংলাদেশে এ পরিবর্তনটা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় কিন্তু মূল পরিবর্তনটা হয় সত্তর ও আশির দশকে।

শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নয় বাঙালিদের তাঁতের কেন্দ্র নরসিংদী, কুষ্টিয়া, আড়াইহাজার ইত্যাদি জায়গাতেও সূতার দামের কারণে তাঁতশিল্প বন্ধ হতে চলেছে, সূতার দাম বেড়েছে প্রায় তিনগুণ । যে তাঁত-কলের দিকে তাকালে বুকটা জুড়িয়ে যেত আজ সে তাঁত-কলের দিকে তাকিয়ে বাঙালি তাঁতীদের কাঁদতে হচ্ছে। শিগগিরই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তাঁতীদের মধ্যে মানবিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কিম্বা বাঙালি কারো কারুশিল্পের অবস্থা বর্তমানে ভাল না।

সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপরে আলোচনার ফলাফল হিসেবে আবারো লিখতে পারি : ত্রিপুরারা অধিকাংশই খ্রীষ্টান হওয়ার ফলে তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও উৎসব হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে তাদের কারুশিল্প, অলংকার, বাঁশি, আসবাবপত্র ও বস্ত্রশিল্পের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। যা আছে তাতে আধুনিক কালের রং, নকশা, ও মোটিফের চলন এসেছে। তাদের কারুশিল্পের তৈরিগত উপাদানেও পরিবর্তন এসেছে।

গারোদের ঘর, পোশাক বিশেষ করে তাদের সংস্কৃতি, জীবনের উৎসবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাদের এই পরিবর্তনটা এসেছে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে বিবাহ থেকে শুরু করে 'ওয়ানগালা' পর্যন্ত সকল উৎসবে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেক উৎসবও। বর্তমানে নামে মাত্র বৎসরে দু'-একটি উৎসব হয়ে থাকে তাও আবার গির্জা কেন্দ্রিক উৎসব, যার সাথে মূল গারো উৎসবের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারুশিল্পে তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, গহনা, কাপড় কোনো কিছুই এখন নেই বললেই চলে। সবকিছুতেই তারা খ্রীষ্টান বা বাঙালি বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত। পেশায় এসেছে আমূল পরিবর্তন ও ভিন্নতা। কাপড় আসবাবপত্র, গহণা সবখানেই তারা রং, ফর্মে মোটিফে প্রচলিত আধুনিকতা গ্রহণ করছে।

বমরা মনের দিক থেকে এখনো আনেকটা আগের মতো থাকলেও আধুনিক খ্রীষ্টান হওয়ার দৌড়ে তারা এখন দারুন প্রতিযোগী। হ্যাট পরে ঘুরাটা তাদের কাছে এখন অন্যতম পছন্দেরে বিষয়। কারুশিল্পের বাণিজ্যিকীকরণে তারা অনেক এগিয়েছে। তবে, এখনও বস্ত্রশিল্পের ফর্ম, রং রেখা ও বুননে নিজেদের পরিচয় কিছুটা হলেও রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ঘরে এখন দু'-একটি ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অন্য আদিবাসীদের থেকে তাদের নিজস্বতা এখনো চোখে পড়ে।

সাঁওতালদের তীর ধনুক ও ছনের পিঁড়ি এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। জমকালো উৎসবও আর নেই। জাতিয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য তাদের মধ্যে লোকের অভাব। তারা প্রায় শতভাগ খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। তাদের উৎসব গির্জায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরে এখন আর তেমন উল্কি আঁকা দেখা যায় না। শিক্ষা ও পোশাকে তারা আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে এখনও ঘরের পরিচ্ছন্নতা ও রঙিন নকশার আঁচড় দেখতে পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিভেদ আর দ্বন্দ্ব নিয়ে তারা এগিয়ে চলছে।

মণিপুরীরা অলংকার আর বস্ত্রের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। তবে বস্ত্রে তাদের আধ্যাত্মিক রং, ভাবনা, ধর্মীয় মোটিফ এখন অক্ষুণ্ন রেখেছে। বাংলাদেশের সকল আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে তারা সাংস্কৃতিক জীবনে শিক্ষিত ও ঋদ্ধতা অর্জন করেছে এবং তারা থেকে তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্যকে এখনো ধরে রেখেছে। আধুনিকতা, অর্থনৈতিক দীনতা ও পারিপার্শ্বিক চাপের সাথে তারা কখনও কখনও মিশে গেছে আবার কখনও কখনও নিজেদের মতো করে চলতে শিখেছে।

চাকমারা চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের হটিয়ে প্রধান শিক্ষিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সরকারি বেসরকারি সকল সুবিধাই তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি পোশাকে সজ্জিত হয়েও নিজেদের বস্ত্রশিল্পের বিশাল বাণিজ্যিকীকরণে, নতুন নকশায়, বিচিত্র রঙে, মোটিফের আধুনিকত্বে এগিয়ে গেছে। ঘর অলংকার, বাঁশের আসবাবপত্রসহ, অনেক ঐতিহ্য তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। তবে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সচেতনতাকে আঁকড়ে ধরে কারুশিল্পকে কমবেশী এখনও তারা লালন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। অর্থাৎ–

১. শিক্ষাগ্রহণ, বাস্তবতা, আধুনিকতা, সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ, আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে।

২. ধর্মান্তরিতকরণ আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক জীবন ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয় (সাঁওতাল, গারো, বম ও ত্রিপুরাদের প্রায় ৯৫ ভাগ বা তারও বেশি অংশ খ্রীষ্টান হয়ে গেছে)।

৩. বর্তমান কারুশিল্পের ডিজাইন, ফর্ম, মোটিফ, উপাদান ও রঙের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনীতি একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

৪.এখনো ঐতিহ্যের অনেক অংশই ধরে রাখা সম্ভব। তার জন্য দরকার অর্থের জোগান, প্রসারিত বাজার ব্যবস্থা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর, প্রয়োজন সহজ শর্তে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও সহজ যোগাযোগ মাধ্যম। বস্ত্রশিল্পে বাঙালিদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ন-ৃগোষ্ঠীদের মিশ্রণ-লেনদেন হচ্ছে, তাকে আরও উৎসাহিত করতে হবে গঠনমূলকভাবে। উদ্যোগ নিলে ঐতিহ্য টিকে থাকবে এবং নতুন নতুন নক্শারও উদ্ভাবন ঘটবে। ঐতিহ্যকে বাঁচানোর দরকার, আবার উন্নয়ন ও গতিশীলতাও দরকার। তার জন্য প্রয়োজন যোগাযোগ, সহযোগিতা, জানা-শোনা ও একে অপরকে বোঝা। আর এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে কারুশিল্প আরও সমৃদ্ধ, শক্তিশালীও বর্ণিল হয়ে উঠবে।

৫. আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অধিকাংশ লোকজন বর্তমানের বিভিন্ন পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে।

৬. বাঙালি ও আদিবাসীদের বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মধ্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিক যোগাযোগ, কারুশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. কম মূল্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দেশী তাঁত সূতা প্রদানের উপায় বের করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

৮ .রফতানি বাজার সৃষ্টি করতে হবে ।

৯ . দেশী তুলা থেকে সূতা উৎপাদন করার চেষ্টা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০.বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প হাতে নেওয়া এবং বনায়ন ধরে রেখে ভবিষ্যতে জলবায়ু বিপর্যয়কে রোধ করার চেষ্টা করা।

১১.বাংলাদেশ সরকারের ২০১০ সালের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন কারুশিল্প রক্ষায় যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১২.নৃ-গোষ্ঠীদের অন্যজাতি গোষ্ঠীর প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস, অন্যদের সাথে মিশতে না চাওয়ার প্রবণতাও তাদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

১৩. নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবও তাদের ঐতিহ্য হারানোতে ভূমিকা রেখেছে।

১৪. প্রাকৃতিক ভারসাম্য হরণ ও বনায়ন ধ্বংসকরণ আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবন ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এবং বর্তমানেও ভূমিকা রাখছে।

সবশেষে বলা যায়, আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পে অতীতে অনেক নান্দনিক উপস্থিতি ছিল, বর্তমানে তার মধ্যে অনেক-কিছুই এখন আর নেই। আবার কিছু জিনিস পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে নতুন রঙে, মোটিফে ও ডিজাইনে এবং নতুন কিছু কারুশিল্পের উদ্ভবও হয়েছে। এখনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্পের যা কিছু আছে তা অনন্য, এগুলি সংরক্ষণ করা দরকার এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক কারুশিল্পের বৈচিত্র্যকে ধারণ এবং তা বিশ্বের দরবারে আরও বিকাশ করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রমালা

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী, উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ছবি

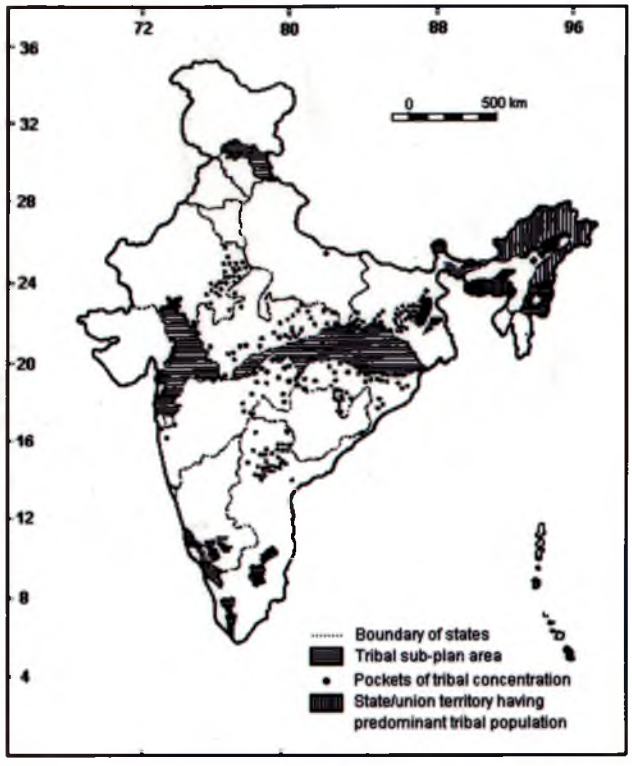

উপরের ছবিতে সারাবিশ্বের উপজাতি এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য এশিয়ার উপজাতি ও তাদের পরিহিত অলংকারে ডিজাইন ও মোটিফ

মধ্য এশিয়ার উপজাতি কাপড়ের বিভিন্ন মোটিফ ও ডিজাইন দেখা যাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকার একজন উপজাতিকে দেখতে পাই।

ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের এস্কিমোরা

Dhaka University Institutional Repository

এ ছবিতে আমরা অস্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসী, আদিবাসী মানুষ দেখতে পাচ্ছি। এদের সারা দেহে রং করা। এরা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এখানে অ্যামেরিকার একজন আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানকে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তিনজন আদিবাসীকে দেখতে পাচ্ছি। একজন অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ছবি আঁকছেন।

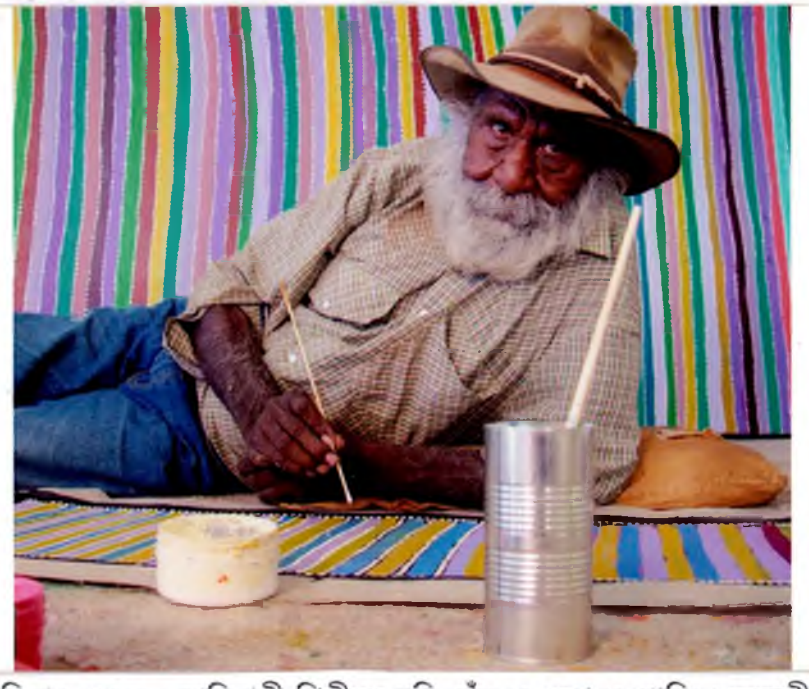

অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী শিল্পীকে ছবি আঁকতে দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্যণীয় যে হ্যাট পরা হলেও তার চেহারা ও আঁকা ছবি দেখে তাকে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত সহজ। এখানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাথে অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের পার্থক্যটা সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উটপাখি, ক্যাঙ্গারু, কচ্ছপ, মাছ, কাঁকড়া ও কুমির দেখতে পাই।

আদিবাসীদের আঁকা চিত্রের বিষয়বস্তু, ফর্ম, গঠন, রং, ডিজাইন, প্রতীক সবই আলাদা

Dhaka University Institutional Repository

একটি নৌকার উপর দু'জন আদিবাসী নারী মাছসহ একটি পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এটি চমৎকার ছবি।

বাংলাদেশের চাকমাদের আঁকা ছবি

Dhaka University Institutional Repository

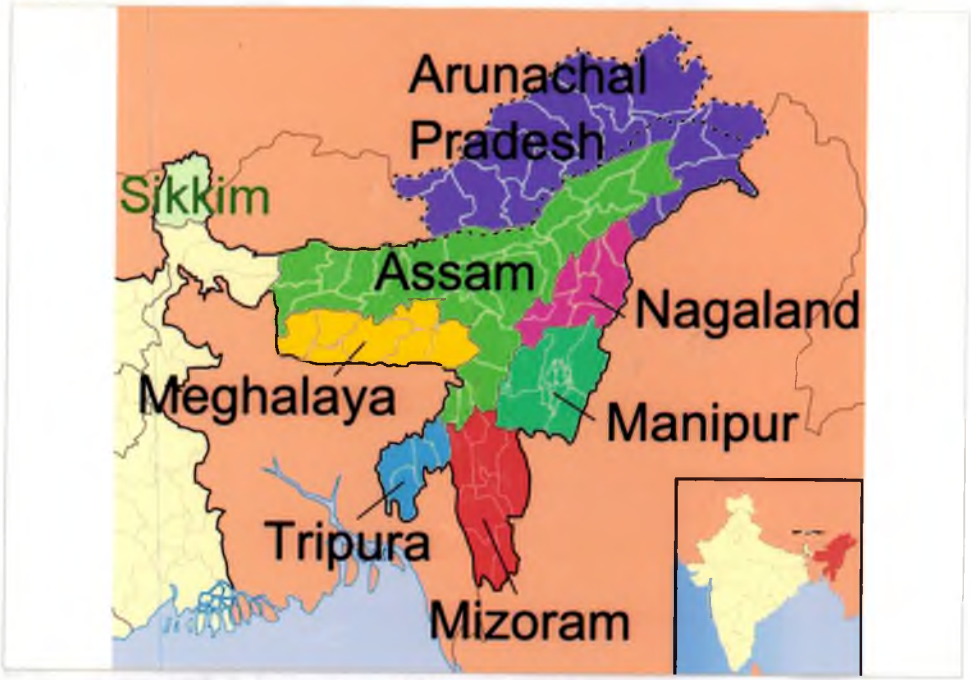

ভারতে বসবাসরত কয়েকটি উপজাতি এলাকা।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত ত্রিপুরা নারী। গলায় হার ও নাকে রিং দেখা যায়।

ত্রিপুরা তাঁত।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকার পরিহিত ত্রিপুরা মেয়েরা।

: দুই ত্রিপুরা মেয়ে। কানে দুল, গলায় মালা, মাথায় টিকলি।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা নারী-পুরুষের নৃত্যরত ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা পুঁথির মালা ও হাতের বালা।

সুন্দর একটি গহনা। এর সূক্ষ্মকারুকাজ ত্রিপুরাদের অলংকারের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুঁথির মালা।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরাদের প্যাঁচানো চূড়ি।

: ত্রিপুরা কানফুল।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা বাদ্যযন্ত্র।

ত্রিপুরা মাথালী (টুপি)।

Dhaka University Institutional Repository

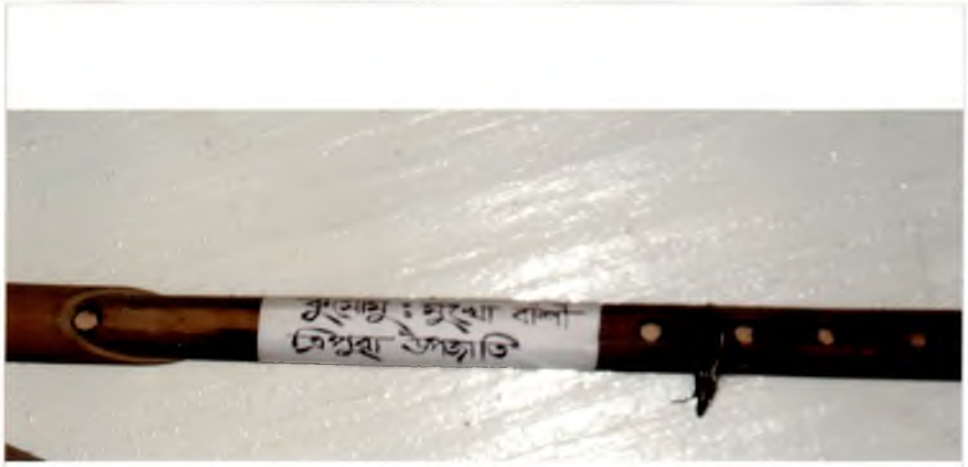

ত্রিপুরা বাঁশি,

ত্রিপুরা বর্তমান কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

দুইজন আধুনিক ত্রিপুরা মেয়ে ও তাদের পোশাক।

ত্রিপুরাদের কাপড়ের ডিজাইন। এখানে বড় ফুলের মতো মোটিফ দেখা যায়।
মঞ্জুলিকা খিসা ও নিয়াজ জামানের STRONG BACKS MAGIC FINGERS বই থেকে নেওয়া ছবি

ত্রিপুরাদের তৈরি আধুনিক পোশাক (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১)

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরাদের তৈরি আধুনিক পোশাক।

Dhaka University Institutional Repository

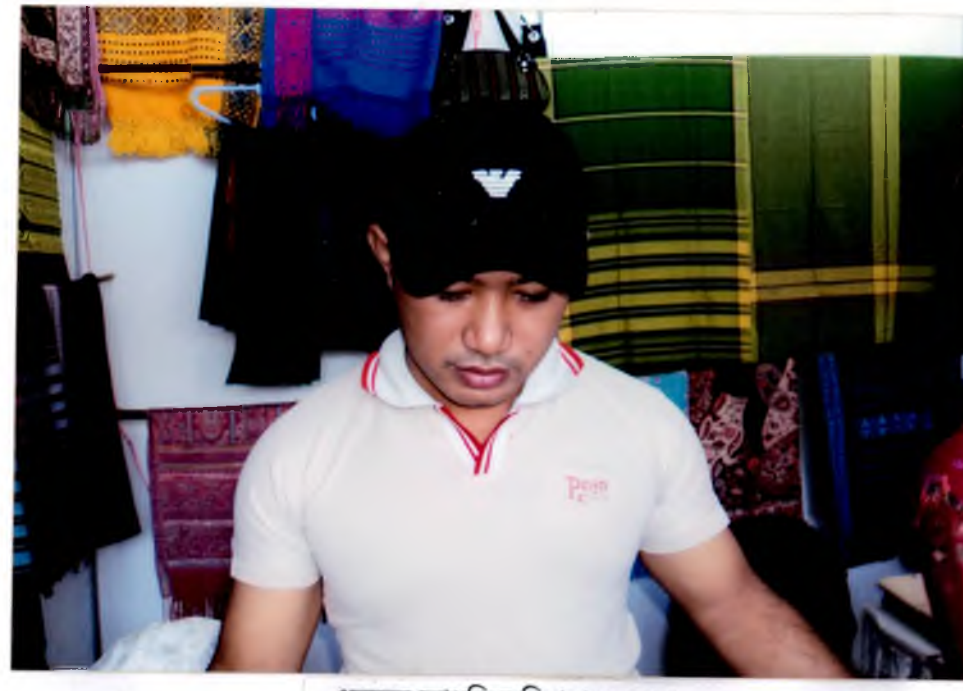

একজন আধুনিক ত্রিপুরা যুবক।

ত্রিপুরাদের তৈরি আধুনিক পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক পোশাকের ডিজাইনে ফুল-লতা-পাতা দেখা যায়।

ফিল্ডওয়ার্ক আলাপচারীতায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন, কালিঘাটা, বান্দরবন।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা, ত্রিপুরা মেয়েরা বর্তমানে প্লাস্টিকের চূড়ি পরে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

কালিঘাটা, বান্দরবানের শিক্ষক সত্যপাঞ্জি ত্রিপুরার ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

মণিপুরী শাড়ি পরিহিত নারী।

মণিপুরীদের তাঁত।

Dhaka University Institutional Repository

মণিপুরী কাপড় পরিহিত দুইজন মণিপুরী নারী। (মঞ্জুলিকা খিসা ও নিয়াজ জামানের STRONG BACKS MAGIC FINGERS বই থেকে নেওয়া ছবি)

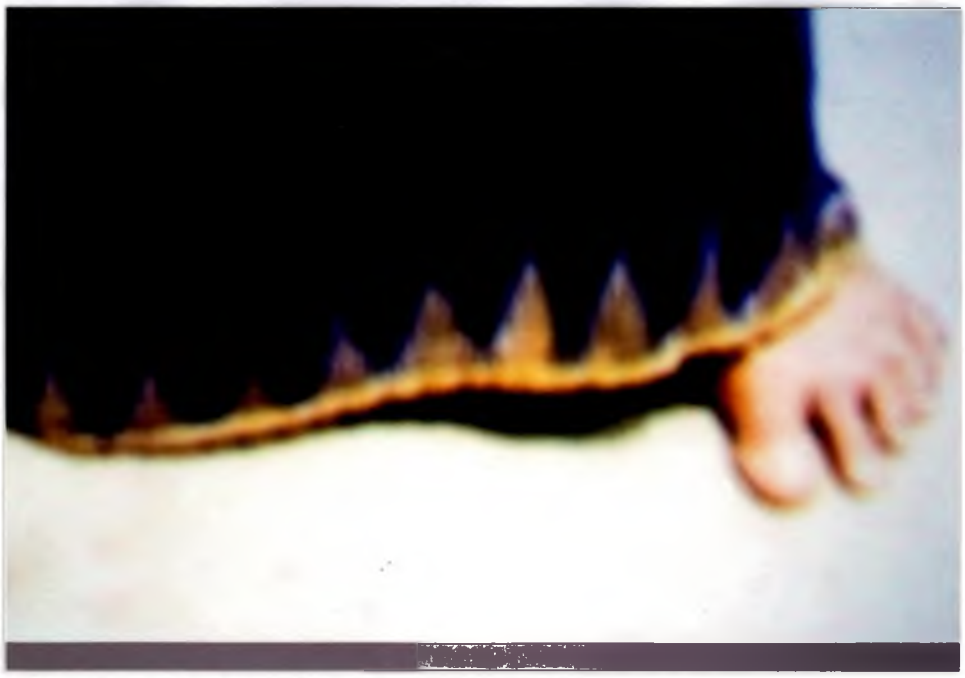

মণিপুরী কাপড়ের দু'ধরনের ডিজাইন বড় করে দেখানো হয়েছে।
মঞ্জুলিকা খিসা ও নিয়াজ জামানের STRONG BACKS MAGIC FINGERS বই থেকে নেওয়া ছবি

Dhaka University Institutional Repository

গলায়, কানে ও হাতে মণিপুরী মেয়েরা ভারি গহনা পরে। এখানে পান পাতা মোটিফ দেখা যায় । সোনার গহনা পরার জন্য মণিপুরীরা আলাদাভাবে খ্যাত।

মণিপুরী কাপড়ের ডিজাইনকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

মঞ্জুলিকা খিসা ও নিয়াজ জামানের STRONG BACKS MAGIC FINGERS বই থেকে নেওয়া ছবি

Dhaka University Institutional Repository

মণিপুরীদের রাসনৃত্যের পোশাক "চূড়া"।

(মণিপুরী মিউজিয়াম, সুবিদ বাজার, সিলেট থেকে তোলা ছবি, ২০১০।)

ছাতা সাদৃশ্য "পে", যুদ্ধ জয়ের উত্তরীয়, পুরানো কয়েন ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

একধরনের কাপড় "আসনের" ছবি । ডানদিকে পূজারী ও পূজারিণী।

পুরুষ ও নারীর পোশাক । মাঝখানে বিভিন্ন রকমের পাত্র ও দ্রব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাল ও তলোয়ারের ছবি।

তীর ধনুকের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের পাত্র দেখতে পাই।

পোলো খেলার দ্রব্যসহ অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্য।

Dhaka University Institutional Repository

একটি জামদানী শাড়ির একাংশ। বর্তমানে মণিপুরীরা এর ডিজাইন দ্বারা প্রভাবিত।

মণিপুরী বর্তমান কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

৬ টা শাড়ি। এখানে ডিজাইনে নতুনত্বও এসেছে। বর্তমানে এখানে লতাপাতা ও ফুলের ব্যবহার দেখা যায়, এটা বাঙালি প্রভাবে প্রভাবিত কাপড়।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন আধুনিক মণিপুরী ছেলে ও তাদের স্টল দেখা যাচ্ছে। পেছনে অনেকগুলো শাড়ি দেখা যায়, শাড়িগুলোতে মণিপুরী ডিজাইন ও আধুনিক লতাপতার মোটিফের বহিঃপ্রকাশ আছে। ২০০৯ সালের বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে তোলা ছবি।

তাদের শাফলাগুলো বুনন, গঠন শৈলী এবং রঙের জন্য বিখ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

মণিপুরীদের ছোট ব্যাগ, কারুশিল্প মেলা থেকে নেওয়া ছবি, শিল্পকলা একাডেমী-২০১০ ই.।

এখানে ছোট ব্যাগ, পার্স, টুপি ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

চাদরের ডিজাইন, প্রত্যেকটা স্টেজ-এ ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়, চারটি ভাগে চারটি আলাদা গঠন প্রণালী দেখতে পাই।

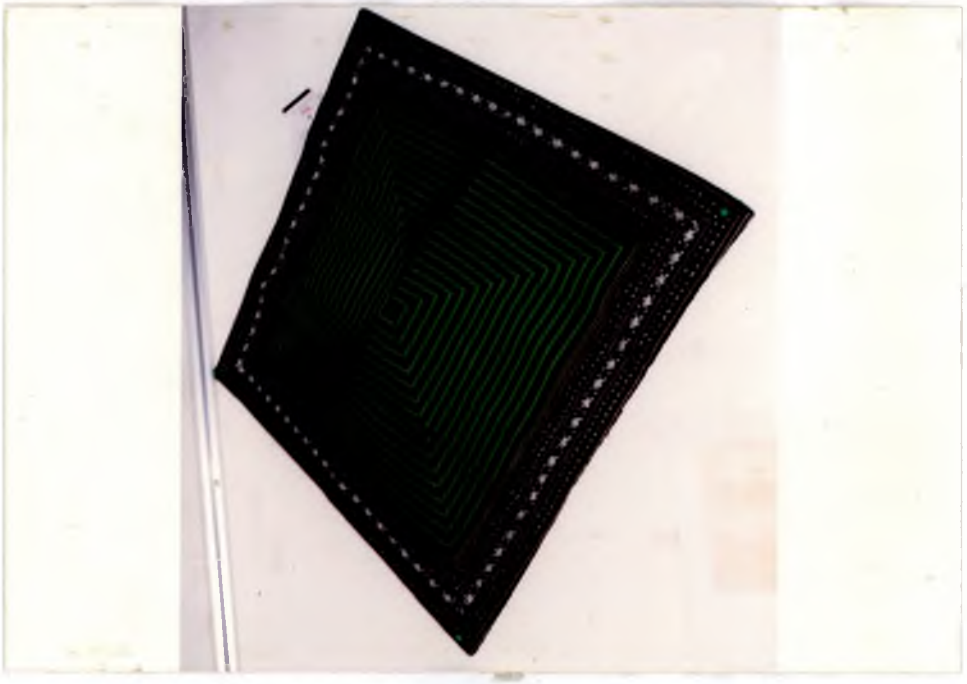

এখানে কুশনের ছবি দেখা যাচ্ছে। এগুলো সাম্প্রতিক কালে তৈরি করা হচ্ছে। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। ২০১০ কারুশিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে তোলা ছবি ।

Dhaka University Institutional Repository

বেডশিট ও উপরের কাপড়গুলোতে ডিজাইনের নতুনত্ব লক্ষ্য করি।

এখানে নতুন ধরনের ফতুয়া দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মিস্টিক একটি ডিজাইন এখানে দেখা যায়। জাপানি ছাপচিত্রের মতো বড় ক্যানভাসে ফিগার অনেক কম। একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার এখানে দেখা যায়। কাপড়ে সোনালী রঙের প্রাধান্য আছে।

Dhaka University Institutional Repository

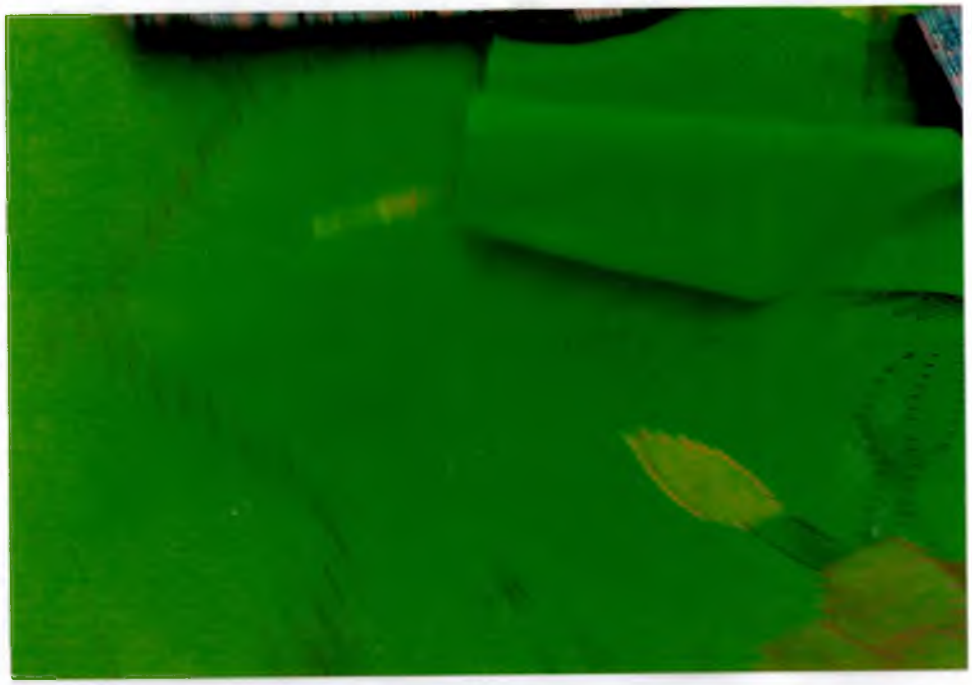

এখানে সবুজ রঙেরযে কাপড় দেখা যাচ্ছে এটা আপনি মণিপুরীদের ছাড়া অন্য কোথাও পাবেন না। এবং কাপড়ের মধ্যে যে হালকা ডিজাইনের ভঙ্গি অন্যদের মধ্যে নেই।

এস. বিনা দেবী, শিবগঞ্জ মণিপুরীপাড়া, সিলেট। সভানেত্রী মণিপুরী মহিলা সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পায়ের খারু।

কাঠ দিয়ে তৈরি চাকমাদের লাটিম দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

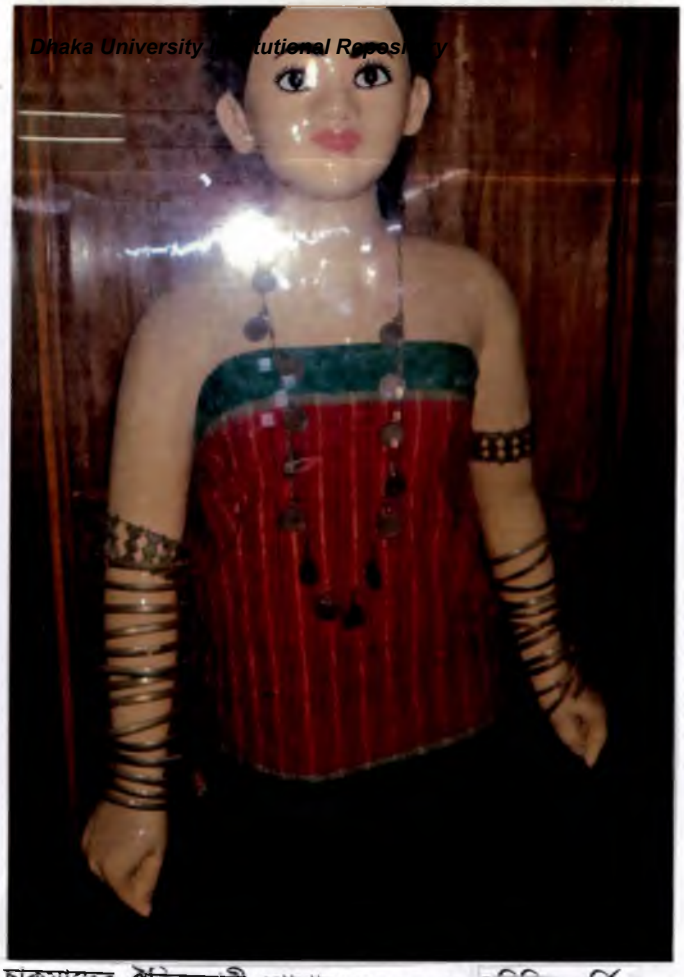

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলঙ্কার পরিহিত মূর্তি।
বান্দরবনের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট থেকে তোলা ছবি

চাকমাদের বালা, পয়সার মালা দেখা যায়,এখানে পুঁথিও ব্যবহার করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা প্যাঁচানো চূড়ির চমৎকার ডিজাইন ও মোটিফ।

তাদের ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কার পরিহিত একজন নারী

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে নেওয়া ছবি। একজন মহিলা চাকমাদের খাদি কাপড় বুনছে। এই কালারটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে দেখা গেছে লাল, নীল, হলুদ এর ব্যবহার বেশি।

চাকমা ও লুসাইদের জামা (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১)

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের কিছু ঐতিহ্যবাহী ঝুড়ির ছবি (জাফর আহমেদ হানাফীর বই থেকে নেওয়া)

চাকমা ফসল তোলার একটি পাত্র দেখতে পাই। এই পাত্রের বুনন শৈলী, ফর্ম ও ডিজাইন আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে নেওয়া ছবি। লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি চাকমা পানি পাত্র ও ছোট ছোট ঝুড়ি দেখতে পাই, যাতে তারা প্রসাধনী বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখে।

প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি হুক্কা দেখা যাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

বাঁশ দ্বারা তৈরি চমৎকার একটি টুপি দেখতে পাই (২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে নেওয়া ছবি)।

সম্প্রতি চাকমারা বাঙ্গালীদের দেখা-দেখি প্লাস্টিকের বেতি দিয়ে ব্যাগ বুনছে। ব্যাগগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই ছবিতে ঐ পরিবারে ঘরের বাইরের দিকটা দেখা যাচ্ছে, চাটাই দিয়ে তৈরি বেড়া ও ঘরের চালটা হলো টিনের। কাঠের ২$^{১}/_{২}$ হাত সিঁড়ি বেয়ে ঘরে উঠতে হয়। তবে ঘরের সব দ্রব্যই আধুনিক শুধুমাত্র হুক্কা ও ছোট দু-একটি পাত্র ছাড়া।

আধুনিক বিছানার চাদর।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ বনরূপা রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত পলিনা চাকমার বাড়ি। বাড়ির সকল আসবাবপত্র অত্যন্ত আধুনিক এবং বাজার থেকে কেনা বলে মনে হয়।

আধুনিক ওয়ারড্রব

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা কাপড়ের বর্ণিল রং ও আধুনিক ডিজাইন।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের চাদর, চাদরে তারা মোটিফ দেখতে পাই (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১)

২০১০ সালের চাকমাদের তৈরি নতুন ধরনের কাপড় যেটা বাঙ্গালী সালোয়ার কামিজের মতো ডিজাইনে তৈরি করা, তবে কাপডটা চাকমাদের।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে নেওয়া ছবি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু মেলায় আগত আমার ছাত্রী সীমা চাকমার স্টল দেখা যায়। এখানে লক্ষণীয় যে, তাদের পরিহিত সেলোয়ার কামিজ ও তার ডিজাইন বাঙ্গালী ধরনের কিন্তু কাপড়টা চাকমা অর্থাৎ এটাই বর্তমানে চাকমাদের নতুনত্ব। (সামনে গবেষককে দেখা যাচ্ছে)

চাকমাদের কাপড়ে তৈরি পাঞ্জাবি

Dhaka University Institutional Repository

বা দিক থেকে সম্প্রতিকালে রং ডিজাইন ও গঠনে চাকমা পোশাকের পরিবর্তনটা দেখতে পাই। ডিজাইনের সরলীকরণ, জরির ব্যবহার ও এক রঙের কাপড় দেখা যায়। ডান দিকে আগেকার তৈরি করা চাকমা ডিজাইনের কাপড় দেখি।

চাকমাদের তৈরি বাঙালী শাড়ীর মতো কিছু কাজ আমরা দেখতে পাই

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ডিজাইনের পোশাক

সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি চাকমাদের কিছু দ্রব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা চাদরের ডিজাইন ও রঙের জমকালো ছবি দেখতে পাই। ডিজাইনগুলো বড় বড় জ্যামিতিক ফর্মে তৈরি করা

চাকমাদের ডিজাইন করা পার্স

Chittagong University Institutional Repository

সাম্প্রতিককালে চাকমারা ছোটদের পোশাক তৈরি করছে চাকমা কাপড়ে। এখানে ডিজাইনের নতুনত্ব লক্ষ্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে বর্তমানে তাদের পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদ নেড়ে দেওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

একজন আধুনিক চাকমা মেয়ে ও তার পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা কর্তা ও কর্তীর সাথে গবেষক।

একটি আধুনিক চাকমা পরিবার ও তাদের ব্যবহৃত কাপড়সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

দুইজন আধুনিক পোশাক ও অলংকার পরিহিত চাকমা যুবতীকে দেখতে পাই, পলিনা চাকমা ও রিলি চাকমা দুইজনই ঢাকায় থাকেন, পেশায় শিক্ষক।

নিত্য নতুন ডিজাইনের পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আধুনিক পোশাক ও নিত্য নতুন গঠন ও ফর্ম

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আধুনিক পোশাক ও নিত্য নতুন গঠন ও ফর্ম

ভারতের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'নাগা' ও তাদের কাপড়ের আধুনিক ডিজাইন/ মোটিফ

Dhaka University Inst

চাকমা শিল্পী কনক চাঁপা

শিল্পী কনক চাঁপা চাকমার আঁকা ছবি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইউএনডিপি শাখা কর্তৃক আয়োজিত নৃ-গোষ্ঠীদের পোশাকের আধুনিক কাটিং ও পোশাক প্রদর্শনীর মুহূর্ত

Dhaka University Institutional Repository

তীর ধনুক

[কাকন হাট, গোদাগাড়ি, রাজশাহী, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০]

এখানে তাদের ঐতিহ্যগত বাদ্য যন্ত্র দেখতে পাই।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট যাদুঘর, রাজশাহী থেকে তোলা ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ছাতার ভেতরের বুনন ও ডিজাইন দেখা যাচ্ছে। বুননটা সাধারণ পাত্র বা ঝুড়ির বুননের মতো। ছাতার বাইরের ফর্মটা গোলাকৃতি ধামার মতো ।

তাদের ঐতিহ্যবাহী টি টেবিল দেখা যাচ্ছে যে, টেবিলটা পাট দিয়ে বোনা হয়েছে এবং সাথে কাঠের ব্যবহার করা হয়েছে। বুননগুলো চারকোণা খোপের মতো দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল ঐতিহ্যের বাঁশের ছাতা। এটি পাওয়া যায় গনেশ মাঝির ওখানে। তিনি একটি এনজিও অফিসে কাজ করেন।

এই ছবিতে আমরা ভিন্ন ডিজাইনের ঢোল ও বাঁশের নান্দনিক ব্যবহার দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী কুলা

সাঁওতালদের নকশাকৃত কারুশিল্প : কলস

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী লবণদানী দেখতে পাই। লবণদানীটা প্রাকৃতিক ফর্মে তৈরি হয়েছে বেলের খোল দিয়ে।

ঐতিহ্যবাহী ছিঁকে দিখতে পাই। ছিঁকেটা হলুদ ও লাল রং করা হয়েছে, এটা বাঙ্গালীদের মতো ।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী চামচ

চমৎকার একটি ঝাটা দেখতে পাই। এর নাম পোতাম ঝাম্পা, এটা নারিকেলের পাতার সলা ও পাটের সূতা দিয়ে তৈরি করা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট যাদুঘর, রাজশাহী থেকে তোলা ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

ভিম হাসদার বাড়ির ভিতরের অংশ, ঘরের নিচের অংশ লাল রঙের মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া। সূক্ষ্মভাবে দেখলে এখানে নারিকেল পাতার মতো কারুকাজ দেখা যায়। ঘরটি সম্পূর্ণ মাটির তৈরি উপরে টিন দেওয়া।

খড় দিয়ে তৈরি বসার পিড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

পাতলা চিকন শিটকে দুপাশে সূতা দিয়ে গেথে রূপার মালা তৈরি করা হয়েছে। ডিজাইনটা অন্যদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। গলার বন্ধনটা অবশ্য স্বর্ণ রংয়ের। বালার মতো মোটা গোল ডিজাইনও দেখা যায়। (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০১০)

কানের দুলটা বেশ বড় ও গোল আকৃতির, এর রং স্বর্ণের; এটি উপরের দিকে ছোট ছোট ঝুমকার মতো গঠনের হয়ে থাকে। এটা তাদের ঐতিহ্যগত গহনা।

তাদের সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল ঘোড়া। বর্তমানে যা শুধুমাত্র বৎসরে ১টি দিনের জন্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকটা দেখতে পাই। সাদা ধূতি, মাথায় সাধা পাগড়ি ও নীল, সবুজ একটা ফতুয়া দেখা যাচ্ছে। এই পোশাক বর্তমানে তারা শুধুমাত্র উৎসবে পরে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

লাল হলুদ ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত সাঁওতাল মেয়েরা। মেয়েদের মাথায় ফুল দেখা যায়। যা তাদের ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল বর্তমান কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

পবা থানা, রাজশাহীর জাকারিয়াস ডুমরির ওখানে বাঁশ দিয়ে বুননরত সাঁতালগণ(মাহলে)। মহিলার হাতে যে বালা দেখা যায় তা হলো ইমিটেশন। বর্তমানে তারা ইমিটেশনের অলংকার পরছে।

কয়েল দ্বারা, খ্রীষ্টানপাড়া রাজশাহী এলাকার একজন বয়স্ক সাঁওতালের সাথে কথা বলার পর তিনি চলে যাচ্ছেন। তিনি বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি বা পাত্র বুনে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ঝুড়ি বোনার কৌশল, ডিজাইন ও নতুনত্ব লক্ষ্য করি। বাঁশের সবুজ রং ও বাঁশের প্রাকৃতিক খয়েরী রং, বর্তমানে উভয় রঙের বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি বোনা হচ্ছে। (পবা থানা, রাজশাহী, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০)

সাঁওতালদের আরেক গ্রুপ মাহলেদের তৈরি বাঁশজত দ্রব্য সামগ্রী। এখানে মাহলে নারীদের পোশাক হিসাবে দেখা যায় আধুনিক সেলোয়ার কামিজ। মাহলেরাও বাণিজ্যিকভাবে এখন কলমদানি বা ছোট পাত্র তৈরি করছে। পাশের এই ক্ষুদ্র পাত্র গুলো শুধুমাত্র মাহলেদের মধ্যে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সলোমন সাঁওতালের বাড়িতে। ঘরের মধ্যে টাঙ্গানো তুলা দিয়ে তৈরি কারু শিল্প দেখা যায়। ঘরের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টের ছবিও দেখা যায়। অন্য ছবিতে সলোমনের মা ছোট ভাই ও গবেষককে দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে পালংকসহ আধুনিক সাজ সরঞ্জাম দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালদের মধ্যে মাহলেদের বাঁশের কাজ ও তাদের কারুশিল্পের ভিন্নতা লক্ষণীয়। পাত্রগুলি খুবই ছোট ছোট। পাত্রগুলিতে লাল, সবুজ ও হলুদ রং দেখা যাচ্ছে। (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র, ২০০৯)

সাঁওতাল কাপড় দেখা যায় রংগুলো হলো লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি। এখানে কোন রঙের মিশ্রণ নেই, যেমন মনিপুরীরা রঙের মিশ্রণ ব্যবহার করে (২০১০ সাল বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ছবি নেওয়া)।

Dhaka University Institutional Repository

ভিম হাসদা (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) তার স্ত্রী মারগারেট হাসদা এবং তার সন্তানের সাথে লেখক। ভিম হাসদার পরিবারের সকলে আধুনিক পোশাক পরিহিত। তারা ধর্মে খ্রীষ্টান, বর্তমানে তিনি ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। [ছবি: কাকনহাট গোদাগাড়ি, রাজশাহী, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০]

Dhaka University Institutional Repository

গারো চিত্রসূচি : গারো ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

গারো পুরাকির্তীর ঐতিহ্যবাহী ঘরের নমুনা দো-চালা লম্বা ঘর। ঘরের সমস্ত বেড়া, সামনের অংশ সবই বাঁশের বুননে তৈরি। উপরে ছন দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছে (রবি খান এর জাদুঘর, জলছত্র, মধুপুর)।

গারো তাঁত ,ছবিটা একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

গারো মেয়েদের পোশাক লক্ষ্য করুন, লাল, কালো রঙের সাথে হলুদ রঙের স্ট্রাইপের ব্যবহার আছে তবে তা চাকমাদের থেকে আলাদা। তাদের কানে, হাতে, গলায় ও মাজায় ইমিটেশনের অলংকার দেখা যায়।

গারো চাষী প্রফুল্ল দ্বিব্রার বাড়ির রান্নাঘর, মদ তৈরির পাত্র দেখা যায়। ঘরের অন্য আধুনিক আসবাবপত্রও দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের কারু দ্রব্য।

'খিম্মাসংআ' আধুনিক শিল্পকলা স্থাপনা শিল্পের মতো। তিনটি কাঠে কারু কাজ করা দেখা
যায়। দ্বিতীয়টি খাজকাটা কম, তৃতীয়টি আরো কম অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয়টি কম বয়সী মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

গারো দেবতার ভাস্কর্য। ভাস্কর্যের পিছনে তাদের কাপড়গুলো দেখা যাচ্ছে। কাপড়ের সূতা পাতলা, বুননগুলোও পাতলা। কিছু কারু কাজ দেখা যায় তা বাঙালী প্রভাবিত (২০০৯ সালে কারু শিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে তোলা ছবি)।

১০৪ বছর বয়সী (জনিক নকরেক) একজন গারোর ছবি (আচিক মিচিক সোসাইটি, চুনিয়া গ্রাম, মধুপুর, ২৮ আগস্ট ২০১০)।

Dhaka University Institutional Repository

মিরনি হাগিদক এর ছবি,সহ সভানেত্রী আচিক মিচিক সোসাইটি, ২৮ আগস্ট, ২০১০।

গারো বর্তমান কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

একজন আধুনিক গারো মেয়ে, নাম রাখি ম্ররং (২০০৯ সালে কারু শিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র থেকে তোলা ছবি)।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে চাকুরীরত দুইজন গারো যুবক যুবতী, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত আধুনিক ও বাঙ্গালী প্রভাবিত। এরা হচ্ছে বর্তমানে গারো সমাজের প্রতিনিধি (আচিক মিচিক সোসাইটি, চনিয়া গ্রাম, মধুপুর)।

ছবিতে গারোদের তৈরি পার্স দেখতে পাই। সাম্প্রতিককালে চাকমাদের দেখাদেখি গারোরাও এ ধরনের কারু দ্রব্য তৈরি করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে গারো কাপড়ের বিভিন্ন রং লক্ষণীয়। গারো কাপড়ের যে ফুল, মোটিফ দেখি তার বিপরীতে চাকমারা স্ট্রাইপ ব্যবহার করে থাকে। গারোরা বেগুনী ও সবুজ রং বেশি ব্যবহার করে থাকে। ডিজাইনগুলো জামদানী বা অন্যান্য ডিজাইন দ্বারা প্রভাবিত। তাদের রঙে হালকা খয়েরী, ক্যাডমিয়াম হলুদ, গাড়ো খয়েরী ও ঘিয়ে রঙের ব্যবহার দেখতে পাই। চাকমারা এ ধরনের রং ব্যবহার করে না বললেই চলে।

একটি জামদানী শাড়ীর ডিজাইনের একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কাপড়ের একটি ডিজাইন ও মোটিফের গঠন প্রকৃতি।

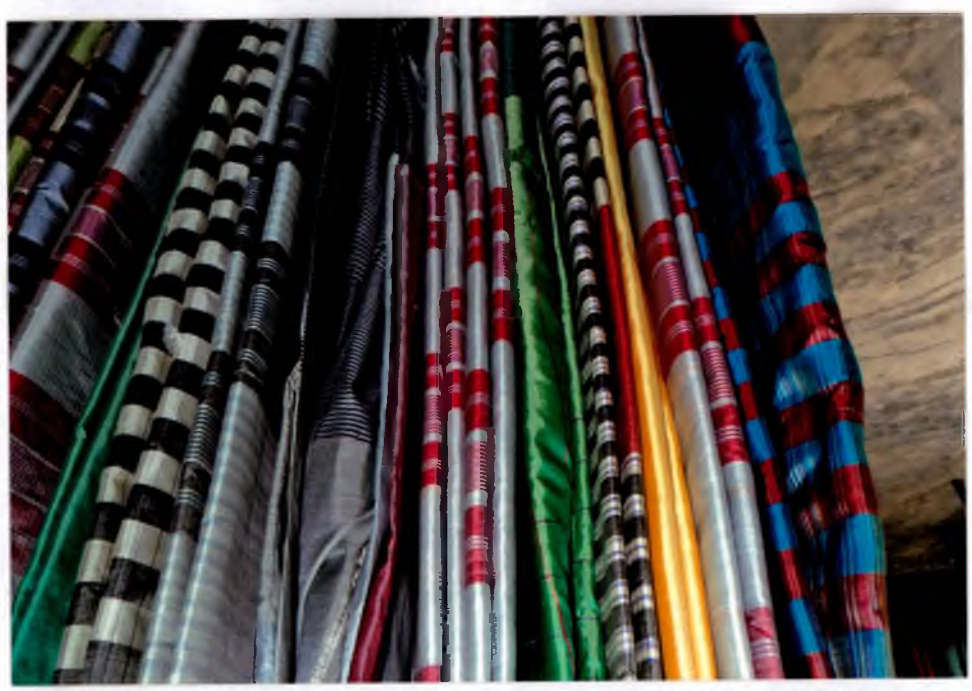

তাদের ট্রাডিশনাল স্ট্রাইপ দিয়ে বর্তমানে তারা রেশমী সূতা দিয়ে কারিতাশের সাহায্যে কাপড় বুনছে। লাল, সাদা, খয়েরী, কালো, এ্যাশ ইত্যাদি রঙের ব্যবহার দেখা যায়। এক কালার ও সেডের ব্যবহারও দেখা যায়। এখানে তারা কোথাও কোথাও ফুলের মোটিফও ব্যবহার করেছে। তাদের এসব শাড়ী কারুশিল্পের নতুনত্ব বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

রেশমি সুতা দ্বারা তৈরি শাড়ী

আধুনিক বালা পরিহিত গারো মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক গারো মেয়েরা ইমিটেশনের গহনা পরে। গহনাটি জ্যামিতিক ডিজাইনে তৈরি, এর রং সোনালী।

আধুনিক অলঙ্কার পরিহিত গারো মেয়ে

ছবিটি এটিএন টিভি চ্যানেল থেকে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গারোদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, একটি কিশোরী ও একটি ছোট বাচ্চার ছবি। মেয়েটির পরিহিত ড্রেসে গারোদের ঐতিহ্যের কিছুই দেখা যায় না।

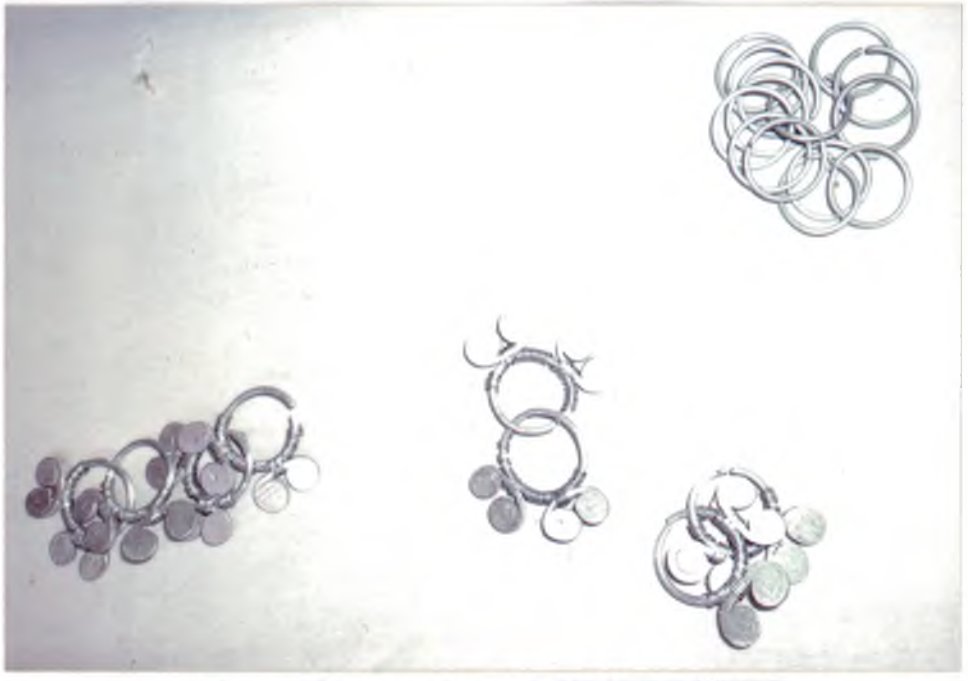

ঐতিহ্যবাহী গহনার নতুন মাধ্যম ,দস্তা-এ্যালুমুনিয়াম

Dhaka University Institutional Repository

লাউপাত্রের মতো কিন্তু মাটি দিয়ে তৈরি এই পাত্রগুলো বাবুল মারাকের নতুন আবিষ্কার। এখানে রংটা অত্যন্ত চমৎকার।

গারো মেয়েদের বর্তমানে বিউটি পার্লারে কাজ করতে দেখা যায়
এ টি এন বাংলা টিভি চ্যানেল থেকে নেওয়া ছবি

Dhaka University Institutional Repository

গারো তরুণ ব্যবসায়ী, জলছত্র বাজার, মধুপুর (২৮/৫/২০১০)।

প্রফুল্ল দিব্রার মেয়ে, তার স্ত্রীসহ ছবি। বাদিকে তার চাষাবাদের জমি দেখা যায়। তাদের পরিহিত বস্ত্রসমূহতে আধুনিক পোষাকের প্রভাব লক্ষণীয়। মেয়েটি আধুনিক পোশাক পরিহিত, বাবা লুঙ্গী পরা।

Dhaka University Institutional Repository

বাবুল মারাক তার ওয়ার্কসপে কর্মব্যস্ত।
এখানে দুই ধরনের রং দেখা যায়। একটি বাঁশের প্রাকৃতিক রং অন্যটি আগুনের ধোঁয়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার ওয়ার্কসপে কাঁচামালগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

উঠানে নেড়ে দেওয়া একটি গারো পরিবারের আধুনিক পোশাক

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী সোল হাঙচা

তৃতীয় প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে ছবি নেওয়া হয়েছে, চারুকলা বিভাগ-ঢা.বি.-২০০৮ ইং।

শিল্পী সোল হাঙচা'র আকাঁ ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ইউএনডিপি আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলাতে আগত একদল বম শিল্পীকে নৃত্য-গীত পরিবেশনারত দেখতে পাই।

বম মহিলাদের দ্বারা কার্পাস তুলায় তৈরি ঐতিহ্যবাহী লেপ বা কম্বল বিশেষ– 'পোয়ান বুহ্'। এই ধরনের বস্ত্রের জন্য বমরা বিখ্যাত। (ছবি নেওয়া হয়েছে: নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবন থেকে।)

Dhaka University Institutional Repository

বম জামা। বম মহিলাদের স্কার্ট। রং ও ডিজাইনে চাকমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এ কাপড়টি। পুরো কাপড় জুড়ে সরলরেখা, ছোট ছোট ডিজাইন ও কালো রঙের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

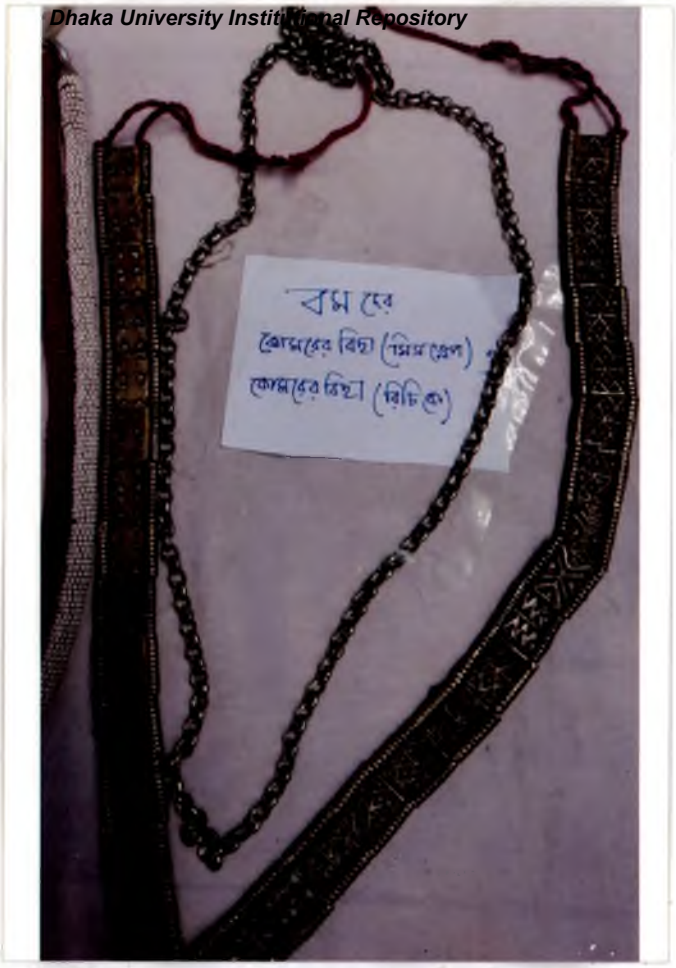

বম কমরের বিছার জ্যামিতিক নান্দনিক ডিজাইন

Dhaka University Institutional Repository

রূপার টাকা, পুঁথি ও সূতা দিয়ে তৈরি বমদের গলার মালা– 'তাংকাঠি'। এ ধরনের মালা বর্তমানে তেমন দেখা যায় না।

'সোমপি সোমকোয়া' বম পুরুষের বালা। এটা পিতল দ্বারা তৈরি। এটিও এখন তেমন চোখে পড়ে না।

Dhaka University Institutional Repository

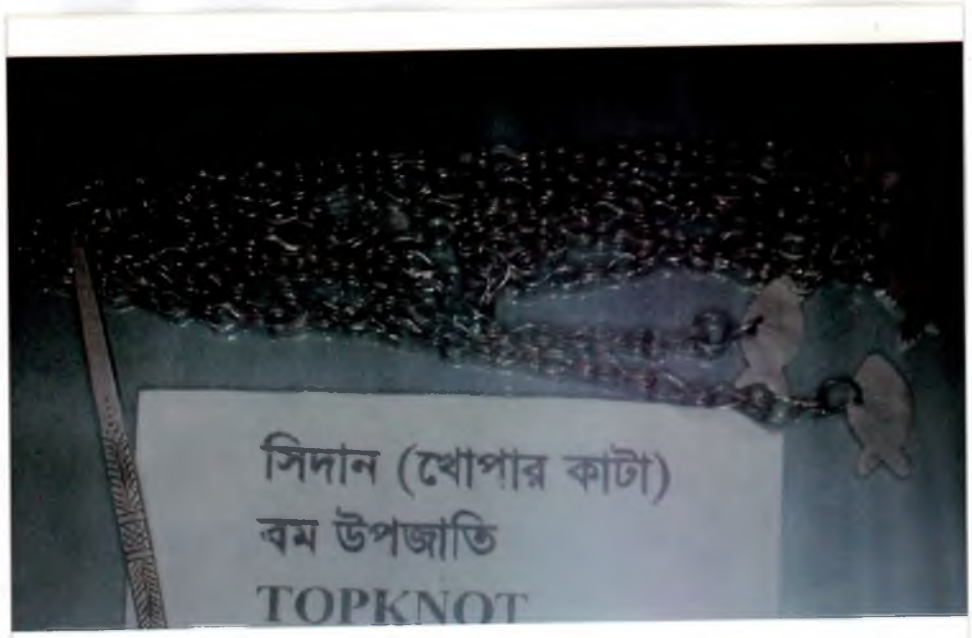

'সিদান' বা বমদের খোপার কাঁটা। রূপা দিয়ে তৈরি এই অলংকারের নকশাতে মোটিফ হিসাবে শিকল, মাছ ও বৃত্তের ব্যবহার দেখা যায়। খোপার কাঁটায় গম বা ধানের শিষের মতো মোটিফ লক্ষণীয়।

তাংকাভাল (হাচুলী) বমদের একপ্রকারের অলংকার। বমদের এ অলংকারটি বেশ সূক্ষ্ম কারুকাজ সমৃদ্ধ। এখানে সোজা রেখা, ক্রস রেখা, ওভাল ফর্ম, ডট ও পাতার মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'মাইজাহ্' বাঁশের চাঁচ দিয়ে লিক সেলাই স্টাইলে বোনা বমদের পাখা।

বান্দরবনে লাইমীপাড়ার একটি বাড়ির ভেতরে মাচার উপর ফসল তোলার ঝুড়ি দেখতে পারছি . ঝুড়িটি নৃ-গোষ্ঠীদের একটি ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। (ছবি নেওয়া হয়েছে লাইমিপাড়া, বান্দরবানের

Dhaka University Institutional Repository

বম ঐতিহ্যবাহী পাত্র, এগুলিতে অলংকার ও অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখা হয়।

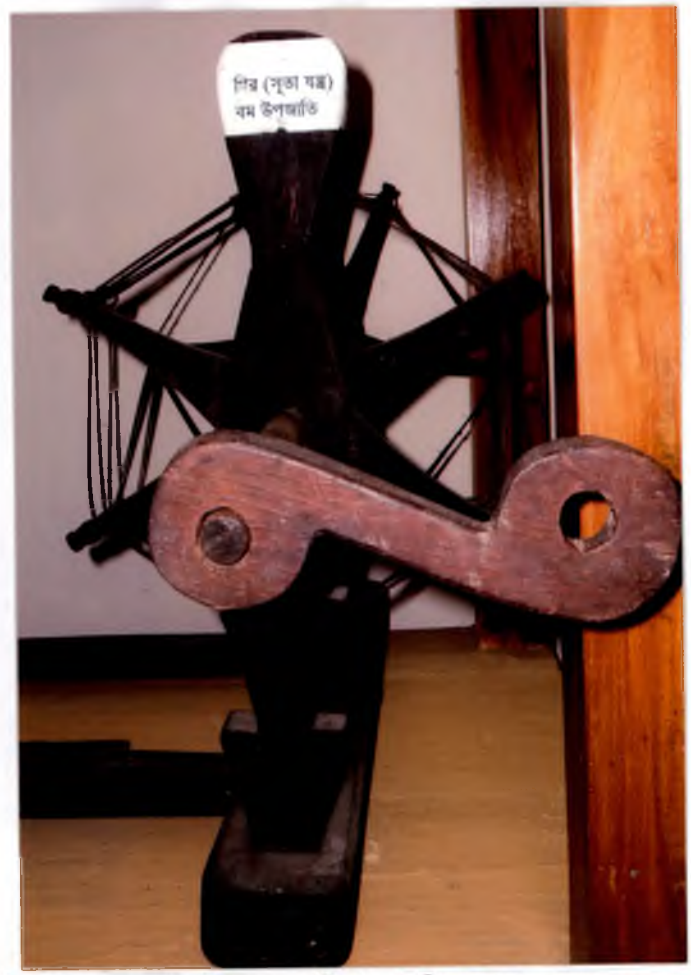

বমদের কার্পাস থেকে সূতা তৈরির যন্ত্র– 'থির'। (ছবি নেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবন থেকে।)

Dhaka University Institutional Repository

বাসার বাইরের অংশ। ঘর প্রায় আড়াই-তিন ফিট উঁচু। ঘরে উঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘরটির বেড়া বাঁশ ও চাটাইয়ের দ্বারা তৈরি, খুঁটিগুলো গাছের তৈরি। সিঁড়িতে বাঙালি ছেলে ডাব্লুকে দেখা যাচ্ছে, ডাব্লু হচ্ছে বম যুবক সাং-এর বন্ধু। ডাব্লু লাইমিপাড়া ঘুরে দেখতে আমাকে সাহায্য করেছিল। ঘরের সামনে চার-পাঁচ হাত বারান্দা, যা বাঁশ ও চাটাই দিয়ে তৈরি। ঘরের ডান দিকে বিভিন্ন ধরনের ফুলগাছ ও পাতাবাহার গাছ দেখতে পাই।

২০৭

একটি বম বাড়ির ভেতরের অংশ। সেখানে কোমরতাঁতে চাদর বুনছে এক বম-নারী। নিচে বেত-জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি পাটি দেখতে পাই। পাটির বুনন চাটাইয়ের নকশার মতো। এখানে অন্যান্য আসবাবপত্রের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষণীয়। ঘরের মধ্যে টেলিভিশন, লোহা ও প্লাস্টিকের চেয়ার, কাঠের আলমারী, বাঁশ দিয়ে তৈরি ছোট আলমারী দেখতে পাই। বম মহিলা রাখাইনদের মতো ফুলের নকশা করা কাপড় পরে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

বম বন্ধু সাং-এর বাসার রান্নাঘর।

বম বর্তমান কারুশিল্পের চিত্রসমূহ

একজন বম মেয়ে, মেয়েটি ফরমাং বমের ভাগ্নী। ফরমাং বম এই এলাকার প্রাইমারি শিক্ষক। মেয়েটি কোমরতাঁতে মাফলার বুনছে, সে বাঙালি ধাচের অতি আধুনিক সালোয়ার-কামিজ পরে আছে। বলা বাহুল্য, বমদের মাফলার এবং কম্বল অত্যন্ত বিখ্যাত। ঘরের বাইরের দিকে নেড়ে দেওয়া কাপড়গুলি দেখলে আমরা বুঝতে পারি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে শিক্ষক ফরমাং বমকে দেখতে পাই, তিনি অতি আধুনিক টি-শার্ট ও প্যান্ট পরিহিত। ঘরটির সামনের অংশ হোটেল বা খাবারের দোকান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (ফারুকপাড়া, বান্দরবন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০)

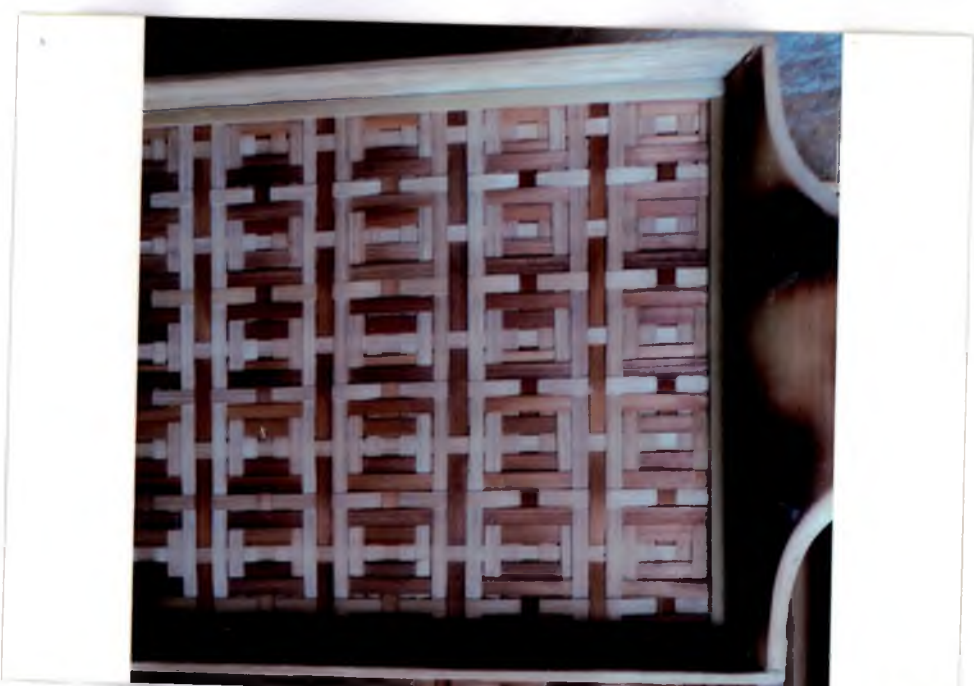

বম বাজার 'শৈলপ্রপাত' এলাকায় তাদের তৈরি ট্রে দেখতে পারছি। ট্রে-টি বাঁশের দুইটি রঙে তৈরি। একটি বাঁশের প্রাকৃতিক রং এবং অন্যটি বাঁশে ধোঁয়া দিয়ে তৈরি করা গাঢ় খয়েরী রং। এই গাঢ় খয়েরী রংটি তাদের বর্তমান কারুশিল্পের পরিবর্তিত ও আধুনিক রং।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে সূঁই-সূতার আধুনিক কারুকাজ, ফুল-লতা-পাতার মোটিফ, গোলাপী-সবুজ ও নীল রঙের ব্যবহার দেখা যায়।

হ্যাট পরা ভদ্রলোক, শিক্ষিত দোকানী রবিন বম। সামনের দিকের কারুদ্রব্য ও পিছনের বিস্কিট সবই সে বিক্রয় করছে। (শৈলপ্রপাত বাজার, ফারুকপাড়া, বান্দরবন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

বান্দরবানে বর্তমানকালে বমদের তৈরি করা ছোট পার্স, ব্যাগ ছবিতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অন্যদের দেখে বমরাও এ ধরনের দ্রব্য তৈরি করছে।

ছবিতে কম্বল ও এর রঙের বৈচিত্র্য দেখতে পাই। এই সব কম্বলে বিভিন্ন রকমের লাইন, আবার লাইনের মধ্যে বিভিন্ন নকশা দেখতে পাই। পুরো কম্বল জুড়ে বিভিন্ন রকমের কাজ দেখা যায়। তাদের কম্বল ও মাফলারের কাজ অতুলনীয়। মাত্র পাঁচ-ছয় ইঞ্চির মধ্যে আট-দশটি রঙের বৈচিত্র্য অন্যদের কাপড়ে তেমন একটা দেখা যায় না। যদিও এত কালার অতীতে তাদের কম্বল ও মাফলারে ছিল না। বর্তমানে তারা মুখমলের কম্বল ও মাফলার বুনছে। কার্পাস তুলা দ্বারা নির্মিত কম্বলের জন্য তারা বিখ্যাত। এই কম্বলগুলি উলের তৈরি।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে আমরা সাম্প্রতিককালে করা কিছু ভাস্কর্য, মোবাইল স্ট্যান্ড, পাত্র ও কিছু শো-পিচ দেখতে পাই। মানুষের মুখ সম্বলিত ভাস্কর্যটিকে আমরা জগের আকৃতিতে দেখতে পাই। এই ছবির সকল বিষয়বস্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ দ্বারা প্রভাবিত অতি সম্প্রতিককালের কারুশিল্প। (উল্লেখ্য, নাথান নামের একজন বম শিল্পী আছে, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ছাত্র ছিলেন।)

প্রাকৃতিক ডিজাইনে লাউয়ের পানিপাত্র দেখতে পাই, যা বমদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। পাশে নতুন আঙ্গিকে ও আধুনিক মোটিফে বাঁশ দিয়ে তৈরি কিছু পাত্র দেখতে পাই। পাত্রগুলির নতুন বিভাজন ও নকশা লক্ষণীয়। বাঁ দিকের পাত্রটি নিচের অংশ এক রঙা– মাঝে গাঢ় খয়েরী আবার উপরের দিকে নিচের রং, মুখটা ক্রস ফোঁড়ের মতো নকশায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ডান দিকের পাত্রটিতে তিন-চার লাইন ক্রস ফোঁড়ের মাধ্যমে পাত্রের গঠনকে মজবুত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে নকশায়ও নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে। এগুলি বমদের কারুশিল্পের নতুনত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

তিন রঙের ও ডিজাইনের ঝুড়ি দেখতে পাই। সবুজ রং, প্রাকৃতিক রং ও গাঢ় খয়েরী রং। নিচের পাত্রটিতে নকশায় নতুনত্ব আনতে গিয়ে রান ফোঁড় সেলাইয়ের মতো দুইটি লাইন তৈরি করা হয়েছে– যা আধুনিকতার প্রকাশ ঘটায়।

ছবিতে গলার মালা ও বাঁশের বালা দেখতে পাই। বালাতে ক্রস ও তারা মোটিফে নকশা দেখি। পুঁথিতে সাদা, হলুদ, বেগুনী সবুজ, কালো সব রং-ই আছে।

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার কারুশিল্প! বাঁশের চাঁচ দ্বারা নির্মিত ব্যাগ। অত্যন্ত আধুনিক ডিজাইন ও বুননে এটি তৈরি করা হয়েছে।

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে ইউএনডিপি আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কারুশিল্পের ছবি

বর্তমানেকালের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী দম্পতি ও তাদের পোশাক , যেটা সহজলভ্য সেটাই তারা পরে । মঞ্জুলিকা খিসা ও নিয়াজ জামানের STRONG BACKS MAGIK FINGERS বই থেকে নেওয়া ছবি

Dhaka University Institutional Repository

বম জামা

খুমিদের কোমর বিছা ও তার মোটিফ

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের পোশাক

মারমাদের কাপড়ে ফুলের মোটিফ

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের কাঠের কাজের অপূর্ব শৈলী

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের কাঠের তৈরি বিভিন্ন ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

Dhaka University Institutional Repository

তারা বাঙালিদের দেখে বিভিন্ন ধরনের শোপিচ তৈরি করছে

১১ লুসাই থলের সাম্প্রতিক ডিজাইন। জ্যামিতিক ও ডিজাইনের সরলীকরণ লক্ষ্য করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

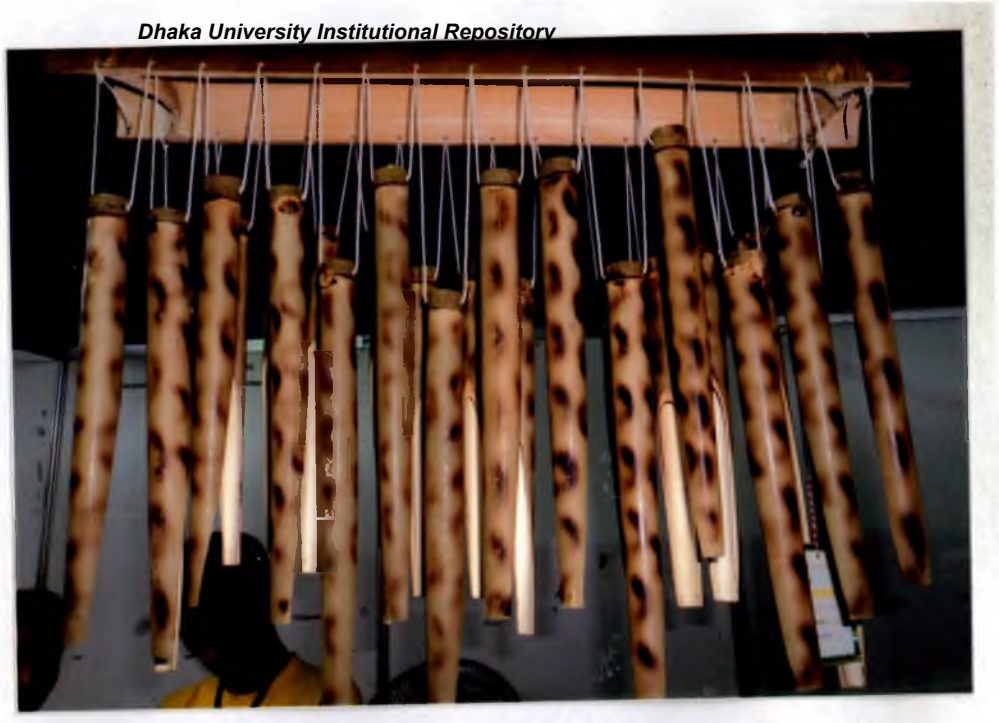

মারমাদের বিভিন্ন ধরনের শোপিস

প্রকৃতি প্রদত্ত ফলের বিচি দিয়ে তৈরি গলার হার।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ন-গোষ্ঠীদের মধ্যে মারমারা কাঠ ও বাঁশের কাজে বেশী পারদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের মোমদানি

পাংখোয়াদের চুড়ি ও বিছা

Dhaka University Institutional Repository

খেয়াংদের পেঁচানো চুড়িতে ফুল ও পাতার মোটিফ দেখতে পাই (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১)।

খ্রোদের বিছা

Dhaka University Institutional Repository

চাকদের পয়সার মালা

তঞ্চঙ্গ্যাদের প্যাচানো চুড়ি

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের খোঁপার কাঁটাতে মাছ মোটিফ দেখা যায়, ছবিতে তাদের হাতের চুড়িও দেখা যাচ্ছে

২৩ খুমিদের কানের দুলে ফুল এবং পাতার মোটিফ দেখা যায়। দুলের গায়ে ডিজাইনে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়, বৃত্ত ও বৃত্তাকৃতির চমৎকার ব্যবহার চোখে পড়ে (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারু-শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

তঞ্চগ্যাদের পোশাক

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কাপড়ে শাড়ীর মতো করে পরা ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–১

সারণী :

সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৯,পৃ-১৮ থেকে উদ্ধৃত (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী)

১৯৯১ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যা :

ক্রমিক	উপজাতি	জনসংখ্যা
১.	চাকমা	২,৩৯,৪১৭ জন
২.	মারমা	১,৪২,৩৩৪ জন
৩.	ত্রিপুরা	৬১,১২৯ জন
৪.	তঞ্চঙ্গ্যা	১৯,২১১ জন
৫.	ম্রো	২২,১৬৭ জন
৬.	লুসাই	৬৬২ জন
৭.	বম	৬,৯৭৮ জন
৮.	পাংখুয়া	৩২২৭ জন
৯.	চাক	২,০০০ জন
১০	খুমী	১,২৪১ জন
১১.	খিয়াং	১,৯৫৪ জন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট—২

বিভিন্ন ডিল্ডওয়ার্কের সারাংশ

ডিল্ডওয়ার্ক প্রথমবার : চাকমা-ত্রিপুরা এলাকা

কলেজ রোড, সদর খাগড়াছড়ি

মহাজনপাড়া, সদর খাগড়াছড়ি

নারানখায়া, সদর খাগড়াছড়ি

বাবুছড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি

ফুজগাঙ, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি

(২২ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯ইং)

মূলত ২০০০ সাল থেকেই আমার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে তাদেরকে কাছথেকে দেখার সুযোগ হয় ও আগ্রহ তৈরি হয় । তখন থেকে তাদের ছবি সংগ্রহ, খাদ্য ও পোশাক, সংস্কৃতি, ইত্যাদি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি । বান্দরবানের মংশৈম্রে, খাগড়াছড়ির মিংকু চাকমা, রাঙ্গামাটির উদভাসন ও সুশিল চাকমা এদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় । ২০০০ সালে প্রথম খাগড়াছড়ি যাই । আমি, সেলিনা আক্তার, দিপা, মিংকু চাকমা খাগড়াছড়ি বেড়াতে যাই। আমরা সবাই মিংকু চাকমার বাসায় ছিলাম । ২০০০ সালে খাগড়াছড়ি শহর এলাকা ছাড়াও খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাই, ইউ,পি,ডি,এফ এর এলাকা গুলোতেও ঘুরে দেখি । সাধারণত এসব এলাকা বাঙালিরা ঢোকেনা। এখানে আমরা অনেকের বাসায় যাই, তাদের ঘর বাড়ি দেখি, তাদের সাথে ঘুরি, ছবিতুলি, সেবার ৪ দিন খাগড়াছড়িতে থাকার পর ক্যাম্পাসে ফিরি । এরপর ২০০৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাতে আমি, স্বাগতম চাকমা, তার স্ত্রী স্বপ্না চাকমা, নাদিয়া আপা আমরা চারজন খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। পরদিন ৯টার পর খাগড়াছড়ি শহরে পৌছে যাই। সোজা স্বাগতমের বাড়ি কলেজ রোডে চলে আসি। এ এলাকা খাগড়াছড়ি শহরের মধ্যে অবস্থিত। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কেটে যায়। স্বাগতমের ঘরের পাশেই ওর মায়ের বাসা। স্বাগতমের বাড়ি বেশ সুন্দর করে সাজানো। বেড়া গুলো বাঁশ দিয়ে তৈরি, উপরে টিনের চাল, অন্যান্য জায়গায় কাঠের ব্যবহার আছে। ঘর আধুনিক কায়দায় তৈরি করা, তবে ঘরের বুনুনটা চাকমা আঙ্গিকে করা। এখানে একটি বড় ঘর ও দুইটি ছোট ঘর আছে। ঘরের জানালা ও দরজা গুলো কাঠের তৈরি, আমরা প্রথমে তাদের পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

পরিজনের সাথে কথা বলা ও মেশার চেষ্টা করি। স্বাগতমের বাসাতেই থাকার জায়গা হয়। সুবিধা হয়েছিল যে, ঢাকাতে সে আমার সাথে চাকুরী করতো যার ফলে সে আমার সাথে জড়তা ছাড়ায় ভালভাবে মিশতে পেরেছিল। তাদের ঘর, আশেপাশের পরিবেশ, লেখা পড়া, অর্থনীতি, শহরের সমাজ, গ্রামের সমাজ সবই দেখার ও জানার সুযোগ হয়। তার মা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। তাদের পোশাক, তার মায়ের পরিহিত পোশাক হিসেবে দেখা যায় যে, দেহের নিম্ন আংশে তিনি চাকমাদের পোশাক পরেছেন, উপরের দিকে বাঙালিদের ব্লাউজ পরেছেন। অনেক সময় তাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখেছি। স্বাগতম পোশাক পরিচ্ছেদে পুরাপুরি আধুনিক। তাদের খাবার দাবার একেবারে বাঙালি ধরনের বলা যায়। শুধু খাবারে ঝাল বেশি খায়। বাঙালি রান্না তারা করতে চায়, যদিও এতেঠ ভাল হয় না। আট দিনের মধ্যে সম্ভবত তারা একদিন কাকড়া রান্না করেছিল। এছাড়া তারা এক ধরনের শাঁখ রান্না করেছিল, যাতে কোন মশলা ছিল না, শুধুমাত্র সিদ্ধ করে খাওয়া হয়েছিল।

২৪/১২/২০০৯ইং তারিখে স্বাগতম ও স্বপ্নার চার বন্ধু সহ আমরা মোট ৭ জন খাগড়াছড়ির আলুটিলাতে বেড়াতে যাই। এর মধ্যে একজন ছিল ডাক্তার উনি বাঙালি, বাকী ৩ জন চাকমা আমরা সকালবেলা মটর-সাইকেল করে আলুটিলার সুড়ঙ্গ ঝর্ণা দেখতে গেলাম। ঐ এলাকাটি ছিল পর্যটন এলাকা। ওখান থেকে আর একটু সামনে বাস্তব ঝর্ণা ও দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তা গুলো বেশ উচু নিচু ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ওখানে পৌছার পর আমি ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন রকমের ছবি তুলি। এখানে ৩জন চাকমার সকলেই ছিল জিনস্ প্যান্ট পরিহিত ও আধুনিক পোশাকে সজ্জিত ছিল। এলাকা ঘুরে দেখে এখান থেকে দুপুরেই ফিরে আসি। ঐ দিন বিকালে কলেজ রোডের একটি মন্দিরে তাদের সাংস্কৃতিকে দেখতে যাই। ওখানে পৌছার পর দেখতে পাই যে, বয়স্ক, যুবক–যুবতী, মধ্যবয়সী সকলেই আসতে থাকে, তারা কেউ কেউ চাকমা কেউ কেউ বাঙালি পোশাক পরিহিত ছিল এবং তাদের পরিহিত অলংকারগুলোও ছিল বাঙালি ধাচের। সন্ধার পর আমরা ভবেশ মিত্রের সাথে কথা বলতে যাই, শহরের একপাশে নারানখায়া এলাকায়। ওখানে ত্রিপুরা এবং চাকমা উভয় পল্লী অবস্থিত। সব বাসার গেইট বাঁশের চাঁচ দিয়ে উচু করে তৈরি করা। বাইরের দেওয়াল গুলিও বাঁশ দিয়ে তৈরি। ভবেশের বাড়িও দেখলাম উপরে টিন দেওয়া। ঘরের দরজা জানালা কাঠের ও দেওয়ালগুলো ইটের তৈরি। ঘরের সবকিছুই আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত। এরপর দিন ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯ইং তারিখে সকালে খাগড়াছড়ি সদরে মার্কেটগুলো দেখতে বের হই,

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তাদের পোশাক, বেডশীট ও অন্যান্য বস্ত্রাদির মধ্যে দুই একটি কেনাকাটাও করি এবং ঐগুলির ছবিও তুলি, এর ফাঁকে ফাঁকে চাকমা দোকানদারদের সাথে কথা বলি। এর মধ্যে ছোট ছোট কিছু শোপিচ ছিল যেগুলো বার্মা থেকে নিয়ে আসা। কিছু কাশ্মীরি শাল ও বাঙালিদের তৈরি কাপড়ও ছিল। সন্ধায় স্বাগতম ফিরলে আমরা গৌতম মনি চাকমার দ্বিতীয় সন্তান মুদি ব্যবসায়ী কৃপায়ন চাকমার ওখানে যাই। তিনি তার বাবা গৌতম মনি চাকমা (শিল্পী) ও তার কারু শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেন। গৌতম মনি থাকেন রাঙ্গামাটির দীঘিনালায়। পরদিন ২৬ তারিখে সোজা স্বাগতমের অফিসে চলে যাই। এখানে তার বস সুনয়ন চাকমার সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। পুরানো অতীত নিয়ে ও সমসাময়িক সময়ের সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কথা হয়। আমি একটি জিনিস খেয়াল করেছি যে, যারা একটু শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান তারা তাদের নিজের ভাষায় লেখাপড়া শেখার কথা বলে। এর মধ্যে আমরা খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে যায়। ওখানে পরিচালককে না পেয়ে রিসার্চ অফিসার জিতেন চাকমার সাথে কথা বলি। তবে সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে ছবি তোলার জন্যে পুরাতন কোন ঐতিহ্যের বিষয় পেলাম না। পরে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ইং তারিখে রাতে আমরা জিতেন চাকমার বাসায় যায় ওখানে চাকমাদের বাঁশের ব্যবহার সম্পর্কে তার দুই পাতার একটি গবেষনা কর্ম পেয়ে যাই। গবেষনা কর্মটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এটা পড়ে চাকমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে বাঁশের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। ২৮ ডিসেম্বর শহরের মধ্যে একটি শিক্ষিত পরিবারের সাথে আমরা আলাপ আলোচনা করতে যাই। ঐ বাসার কর্তা সুনির্মল চাকমা একটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, তার স্ত্রী লাভলী চাকমা শিশু একাডেমীতে গান শেখায়, তার মা নিবেদিতা চাকমা (৬৫) একজন এনজিও কর্মী। নিবেদিতা চাকমার কাছ থেকে অনেক পুরানো ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। কেউ অথিতি হিসাবে এলে তাকে প্রথমে কলা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এখানে গ্রুপ আলোচনায় লাভলী চাকমাসহ ৭জন তাদের মতামত দেন। বর্তমানে তারা খুশি যে, তাদের তৈরি করা কাপড় বাঙালি মেয়েরা উড়না হিসাবে ব্যবহার করছে। বাঙালি এবং চাকমা সংস্কৃতির মিশ্রণে দেশের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে তারা এই আশা করেন। বেশ ভালভাবেই চাকমা ও ত্রিপুরা সমাজের সাথে থাকা, মেশা, জানা ও আলোচনা শোনা ও অংশগ্রহণ করা সবই আটদিনে ভালভাবে চলছিল। ৩০ তারিখে আমরা ঢাকায় ফিরে আসি। স্বাগতম ও তার স্ত্রী খাগড়াছড়িতেই থেকে যাই, কারণ তাদের স্কুল তখনও বন্ধ ছিল। একদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরদিন জানতে পারি যে, পোলিনা চাকমার বাসায় তার বাবা মন্টু বিকাশ চাকমা বেড়াতে এসেছেন। তিনি ব্যবসা করেন। থাকেন রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ি ও ফরেস্ট কলোনীতে। তিনি চাকমা ও ত্রিপুরা জাতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তার কাছে চাকমাদের সম্পর্কে,

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতে পারি। পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই চাকমা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন ও শিক্ষিত ব্যক্তি। তার কাছ থেকে চাকমাদের ঘর তৈরি, তার প্রধান ভীত, খুঁটি স্থাপন করার সময় ও এসময় কিকি কাজ করতে হয়, এগুলো সম্পর্কে জানা যায়। চাকমাদের একটি অন্যতম ঐতিহ্য হল, সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় সেইগুলার রং হবে প্রাকৃতিক অথাৎ অন্য কোন আলাদা রং দিয়ে ঐ দ্রব্য গুলোকে রঙিন করা হয় না। যে রং প্রাকৃতিকভাবে থাকে তাকে সেইভাবেই রাখা হয়। এছাড়া আমরা আরো জানাতে পারি যে, শুকুর খাওয়া তাদের কাছে একটা অন্যতম বিষয়। যে কোন অনুষ্ঠানে, সেটা বিয়ে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যাই হোক না কেন, যারা বিত্তশালী তারা বড় দেখে একটা শূকর জবাই করে ও মিলে মিশে খায়। তাদের মধ্যে মদ খাওয়ার বিষয়টিও আগে বেশি জড়িত ছিল, এখন কমে গেছে। বর্তমানে চাকমা সমাজের অবস্থা, শিক্ষা, চাকমাদের উন্নতি ও আরো উন্নতি কীভাবে করা যাবে এসব বিষয়ে তিনি মতামত দেন। তিনি চাকমা সমাজের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবকিছুই বলতে আগ্রহী। চাকমারা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে বেশি সচেতন হওয়ায় সরকারের দেওয়া অধিকাংশ সুযোগ চাকমারা গ্রহণ করতে পেরেছে। তারা শিক্ষিত হয়ে ত্রিপুরাদেরকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। আগে ত্রিপুরারাই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান শিক্ষিত গোষ্ঠী ছিল। আর এ কারণেই বর্তমানে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ফিল্ডওয়ার্ক : রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন এলাকা

চাকমা, ত্রিপুরা ও বম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এলাকা

বনরূপা ফরেস্ট কলোনী, রাঙ্গামাটি

কিল্লাপাড়, বালুখালী সদর, রাঙ্গামাটি

কালিন্দীপুর সদর রাঙ্গামাটি

কালিঘাটা, সদর বান্দরবন

লাইমীপাড়া, ফারুকপাড়া সদর, বান্দরবন

(১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০, ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটি আসি। পরদিন রাঙ্গামাটির ব্যবসায়ী মন্টু বিকাশ চাকমার বাসায় সে তার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে, ভাতিজা সকলের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেই শেষ হয়। ১৫ই

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর ২০১০ আমার সহপাঠী বন্ধু সুশীল চাকমা ও উদ্ভাসন চাকমা তাদের ভাগ্নে ভক্তি চাকমাকে আমার সাথে রাঙ্গামাটির বালুখালিতে যাওয়ার জন্য পাঠায়। সকাল ৯.০০টায় আমি, ভক্তি ও স্মৃতি চাকমা তিনজন রাঙ্গামাটি কালচারাল ইনস্টিটিউটে যাই। ওখানে আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কিছু ঐতিহ্যগত কাপড়- চোপড়, কারুশিল্প, ঘর-বাড়ি ইত্যাদির ছবি তুলি। এরপর আমরা লাইব্রেরিতে যাই। লাইব্রেরিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের উপর বেশ কিছু ইন্ডিয়ান লেখকদের ভাল বই পাওয়া যায়। সেই বই গুলো থেকে আমরা প্রয়োজনমতো তথ্য নিয়ে নেই। লাইব্রেরির স্টোর-রুম থেকে আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের কিছু বই এবং সিডি কিনে নেই। এরপর ইন্সটিটিউটের পরিচালকের সাথে কথা বলি। পরিচালক বয়সে নবীন, তাকে এ পদে উপযুক্ত বলে মনে হয় নি। এরপর সোজা রাঙ্গামাটি রাজবাড়ির লেকে ফিরে আসি কিল্লা-াপাড় ত্রিপুরা পল্লীতে যাওয়ার জন্য। আমরা চারজনে একটি বোট ভাড়া করি ৭০০ টাকা দিয়ে। ঐ সময়ে সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না, সেজন্য ভক্তি আমাকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করে। আমরা রাঙ্গামাটি লেকের আকাশ আর পানির চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কিল্লাপাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিল্লাপাড় পৌছানোর পর বোট থেকে নেমে গ্রামে উঠলাম। গ্রামটি লেক থেকে প্রায় ছয়/সাত হাতের মতো উঁচু। গ্রামে অনেক ছোট ছোট আদিবাসী ছেলে-মেয়েদেরকে দেখলাম যারা তখন খেলা-ধুলা করছিল। তারা বাঙালিদের মতো প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত ছিল। আর একটু এগিয়েই পাড়ার মধ্যে ঢুকলাম। মাটি থেকে দুই-তিন হাত উঁচু ঘরগুলোর নীচে কাদা দেখা গেল। এবং কিছু শূকর কাদায় চরে বেড়াচ্ছে। শূকর পোষা ত্রিপুরাদের অন্যতম পেশা। ঘরবাড়িগুলোর বেড়া বাঁশের তৈরি । উঠানে আড়া দেওয়া এবং সেখানে নেড়ে দেওয়া কাপড়ের অধিকাংশ বাঙালি কাপড়ের মতো । প্রথম ঘরটির মালিকের সাথে কথা বললাম এবং তার ঘরে আমাদেরকে সে বসালো। বয়স বিয়াল্লিশের মতো , নাম সন্তোষ ত্রিপুরা। ধর্মে খ্রীষ্টান এবং তার স্ত্রী এখনো ত্রিপুরা ধর্মে আছে। ঘরের মধ্যে টিভি, চেয়ারসহ অধিকাংশ আসবাবপত্র বাঙালিদের মতো আধুনিক। মহিলা ও বাচ্চাদের পোশাক-আশাকে দরিদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ঐ গ্রামে কেউ কেউ ঘরের উপর কিস্তিতে সোলার সিস্টেম লাগিয়েছে, কারণ ঐখানে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ঔ ফ্যামিলির মেয়েরা গলায় হার পরে ছিল। হারটি ছিল ইমিটেশন। মেয়েরা ব্লাউজ, ম্যাক্সি এবং ওড়না পরিহিত অবস্থায় ছিল। তারা জানালো তাদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। কিন্তু বর্তমানে জমি না থাকায় তারা শূকর পালে ও মদ তৈরি করে এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরাদের বেশকিছু বাড়ি দুই তিন হাত উচুঁতে তৈরি করা এবং বাঁকি বাড়িগুলি সাধারণভাবে তৈরি করা। এসব ঘরে বাঁশ ও কাঠ ব্যবহার করা হয়। ঘরের নিচে ফাঁকা জায়গায় শূকর চরে বেড়াতে দেখা গেল। আশপাশের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। এখানকার মেয়েরা সাধারণ পোশাক পরা। তারা বাঙালিদের মতো ব্লাউজ ,উড়না ও ম্যাক্সি পরিহিত। ছেলেদের পোশাক ছিল প্যান্ট, লুঙ্গি, শার্ট ইত্যাদি। ঐ এলাকার ত্রিপুরাদের পেশা শূকর পোষা, মাছ ধরা, চোলায় মদ তৈরি করা, (আমি চোলায় মদ তৈরি করার ছবি তুলতে গেলে তারা ইতস্তত বোধ করছিল, লজ্জা পাচ্ছিল)। এখানে ত্রিপুরাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টান হয়ে গেছে এবং রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরাই সবচেয়ে বেশী বদলে গেছে। ত্রিপুরারাই বেশী বদলে গেছে তার কারণ অন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বৌদ্ধ, তারা হিন্দুর মতো। অন্যদিকে বাঙালিরা হচ্ছে মুসলিম। সুতরাং কারো সাথেই তাদের ভাল বোঝাপড়া নেই। ফলে তারা নিজেদেরে মতো পরিবর্তিত হচ্ছে।

এখান থেকে ফিরে আমরা চারটার দিকে তবলছড়ি গেলাম। তবলছড়িতে কল্পতরু চাকমার হাতির দাঁতের কাজ দেখার ইচ্ছে ছিল তবে তাকে বাসায় পাওয়া গেল না। কল্পতরু চাকমা একজন প্রখ্যাত কারুশিল্পী। এরপর আমরা রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের তৈরি করা পোশাক বিক্রির দোকানগুলোতে গেলাম। এখানে আমরা বর্তমানকালের একটি বেডসিট দেখতে পেলাম যেটা আগের বেডসিট থেকে ডিজাইনে ও রঙে অনেক আলাদা। বেডসিটের মধ্যে এই প্রথম হরিণের মতো একটি জীবের ছবি দেখতে পেলাম। কাপড়টির জমিনটা ছিল গাঢ় খয়েরী রং এবং হালকা রং দিয়ে ডিজাইন করা। এটি এই সপ্তাহে বাজারে এসেছে বলে জানা গেল। এরপর ছ'টার দিকে আমরা রাঙ্গামাটি স্টেশনে ফিরে এলাম এবং বাড়িতে ফিরলাম। রাতে মন্টুবিকাশ চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে বিসিকের সাবেক পরিচালক নির্মলেন্দু ত্রিপুরার বাড়িতে যাই ও তাঁর সাক্ষাৎকার নেই। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। ১১:৫০টায় বান্দরবনে পৌছে যাই। এরপর শহরের নিউ গুলশান এলাকায় একটি আদিবাসী সংগঠনের কর্মকর্তা সুবর্ণা চাকমার সাথে দেখা করি। সে আমাকে বান্দরবনের সংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের রিসার্চ অফিসারের সাথে কথা বলে প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখা ও ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর বিকেলবেলা প্রু মারমা ও ডাবলু ভাইয়ের সাথে দু'টি মটরসাইকেলে চারজন বান্দরবনের ফারুকপাড়া ও লাইমিপাড়ায় যাই ও সরেজমিনে ঘুরে দেখি, কথা বলি ও ছবি তুলি। এরমধ্যে ঐ এলাকার বিখ্যাত পর্যটন এরিয়া শৈলপ্রোপাতে যাই এবং এখানকার বমদের তৈরি পোশাকের বাজারও ঘুরে দেখি। পরে রাতে শহরের ত্রিপুরাপাড়া কালিঘাটা এলাকায় যাই এবং

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ৫৫ বছর বয়স্ক শিক্ষক সত্যপাণ্ডি ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। পরে এখানে গ্রুপ আলোচনা ও করা হয় ,এবং আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলি এবং গ্রাম ঘুরে দেখি। পরদিন সকালে ঢাকাতে ফিরে আসি।

ফিল্ডওয়ার্ক : সাঁওতাল এলাকা

দামকুড়া, পবা, রাজশাহী

ফুলবাড়ি, কাজমা, কাকনহাট, গোদাগাড়ি, রাজশাহী

কয়েলদ্বারা, খ্রিস্টানপাড়া, সপুরা, রাজশাহী

(৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১০)

ঢাকা থেকে অনিল মারান্ডির ফোন নাম্বার যোগাড় করি । ০৫/০৯/১০ তারিখে রোজার মধ্যে ঢাকা থেকে রাজশাহীতে সেলিনা আপার বাসায় যাই । এই ব্যাপারে বেশ আগে তার সাথে কথা হয়েছিল । তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন যে, আমি তার ওখানে সাঁওতালদের ওপর কাজ করতে আসছি । সকাল ১১টার দিকে আমি রাজশাহী পৌছে যাই। এরপর কি করব তা সেলিনা আপা ও তার স্বামীকে খুলে বলি । তার স্বামী ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সেই সুবাদে তার ছাত্র সলোমন সাঁওতাল কে খবর পাঠান আসার জন্য। সলোমন ও তার চাচা বাসায় আসলে আমি তাদের সাথে কথা বলি। তারা আগামী কাল রাজশাহীর প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে সাঁওতালরা বেশি বসবাস করে ওখানে যেতে রাজি হলেন । আমি ঘন্টা দুই বিশ্রাম নেওয়ার পর, রবীন্দ্রনাথ সরেন ও অনিল মারান্ডির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি । ফোনে অনিল মারান্ডিকে পাই, তিনি বিকালে রাজশাহী শহরের মধ্যে একটি হোটেলে আসতে বলেন । বিকাল বেলা তার ওখানে গেলাম । প্রথমে রাজশাহীর কোন অঞ্চলে সাঁওতাল বেশি, এবং সেখানে কি ভাবে যাওয়া যাবে সে সম্পর্কে জেনে নেই । এর পর তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয় । ৪৭এর পর পুরাতন পোশাক সহ তাদের পোষাকে কি ধরনের পরিবর্তন আসে, কারীগরের অভাব, খ্রীষ্টান হবার পর তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, পোশাক-আশাক ইত্যাদির কী ধরনের পরিবর্তন আসতে থাকে, আগেকার তৈরি বিভিন্ন ধরনের রূপার গহনার পরিবর্তে বর্তমানে কি ধরনের গহনা সাঁওতাল মেয়েরা পরিধান করছে, বর্তমানে তাদের পেশা, পড়াশোনা ইত্যাদী বিভিন্ন বিষয়ে আলেচনা হতে থাকে । বর্তমানে সাঁওতালরা চাষাবাদ সহ সরকারী চাকরী, এনজিও তে চাকরী, দুই-এক জন ব্যবসা বাণিজ্যও করছেন । আগে তারা মুজুরের কাজ বেশি করত, দুই এক শতাংশ বাশের কাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

করত। বর্তমানে তাদের মাঝে জাতীয়তা বোধের আভাবে তাদের সংস্কৃতি উঠে আসতে পারছেনা, এর জন্য অন্যান্য সংস্কৃতিও দায়ী। আগে যেমন বিয়ে হত সামাজিক ভাবে, এখন চার্চে রেজিষ্ট্রেশন করে বিয়ে হয়, এখানে কোন সামাজিক আনন্দ থাকে না। বর্তমানে সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, আর্ট কলেজসহ বিভিন্ন জায়গায় পড়াশুনা করছে। অনিল মারান্ডির কাছথেকে আমরা অতিত ও বর্তমানের একটি সামাজিক চিত্র পেয়ে যায় । পাঁচ তারিখের মতো কাজ শেষ করে বাসায় ফিরি পরদিন ভোর বেলা সকাল ৬ টায়র পর রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হই। প্রথমে আমরা কয়েল দারা, খ্রীষ্টান পাড়া, সপুরা এলাকাতে যাই। এলাকাটি শহরের মধ্যে অবস্থিত একটি খ্রীষ্টান পাড়া, এখানে সলোমন ও তার পরিবার বসবাস করে। আমরা পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখি। এখানে কেউ কেউ বাঁশের পাত্র বুনছিল এবং বাকিরা যে যার মতো কাজ করছিল, দুই একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলি , জানতে চেষ্টা করি কিভাবে তারা বাঁশের ঝুড়ি বোনে। ঘরের সামনের মাঠে বাচ্চারা খেলা করছিল, তাদের পরনে প্যান্ট, গেঞ্জি ইত্যাদী আধুনিক পোশাক ছিল। এর পর আমরা সলোমানের বাসায় যায় । তার ঘরের মধ্যেও আধুনিক আসবাব পত্র দেখা গেল। ঘরের মধ্যে পালংক ছিল, উপরের দিকে যিশুর ছবি টাঙানো , অন্যপাশে তুলা দিয়ে হাতে তৈরি করা একটি কারুশিল্প দেখা গেল।

এর পর পবা থানার দামকুড়া ইউনিয়নে যাই এখানে যাকারিয়াস ডুমরি সাথে দেখাহয়। তার সাথে তার স্ত্রীসহ তার পরিবারের আরে কয়েকজনের সাথে গ্রুপ আলোচনা হয়। তাদের সমাজ, লেখাপড়া, অর্থনীতি, পোশাক সকল বিষয়েই আলোচনা হতে থাকে। ঐ এলাকায় কয়েকজন বাঁশের ঝুড়ি বুনছিল তিনি আমাদের ওখানে নিয়ে যান। তাদের সাথে কথা বলি, ছবিতোলার পর আমরা রহননগর, ফুলবাড়ির দিকে রওনা দেই। এখানে পৌছানোর পর আমরা একটি স্থানীয় হোটেলে খাবার খেয়ে নেই। আমি রোজা ছিলাম বিধায় বেশ কষ্ট হচ্ছিল, বেলা প্রায় দুই টার দিকে রৌদ্রের মধ্যে কখনো বাসে, কখনো পায়ে হেটে আমরা কাকন হাটে পৌছায়। স্থানীয় ছোট বাজারের মধ্যে দু'পাশে সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের ফল ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রি করছিল। পরে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে একজন প্রাক্তন শিক্ষক ও ধর্ম প্রচারক ভিম হাসদার বাসায় যাই। কাকন হাটে যাওয়ার পথে আমরা সাঁওতালদের মাঠির ঘরের নিচের দিকে লাল রং দিয়ে করা ডিজাইন দেখতে পেলাম। এটা হাত দিয়ে লেপে তৈরি করা হয়েছে। যাই হোক ভিমাসদার বাড়িতে যাওয়ার পথেই গ্রামটাকে ভাল ভাবে দেখে নেই। গ্রামটা ময়লা আবর্জনায় ভরা, ঘরগুলোর বেড়া ভাঙা, ঘর গুলো ছনের তৈরি, টিনের ঘরও দেখা গেল। রাস্তার পাশে কাছা মেরে কাজ করতে থাকা

Dhaka University Institutional Repository

একজন দরিদ্র মুসলিম কৃষককে বললে তিনি ভিমহাসদার বাড়িতে নিয়ে যান, ডাকাডাকির পরে ভিমহাসদার স্ত্রী বাসা থেকে বের হয়ে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ভিমহাসদা কে দেখতে পাই। লক্ষণীয় যে, গ্রামের সকল দরিদ্রমানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা তা আমরা এখানে দেখতে পাই। ভিমহাসদা, তাঁর স্ত্রী, পাতরাশ মারান্ডি, সলোমন, ভিমহাসদার ছেলে সহ আমরা সকলে উঠানে গোল হয়ে বসে আলোচনা করি। সাঁওতালরা প্রায় ১০০ বছর আগেথেকেই এই এলাকায় খ্রীষ্টান হতে শুরু করে। ভিমহাসদার বাবাও খ্রীষ্টান ছিলেন, তার ছেলের নাম বিপ্লব মুরমু, তার স্ত্রী মার্গারেট হাসদা, বয়স ৬০। তাদের বাড়িতে উপরে টিনের চাল, দেয়াল মাটির তৈরি, ঘরের দরজা কাঠের তৈরি। বাড়িতে পুরানো ঢোল ও তীর ধনুক পাওয়া গেল। বাড়ির সব আসবাবপত্র হাড়ি পাতিল ও তাদের পোশাক আশাক সবই আধুনিক। এটি একটি শিক্ষিত পরিবার, ভিমহাসদার কাছ থেকে জানা যায় যে, নবাবগঞ্জ, মহেষপুর, দিনাজপুর গেলে তাদের নিজেদের তৈরি কাপড় দেখা যেতে পারে। বর্তমানে দক্ষ কারিগরের খুবই অভাব। আগে বিহারের জুলহারা এই কাপড় বুনত। ৫০ বৎসর আগেও তাদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি কাজ। তার ধারণা ২০০ বৎসর আগে শিকার করা তাদের প্রধান পেশা ছিল । বর্তমানে নেতৃত্বের অভাব– তাদের দূরাবস্থার মূল কারণ। তাদের পুরো পরিবারের সাথে আমাদের কথাবলা, মেশা, ও তাদেরকে জানার সুযোগ হয়। এর পর আমরা লাখড়াদি গ্রামে আসি, এখানে একজন এনজিও কর্মী গনেশ মাঝীর সাথে কথা বলি। তিনি বাঁশদিয়ে তৈরি তাদের ঐতিহ্যবাহী ছাতা আমাদেরকে দেখান । তার মতে এই সব ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে রক্ষা করতে হলে প্রতিযোগিতার দরকার। দক্ষ কারিগর থাকলে এসকল কারুশিল্প আবারো প্রাণ ফিরে পেতে পারে। ঐদিন গোদাগাড়ি থানা থেকে ফিরে আসার সময় রাজশাহীর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটে যাই, এবং সেখানে আমরা তাদের ঐতিহ্যবাহী কিছু কারুশিল্পের ছবি তুলি যেমন : খড়দিয়ে তৈরি বসার মোড়া, পাট ও কাঠ দিয়ে তৈরি বসার টুল, ঝাটা, পাখি ধরার ফাঁদসহ আরো অনেক জিনিস। এসময় সন্ধা ঘনিয়ে আসলে, রাস্তাতেই ইফতারী করতে হয় । রাত ৮টার দিকে বাসায় ফিরে আসি

ফিল্ডওয়ার্ক : গারো এলাকা (প্রথমবার)

তেলকি, জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল

পঁচিশমাইল, জলছত্র,মধুপুর, টাঙ্গাইল

(২৮ মে ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকাতে আবস্থান রত সাংবাদিক ও লেখক রাখী ম্রং-এর সাথে ২০০৭ সাল থেকে পরিচয় ছিল। সে তখন আদিবাসী অধিকার আন্দোলনে কাজ করত। আমিও আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সদস্য হিসাবে তাদের বহু কাজ করে দিয়েছি। এ সংঠনের সাথে কাজ করে কেরীনা হাসদা নামে এক জন সাঁওতালের সাথেও পরিচয় হয়েছিল।

গারো এলাকায় মধুপুরে যাওয়ার জন্য আগেথেকেই কি ভাবে সেখানে যেতে হবে তা ভালকরে রাখীম্ররং য়ের কাছথেকে জেনে নেই। ২৭শে মে তারিখে আমার এক বন্ধুকে আমার সাথে মধুপুর যাওয়ার জন্য আনুরোধ করি । ২৮শে মে ২০১০ তারিখে ভোর ৬টার দিকে মহাখালী ঢাকা থেকে মধুপুরের দিকে রওনা দেই । নিরালা, বিনীময় যে কোনো গাড়িতেই মধুপুর যাওয়া যায় । ১১টার পর টাঙ্গাইলের মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে পৌছে যাই । বাসস্ট্যান্ডে একটি মসজিদ দেখতে পাই ওখানে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কিছুসময় বিশ্রাম নিয়ে নেই । এর পর আমরা টেম্পুতে করে তেলকি যাই। জলছত্র বাজারে গারো নৃ-গোষ্ঠীদের কিছু দোকান দেখতে পেলাম, আমরা সেখানে গিয়ে ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে ভিতরে যাওয়া যায়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই এলাকাতে রবিখান নামের একজন গবেষকের গারো সংগ্রহশালা দেখা । এটি এ এলাকার গারো জাদুঘর হিসাবে পরিচিত । এছাড়া আমরা ঐ এলাকার গারোদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব । আমরা ভ্যানে করে রবি খানের গারো জাদুঘরে যাই, দুই জন ছেলে ঐ জাদুঘর দেখাশুনা করছিল । আমরা তাদের সাথে কথাবলি ও জাদুঘর দেখাশুরু করি । প্রথমে তাদের ঐতিহ্যবাহী থাকার ঘর দেখতে পাই । ঘরে ওঠার জন্য ২ ফুটের একটি সিঁড়ি আছে । ঘরটি বেশ লম্বা ও দুচালা, ওপরে ঘরের চালে ছন দেওয়া । ঘরের বেড়া ও জানালা দরজা বাশের তৈরি এবং সেখানে অনেক কারুকাজ দেখা যায় । এছাড়া অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী জিনিসের মধ্যে মাছধরার পাত্র, মাথায় দেওয়ার মাথালি, মদ তৈরি করার পাত্র, দা ছাড়াও আরোও আনেক রকম ছোটবড় পাত্র দেখা গেল। ডানদিকে একটি আলাদা জায়গায় আরো কিছু নিদর্শন রাখারয়েছে । ঘরের উঠানে তাদের মৃত মানষদের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে কাঠদিয়ে তৈরি তিনটি বস্তু দেখা গেল, এগুলোকে 'খিম্মাসংআ' বলে। এর মধ্যে যেটি লম্বায় বেশিবড় সেটি বয়সী মৃতদের জন্য, আর লম্বায় যেটি ছোট সেটি কমবয়সী মৃতদের জন্য তৈরি করা হয়। গারো জাদুঘরের ছেলে দু'জন জিন্স ও আধুনিক পোশাক পরিহিত ছিল । জাদুঘর দেখার পর আমরা একজন শিক্ষিকার সাথে কথা বলতে তার বাসায় যাই । ঐ শিক্ষিকাকে বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া গেল না । এলাকার ঘরগুলো টিনের তৈরি, দেয়াল বাঁশকাঠের নির্মিত, ঘরের উঠানে প্রচুর ফুলগাছ ও পাতাবাহারের গাছ দেখা গেল । ঐ বাড়িতে কিছু সময় কয়েকজন মহিলা ও পুরুষের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়। এরপর পাশের গ্রামের প্রফুল্ল দিব্রা নামক একজন কৃষকের বাড়িতে যাই তার সাথে কথা বলার জন্য । এর আগে চন্দন মানসাং নামের একজন কারু শিল্পীর খোঁজে গিয়ে তাকে জলছত্রে নাপেয়ে আমরা এই কৃষকের বাসায় আসি । এই কৃষকের বয়স ৫০ বৎসর, লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তার ঘরের উঠানে প্রবেশ করে দেখলাম, দুই পাশে দুই চালা বড় দুইটি ঘর আছে। একটি ঘর গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয় অন্যটি থাকার জন্য । থাকার ঘরটি ছন দিয়ে তৈরি এবং মাটির দেয়াল আছে, অন্যটি ইটের দেয়াল ও টিনের চালের তৈরি। শোয়ার ঘরের শুরুতে রান্না ঘর অবস্থিত, ভেতরে এলুমনিয়ামের আসবাবপত্র দেখা গেল। একপাশে পুরানো মদ পাত্রও দেখাগেল । তিনি, তার মেয়ে এবং তার স্ত্রী একত্রে কথাবার্তায় আংশগ্রহণ করেন। মেয়েটি পুরোপুরি বাঙালি সালোয়ার কামিজ পরিহিত ছিল, মা সায়া ও ব্লাউজের মতো কাপড় পরিহিত ছিল । কৃষক প্রফল্ল দিব্রা কথাপ্রসংঙ্গে বললেন বর্তমানে সমাজে যে পরিবর্তনের ধারা চলছে তা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত। তাদের বোনা কাপড়ের মধ্যে দোকসারি ও অন্যান্য কাপড় কটকা তাঁতে তৈরি করা হয়। এছাড়া ইদিলপুরের শিশুপল্লীতে বড় তাঁত আছে, এই তাঁতে চিকন সূতা দিয়ে কাপড় বোনা হয় । বর্তমানে তিনি এবং সমাজের অধিকাংশ গারো খ্রীষ্টান হওয়ায়; অধিকাংশ উৎসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খ্রীষ্টান হওয়ায় অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা লাভ হলেও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা আগে খাওয়ার জন্য কাসার থালা ব্যবহার করত, নানা-দাদা বা বড়রা আসলে ঐ থালায় খাবার দেয়া হত এখন এগুলো আর নেই।। তিনি বললেন পিরগাছা মিশনে এখন রেশমীসূতা দিয়ে তাঁতের কাপড় বোনা হচ্ছে, এগুলো নতুন ধরনের কাপড়। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার পর আর কৃষিকাজ করতে চায়না । বর্তমানে পুরোনো অনেক ঐতিহ্য, বাদ্য যন্ত্র, কারুশিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি কারুশিল্পী চন্দন মানসাং সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন, এছাড়া ডেনিসন চিরান নামের একজন ভাস্কর্য শিল্পীর কথাও বললেন, ডেনিসন চিরান ছবি ও আঁকতে পারেন । বর্তমানে গারোরা গার্মেন্টেস, বিউটি পার্লার, এনজিও ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে । প্রফল্ল দিব্রার ওখান থেকে বের হয়ে আমরা জলছত্র বাজারে আসি, বাজারে গারোদের পোশাক আশাকের কয়েকটি দোকান দেখতে পাই। এসব দোকানে ছেলেমেয়েদের সালোয়ার কামিজ, ব্যাগ, ফতুয়া, ছোটদের পোশাক ও বিভিন্ন ধরনের কাপড় দেখা গেল। এ দোকানে গবেষক রবিখানের সাথে পরিচয় হয়, তিনি গারোদের সম্পর্কে অনেক গুরুতপূর্ণ তথ্য দিলেন । ওখান থেকে আমরা মধুপুর

Dhaka University Institutional Repository

বাজারে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখানে একটি হোটেলে যেয়ে খাওয়া দাওয়া করি এবং ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই । বাড়িতে আসতে আসতে ঘড়িতে রাত বারটা পার হয়ে যায়।

ফিল্ডওয়ার্ক : মণিপুরী এলাকা

মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট

লামাবাজার, সদর সিলেট

তাঁতীপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট

সুবিদবাজার, সদর সিলেট

(৭ থেকে ৮ মে ২০১০)

২০১০এর ৭ই মে মণিপুরীদের ভাষা উৎসব হয়েছিল সিলেটের তাঁতি পাড়ায়। এখানে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠনে সমগ্র সিলেট বিভাগ থেকে অনেকে আসেন, একারণে মণিপুরীদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয় । এখানে সাংস্কৃতিক উৎসব নাচ, গান, ভাষা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন ছিল । ৭ই মে ১১ টা ৩০ মিনিটে আমি সিলেটে পৌছে যাই। তখন আলোচনা পর্ব চলছিল, এখানে এসে সিলেটের কবি এ কে শেরাম সহ উৎপলেন্দু সিংহ, রঞ্জিত কুমার সিংহ, বিরাজ সিংহ, হরিলাল সিংহ ছাড়াও অনেকের সাথে পরিচয় ও কথাবার্তা হয়। তাদের অতীতের অলংকার, কাপড়, বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও বর্তমানে শিক্ষা সমাজ, পোশাক-আশাক, চাকরি ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা হয় । অনুষ্ঠান শেষ হলে অনেকের কাছ থেকে পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়ে নেই। সন্ধ্যার পর সিলেট শহরের মণিপুরী কাপড়ের দোকানগুলো ঘুরে দেখি। বর্তমানে তারা কাপড় চোপড়ে রং ও ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে, এছাড়া ফতুয়া, ছোটদের কাপড়, কুশন, বেডশিটসহ অনেক নতুন জিনিস তারা তৈরি করছে । রাতে হোটেলে থাকি। সকালবেলা ঢাকাথেকে আগত অতিথীরা চলে যান, আর আমি আমার সহপাঠী একজন মণিপুরী মেয়ে অমৃত সিংহ রাখীর বাসায় যায়; তাদের বাসা মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জে অবস্থিত। ওদের বাসায় গিয়ে নিজের পরিচয় দেই ও এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা জানাই। রাখীর মা মণিপুরী মহিলা সমিতির সভানেত্রী এস রীণা দেবী, ছেলে অভী সিংহ ফ্যাশন ডিজাইনার। অভি বাঙালি ধাচের কাপড়ের ডিজাইন করে। এস রীণা দেবীর সাথে বিস্তারিত কথা হয় । ৫বছর আগেও দেবীর বাসায় অনেকগুলো তাঁত ছিল, সূতার দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁতগুলো বন্ধ হয়ে গেছে । বাসায় পুরনো

Dhaka University Institutional Repository

একটি কাঠের শিল্পকর্ম পাওয়া যায়। তার কাছ থেকে জানা যায়, বর্তমানে মণিপুরীরা আগের মতো স্বর্ণ অলংকার ব্যবহার করে না। অভির সাথে মণিপুরী আধুনিক যুবক যুবতীদের নিয়ে আলোচনা হয়, সে ঐতিহ্যকে ধরে রাখার পক্ষপাতী নয়। তাদের বাসায় একটি পূজামণ্ডপ দেখা যায়, শংকর সিংহ নামের এক ব্যক্তি এই মূর্তি তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি ভাল ভাস্কর্য তৈরি করতে পারেন। অভীর ও তাদের ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র আধুনিক ডিজাইনে তৈরি। তাদের পরিবারে একজন বড় বোন আছে তার সাথেও কথা হয় । তার মা তাঁতের কাপড়গুলো চলমান থাকার জন্য সরকারী সহযোগিতার কথা বললেন। তার কাছেই শোনা গেল যে, মন্দিরের মোটিফটা তাদের শাড়িতে ব্যবহার করা হয় । দুপুরবেলা অভিদের বাসা থেকে বের হয়ে সুবিদ বাজারে মণিপুরী মিউজিয়াম দেখার জন্য বের হই, ওখানে মিউজিয়ামের পরিচালককে পেয়ে যায় । প্রথমে মিউজিয়াম ঘুরে দেখি ও ছবি তুলি পরে বিরাজ সিংহ ও উৎপলেন্দু সিংহের সাথে মিউজিয়ামের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি । এভাবে কাজ করতে করতে ৪টা বেজে গেলে মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে খাওয়া দাওয়া করি । ৬টার দিকে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠি ঢাকা রওয়ানা হওয়ার জন্য ।

ফিল্ডওয়ার্ক : গারো এলাকা (দ্বিতীয়বার)

চুনিয়াগ্রাম, মধুপুর, টাঙ্গাইল

পীরগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

(২৮ আগস্ট ২০১০)

২০১০ আদিবাসী দিবসে মধুপুর থেকে আগত অনীতা রিচিল-এর সাথে পরিচয় হয়। তিনি গারোদের আচিক মিচিক সোসাইটির সদস্য। এছাড়া ২৭ আগস্ট ২০১০ তারিখে আচিক মিচিক সোসাইটির সেক্রেটারি রোজিম্রং-এর সাথে মধুপুরে যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়। পরদিন ২৮ আগস্ট ২০১০ তারিখে সকাল বেলা মধুপুর রওনা হই । সকাল ১১টার পর মধুপুর থেকে পচিশমাইল বাজারে পৌঁছাই, ওখানে দেখলাম মটর সাইকেল নিয়ে কয়েক জন বসে আছে যাত্রীদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে । আমি এক আদিবাসী ছেলের পিছনে উঠে বসি । আচিক মিচিক স্যোসাইটিতে নামার পর রোজিম্রং সহ আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয় । তারা আমাকে প্রথমে বাবুল মারাক নামে একজন কারুশিল্পীর সাথে কথা বলতে চুনিয়া গ্রামে পাঠায়, বাবুল মারাকের বয়স ৩৫ বছর, তিনি নতুন ধরনের কিছু কারুশিল্প ট্রে, ফাইলবক্স ইত্যাদি তৈরি করছেন । এই সব কারুশিল্পে তিনি দুই রকমের রং ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। বাবুল মারাক, তার মা ও আরেক জনের সাথে তাদের ধর্ম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে কথাহয়। তাদের অভিযোগ হলো খ্রীষ্টান হওয়ার পর তারা পরিচয়হীন হয়ে পড়েছে । তাদের সাথে কথাবলার পর তার দিদির বাসায় যাই– তাঁর উঠানে নেড়ে দেওয়া কাপড় চোপড় দেখলে তাদের সংস্কৃতির পরিবর্তন কে আচ করা যায় । ঐ বাসায় ছোট দুইটা বাচ্চাকে দেখতে পাই যারা বাঙালি পোশাক পরিহিত । একটু পরে জনিক নকরেক নামে একজন ব্যক্তির সাথে আলাপ করার জন্যে রোজিংম্রং আমাকে ডেকে পাঠান । ১০৪ বছর বয়সী জনিক নকরেক বৃটিশ আমল থেকে তার আলাপ শুরু করেন । তিনি জানান পাকিস্তান আমলের শেষ দিক থেকে ঘরগুলো বাঙালি ধাচের হতে থাকে । খ্রীষ্টানরা এখানে আসার পর থেকে গারো দের উৎসব বিলুপ্ত হচ্ছে । তিনি বিভিন্ন উৎসব ও দেব দেবীর কথা উলেখ করেন । তার কথা হচ্ছে আদি ধর্ম বিশ্বাস থাকলে তাদের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এরপর আচিক মিচিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদিকার সাথে কথা হয়। জানা যায় ৭০-এর দশকের দিকে গারো মেয়েদের শাড়ি পরার চলন ছিল, বর্তমানে তারা নিজেদের পোশাক পরার চেষ্টা করছে। তিনি বাঙালি ধাচের একটি ব্লাউজ পরিহিত অবস্থায় ছিলেন ।আরো জানা যায় বর্তমানে গারোরা আধুনিক অলংকার পরিধান করছে । বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও তারা অনেক ধরনের পেশা বেছে নিয়েছেন । আধিকাংশ শিক্ষিত গারো ছেলে মেয়ে মধুপুরে না থেকে ঢাকায় বসবাস করেন । সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে মধুপুর বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হই ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

আলী, মেহরাব, *দিনাজপুরের আদিবাসী*, দিনাজপুর আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমীর সৌজন্যে প্রকাশিত, ১৯৮০

আহমেদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প, ঢাকার বাণিজ্যিক কারুকলা*, ঢাকা, ১৯৯৩

কামাল, মেসবাহ সম্পাদিত, *বাংলাদেশের আদিবাসী*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৩য় খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা ২০১০

কামাল, মেসবাহ; ইসলাম, জাহিদুল, অধ্যাপক ও চাকমা, সুগত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭

খান, হাফিজ রশিদ, *আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পারলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯

খান, হাশেম; মালাকার, গোপেশ; মালাকার, এডলিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বই, *চারু ও কারু কলা*, ষষ্ঠ শ্রেণী, ২০১১

খান, হাশেম; মালাকার, গোপেশ; মালাকার, এডলিন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বই, *চারু ও কারু কলা*, অষ্টম শ্রেণী, ২০০৭

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র, *চাকমা জাতি*, রাঙ্গামাটি ১৩১৬

চাকমা, কবিতা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পোশাকশিল্পের মূল নকশা এবং এই পোশাকশিল্পে নিয়োজিত নারীদের মান উন্নয়নে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা*, R I B, জুন ২০০৬

চাকমা, সুগত, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ২০০৯

চাকমা, সুগত, *বাংলাদেশের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩

ত্রিপুরা, শোভা, *ত্রিপুরা জাতির ইতিহাস*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৭

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি ১৯৯৪

দেওয়ান, বিরাজ মোহন, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, রাঙ্গামাটি, ১৩৭৬

দোহা, এস এম, বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত, অর্কিড প্রকাশন, ঢাকা ২০০৫

নন্দী, সুধীর কুমার, *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ৭০০১৩, ১৯৮৪

বসু, নন্দলাল, *শিল্পকলা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা-১৩৫১

বড়ুয়া, বিপ্রদাস, সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩,

বেগম, বিলকিস, *চাপাইনবাবগঞ্জের সূচীশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ২০০৬

বেসিন, প্রফেসর পিয়েরে, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, অনুবাদ : অধ্যাপিকা সুফিয়া খান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

মজিদ, মুস্তাফা, *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

মজিদ, মুস্তাফা সম্পাদিত, *কনক ও তার চিত্রকলা*, মাওলা ব্রাদার্স ২০০৮
মজিদ, মুস্তাফা, সম্পাদিত *গারো জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬
মর্গান, হেনরী লুইস, *আদিম সমাজ*, বুলবন ওসমান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫
মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢা.বি. ১৯৮৬
মুরমু, মিথু শিলাক, *বিপন্ন আদিবাসী জীবন ও সমাজ*, অক্সফাম, ঢাকা, ২০০৮
মোহসীন, কে. এম., অধ্যাপক ও আহমেদ, শরীফউদ্দিন, অধ্যাপক, *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭
শেরাম, এ. কে., *বাংলাদেশের মণিপুরী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
সাত্তার, আব্দুস,*আরণ্য জনপদে*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা। ২০০৭
সামাদ, ইবনে গোলাম, *মানুষ ও তার শিল্পকলা*, ম্যাগনাম ওপাস, ২০০৬
সিদ্দিকী, ড. আশরাফ, *লোকসাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৩
সেন্দেল, ভেলেমভান, সম্পাদিত, *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুকানন*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্ট্যাডিজ, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪
সেলিম, লালা রুখ, *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০০৭
হানাফী, জাফর আহমেদ, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩

English Reference Books :

Arnold, Dana, *Art History : A Very Short Introduction*, New York, 2004

Bhavnani,Mohan, *Decorative Design And Craftsmanship of India*, Bombay, 1969

Borsen, Richard, M, *Folklore In The Modern World*, Mouton publishers, Paris 1978

Brown,J. Harriette, *Hand Weaving*, Harper And Brother Publication,New York,1952

Burling, Robbins, *The Strong Women of Modhupur*, UPL, Dhaka ,1997

Caruana, Wally, *Aborginal Art*, Thames And Hudson, New York,1993

Chakma, Kabita, *The use of natural dye in changma textiles*, RIB, Dhaka, February, 2008

Chakma, Manjulika and Zaman Niaz, *STRONG BACKS MAGIC FINGERS, Independent University Of Bangladesh, karunangshu barua, Nymphea Publication, Feb, 2010*

Mohsin, K. M., Professor and Ahmed, SharifUddin, Professor, *Cultural History,* Cultural servey of Bangladesh, series-4 Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, 2007

Dalton,Edward, Tuite, *Descriptive Ethnology of Bengal,* Office of the Superintendent of Govornment Printing, Calcutta, India, 1872

Darlong, Lithuama, *The Darlong Of Tripura*, Directorate of Tribal Reseaech Institute, Govt. of Tripura, Agartala, 1995

Dhaka University Institutional Repository

Fuerer, C.Von. Edited, *Asian Highland And Socities : An Anthropological perspective*, Almut Mey, New Delhi, 1981

Glassi, Professor Henry, *Traditiomal Art Of Dhaka*, Bangla Academy.2000

Indian Aborogines And Their Administration, Calcutta, Joutnal Of Asiatic Society, 1951

Griswold. Lester,*Handicraft*, Prentice Hall Inc. New York, 1952

Wigg, Haselschwert, Wankelman, *A Handbook Of Art And Crafts*- publishers- Brown and Benchmark,U S A, 1997

Hoebel, E. A . Anthropology; The Study of Man, Mc Graw Hill Company, New York,1996

Janson, H.W. *History of art*, Thames and Hudson, New York, 1995

Joel, Solokov, *Textile Design*, Rizzoli International Publication Inc, New York,1991

Kramrisch, Stella, *The Art Of India*, London, 1954

Lindbeck, R.John, *Design Textbook*, Mcnight Publication Company,U S A, 1963

Majumder, R.C.,*The History Of Bengal*,Vol.1,Dacca, Dhaka University,1943

Majumder, R.C.,*History Of Ancient Bengal*,Calcutta,1965

Opie James, *Tribal Craft*, King, Laurence, U K, 1992

Rader, Melvin, *A modern book of Aesthetics*, Fifth Edition, Holt, Rinehart and winston, New York, 1903

Read, H, *A Concise History Of Modern Painting*, Thames And Hudson, New York ,1975

Read, H, *Meaning Of Art*, Thames And Hudson,1975

Reseley, H.H. *The Tribe and Castes of Bengal* Printed at the Bengal Secretariat Press, V-I, II Calcutta, India, 1891

Selz, Peter, *Art In Our Times*, NewYork 1981

Roy, Craven, *Indian Art*, Thames And Hudson,1991

Saraf, D. N. *Indian Craft Development And Potentials*, Delhi, 1985

Syed, Edward,W. *Orientalism*, Translated by Faiz Alom, Dhaka 2005

Taylor, Robert B, *Cultural Ways, A concise Edition of Itroduction To Cultural Anthropology*, Third Edition U S A, 1976

Textile Tradition Of Bangladesh, National Crafts Council,Dhaka 2005

Tovah, Martin, *Tusha Tuders HEIRLOOM Crafts*, N.Y. 1995

The Chakmas Of Tripura, Directorate of Tribal Research Institute, Govt. of Tripura, Agartala, 1997

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা, সংকলন :

অশোক কুমার দেওয়ান ও সুগত চাকমা সম্পাদিত, *উপজাতীয় গবেষণা প্রত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮২

আবেদ খান সম্পাদিত, *কালের কণ্ঠ*, ১৬ই মার্চ ২০১১

আবেদ খান সম্পাদিত, *কালের কণ্ঠ*, ১০ই জানুয়ারি ২০১১

কবি এ কে শেরাম সম্পাদিত, *'মৈরী'*, বার্ষিক মণিপুরী ভাষা উৎসব সংখ্যা, সিলেট ৭ মে ২০১০

জানিরা, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮১

ফাল্গুনী ত্রিপুরা সম্পাদিত, *সান্তআ জার্নাল*, ফেব্রুয়ারি, ২০০২

সুসময় চাকমা সম্পাদিত *বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, সংখ্যা-২০০৫

মথুরা ত্রিপুরা সম্পাদিত, *আদিবাসী সমাজ ও উন্নয়ন*, যাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি, বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০১

মথুরা ত্রিপুরা সম্পাদিত, *আদিবাসী সমাজ ও উন্নয়ন*, যাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি, বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০২

সঞ্জিব দ্রং সম্পাদিত, *সংহতি*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৯ আগস্ট ২০০৩

সঞ্জিব দ্রং সম্পাদিত, *সংহতি*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৯ আগস্ট ২০০৪

সাংগু, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবন, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪

হাফিজ রশিদ খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী অংশিদারীত্বের নতুন দিগন্ত*, বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ, বান্দরবন, ১৯৯৩

অভিসন্দর্ভ :

আমীন, নূরুল, *সমকালিন মৃৎশিল্পে সৃজনশীল চর্চা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, এম এফ এ অভিসন্দর্ভ, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০-৯১

চাকমা, ধনমণি, *চাকমা জাতির চিত্রকলা ও তার বিকাশ*, এম এফ এ অভিসন্দর্ভ, চিত্রকলা বিভাগ, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীকরণ*, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২ (পিএইচডি থিসিস)

সুলতানা, আইরিন পারভীন, *বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের পরিবর্তন একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯

সুলতানা, মোছা: আবেদা, *সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব : রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

হক, মোঃ আজিজুল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিবর্তন : ক্রিয়াশীল উপাদানের প্রভাব*, পিএইচডি থিসিস, আই বি এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

সরকারি তথ্য ও তথ্যকোষ:

Bangladesh Population Census,1991,District Dhaka, Dhaka.Bangladesh Bureau Of Statastics-1994

Bangladesh Population Census,1991,District Rajshahi,Dhaka.Bangladesh Bureau Of Statastics-1994

Bangladesh Population Census,1991,District Chittagong, Dhaka.Bangladesh Bureau Of Statastics-1994

Rizvi, S. N. H. Edited, *East Pakistan District Gazetteer*, Chittagong (1970)

Rizvi, S. N. H. Edited, *East Pakistan District Gazetteer, Sylhet*, 1971

Rizvi, S. N. H. Edited, *East pakistan District Gazetteer*, Dacca, 1970

Rizvi, S. N. H. Edited, *Bangladesh District Gazetteer*, Mymensing, 1978

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গেজেট* (এপ্রিল ২০১০)

বিশ্বকোষ :

Encyclopedia of Britainnica-Vol-2, Art, Encyclopedia of Britannica, inc, 1973 Chicago

Encyclopedia of world art Vo-7, Mcgraw Hill book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1958

Encyclopedia of world art Vo-1, Mcgraw Hill book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1958

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৯ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

ওয়েব সাইট :

www.chakma.org

www.worldtribalpeople.com

www.tribe.com

www.chakma.org (Proffessor Richard Crevier, Institute of Fine Arts, Rennes, France)

Dhaka University Institutional Repository

যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

ত্রিপুরা এলাকা (সেপ্টেম্বর ২০১০)

প্রথম সাক্ষাৎকার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০) : সন্তোষ ত্রিপুরা, বয়স ৪২, পেশায় জেলে, ধর্মে খ্রীষ্টান, অশিক্ষিত, স্থান : কিল্লাপাড়, বালুখালী, রাঙ্গামাটি।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০) : নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, বয়স ৭৫, পেশায় বিসিকের সাবেক পরিচালক, ধর্মে সনাতন, স্থান : কালিন্দিপুর, সদর, রাঙ্গামাটি।

তৃতীয় সাক্ষাৎকার (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : সত্যপাঞ্জি ত্রিপুরা, বয়স ৫৫, পেশায় শিক্ষক, ধর্মে সনাতন, স্থান : পাড়া– কালিঘাটা, সদর, বান্দরবন।

চতুর্থ সাক্ষাৎকার (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : দিনেন্দ্র ত্রিপুরা, বয়স ৪৫, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্ম খ্রীষ্টান, স্থান : পাড়া– কালিঘাটা, সদর, বান্দরবন।

গ্রুপ আলোচনা (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০) : রিয়া ত্রিপুরা গৃহিণী, বয়স ৩০; সন্তোষ ত্রিপুরা জেলে, বয়স ৪২, রতন ত্রিপুরা ছাত্র, বয়স ২৫ ও অন্যান্যদের সাথে গ্রুপ আলোচনা করা হয়। স্থান : কিল্লাপাড় বালুখালী, রাঙ্গামাটি।

বম এলাকা (সেপ্টেম্বর ২০১০)

প্রথম সাক্ষাৎকার (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : রবিন বম, বয়স ৩২, পেশায় ব্যবসায়ী, ধর্মে খ্রীষ্টান, শিক্ষিত, স্থান : শৈলপ্রপাত এলাকা, লাইমীপাড়া, বান্দরবন।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : ফরমাং বম, বয়স ৩০, পেশায় প্রাইমারি শিক্ষক, ধর্মে খ্রীষ্টান, শিক্ষিত, স্থান : ফারুকপাড়া, বান্দরবন।

গ্রুপ আলোচনা (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : ফরমাং বম, ডব্লিউ ভাই, দং লিয়াং সাং, রবীন্দ খোয়াজা সাইম, (কারবারি) ফারুকপাড়া, বান্দরবন।

প্রথমবার গারো এলাকা, মধুপুর (মে ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সাক্ষাৎকার (২৮ মে ২০১০) : প্রফুল্ল দিব্রা, বয়স ৫০, পেশায় কৃষক, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : তেলকি, জলছত্র, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

গ্রুপ আলোচনা (২৮ মে ২০১০) : একজন গারো উন্নয়ন সংগঠক– রবি খান (৪৬), তরুণ গারো ব্যবসায়ী ও কয়েকজন ক্রেতার সঙ্গে আলোচনা। স্থান : জলছত্র বাজার, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

দ্বিতীয়বার গারো এলাকা, মধুপুর (আগস্ট ২০১০)

প্রথম সাক্ষাৎকার (২৮ আগস্ট ২০১০) : জনিক নকরেক, বয়স ১০৪, পেশায় শিক্ষক (অব.), ধর্মে মান্দি, স্থান : চুনিয়া গ্রাম, মধুপুর, টাঙ্গাইল

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (২৮ আগস্ট ২০১০) : বাবুল মারাক, বয়স ৩৫, পেশায় কারুশিল্পী, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : চুনিয়া গ্রাম মধুপুর, টাঙ্গাইল

তৃতীয় সাক্ষাৎকার (২৮ আগস্ট ২০১০) : মিরণী হাগিদক, সহসভানেত্রী আচিক মিচিক সোসাইটি, বয়স ৫৭, পেশায় শিক্ষক, ধর্মে খ্রিস্টান, স্থান : চুনিয়া গ্রাম মধুপুর, টাঙ্গাইল।

গ্রুপ আলোচনা (২৮ আগস্ট ২০১০) : রোজী ম্রং, বয়স ৪০, এনজিও কর্মী; শাপলা, ছাত্রী, বয়স ২২; হরনী নকরেক, গৃহিণী, বয়স ৫৮ ও কয়েকজন এনজিও কর্মী। স্থান : পীরগাছা, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

তৃতীয়বার (মার্চ ২০১১)

প্রথম সাক্ষাৎকার (৩ মার্চ ২০১১) : রাখী ম্রং, লেখক ও সাংবাদিক, বয়স ৩৫ । স্থান : আদিবাসী অধিকার আন্দোলন কার্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।

সাঁওতাল এলাকা, রাজশাহী (সেপ্টেম্বর ২০১০)

প্রথম সাক্ষাৎকার (৫ সেপ্টেম্বর ২০১০) : অনীল মারান্ডি, বয়স ৫২, পেশায় সমাজকর্মী, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : সদর রাজশাহী।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : জাকারিয়াস ডুমরি, বয়স ৪৫, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : দামকুড়া, পবা থানা, রাজশাহী

তৃতীয় সাক্ষাৎকার (৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : ভীমহাসদা, বয়স ৭০, পেশায় শিক্ষক, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : ফুলবাড়ি, কাজমা,কাকন হাট, থানা– গোদাগাড়ি, রাজশাহী

চতুর্থ সাক্ষাৎকার (৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : গণেশ মাঝি, বয়স ৪২, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে খ্রীষ্টান, স্থান : লাখড়াদি, গোদাগাড়ি, রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপ আলোচনা (৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) : পাতরাস মারান্ডি, বয়স ৪৫, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে খ্রীষ্টান ; সলমন সান্তাল, বয়স ১৭, পেশায় ছাত্র, ধর্মে খ্রীষ্টান এবং সলমনের মা, বয়স ৪২ সহ একজন শ্রমিক ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। স্থান : কয়েলদাড়া, খ্রীষ্টান পাড়া, সপুরা, রাজশাহী

মণিপুরী এলাকা, সিলেট (মে ২০১০)

গ্রুপ আলোচনা (৭ মে ২০১০) : রবীন্দ্র কুমার সিংহ, বয়স ৪৬, ব্যবসায়ী, কলকাকলী, লালার দীঘিরপাড়, সদর, সিলেট। ধনসিংহ, বয়স ৫০, স্বর্ণকার, লালার দীঘিরপাড়, সদর, সিলেট; বিরাজসিংহ, মৃদঙ্গ বাজক, বয়স ৪৭, সুবীদবাজার, সদর, সিলেট; কবি একে শেরাম, বয়স ৫৫, লামাবাজার, সদর, সিলেট সহ অন্যান্যদের সাথে আলোচনা। স্থান : দ্যা এইডেড স্কুল, তাঁতীপাড়া সদর, সিলেট

প্রথম সাক্ষাৎকার (৮ মে ২০১০) : এসরিনা দেবি, বয়স ৬৮, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে সনাতন, স্থান : মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (৮ মে ২০১০) : অভিরূপ সিংহ, বয়স ৩২, ফ্যাশন ডিজাইনার, মণিপুরীপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট

দ্বিতীয়বার (মার্চ ২০১১)

প্রথম সাক্ষাৎকার (২৯ মার্চ ২০১১) : এ কে শেরাম, বয়স ৫৫, পেশায় কবি, ধর্মে সনাতন, বাড়ি : লামা বাজার সিলেট। সাক্ষাৎকারের স্থান : ঢাকা (টেলিফোনের মাধ্যমে)।

চাকমা এলাকা ১ম বার

প্রথম সাক্ষাৎকার (২৪ ডিসেম্বর ২০০৯) : ভবেশ মিত্র চাকমা, বয়স ৩২, পেশায় চারুশিল্পী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান নারানখায়া, খাগড়াছড়ি

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (২৫ ডিসেম্বর ২০০৯) : সুনয়ন চাকমা, বয়স ৪০, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান সদর, খাগড়াছড়ি

তৃতীয় সাক্ষাৎকার (২৭ ডিসেম্বর ২০০৯) : বিভেল চাকমা, বয়স ৩০, পেশায় ভাস্কর্যশিল্পী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান বাবুছড়া, খাগড়াছড়ি

চতুর্থ সাক্ষাৎকার (২৮ ডিসেম্বর ২০০৯) : ক্রয়সাংক মার্মা, বয়স ৫০, সাধারণ সম্পাদিকা, জেলা মহিলাআওয়ামী লীগ, পরিচালক শিশু ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর, খাগড়াছড়ি

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সাক্ষাৎকার (২৯ ডিসেম্বর ২০০৯) : জিতেন চাকমা, বয়স ৫০, পেশায় রিসার্চ অফিসার (খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট), ধর্ম বৌদ্ধ।

ষষ্ঠ সাক্ষাৎকার (৩১ ডিসেম্বর ২০০৯) : মন্টু বিকাশ চাকমা, বয়স ৫৫, পেশায় ব্যবসায়ী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান মিরপুর, ঢাকা।

গ্রুপ আলোচনা (২৮ ডিসেম্বর ২০০৯) : নিবেদিতা চাকমা, বয়স ৬৫, পেশায় এনজিও কর্মী, ধর্মে বৌদ্ধ; লাভলী চাকমা, বয়স ৪০, পেশায় শিক্ষক শিশু একাডেমী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্বাগতম চাকমা, বয়স ৩৫, এনজিও কর্মী, ধর্মে বৌদ্ধ ও স্বপ্না চাকমার (বয়স ৩৫, শিক্ষিকা) সাথে আলোচনা হয়। স্থান : মহাজনপড়া সদর, খাগড়াছড়ি ।

দ্বিতীয় বার চাকমা এলাকা (১৩ থেকে ১৫ সেপটেম্বর ২০১০)

প্রথম সাক্ষাৎকার (১৪ সেপটেম্বর, ২০১০) মন্টু বিকাশ চাকমা, বয়স-৫৫,পেশায় ব্যবসায়ী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান ফরেস্ট কলোনী, বনরূপা , রাঙ্গামাটি ।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (১৪ সেপটেম্বর, ২০১০) পোলিনা, চাকমা বয়স-২৭,পেশায় ছাত্রী, ধর্মে বৌদ্ধ, স্থান ফরেস্ট কলোনী, বনরূপা , রাঙ্গামাটি ।

অন্যান্য :

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

ক্ষুদ্র ন-ৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি

রবি খানের গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মিউজিয়াম, জলছত্র,মধুপুর, টাঙ্গাইল

মণিপুরী মিউজিয়াম, সুবিদ বাজার, সিলেট থেকে

সোল হাঙচার ৩য় যৌথ প্রদর্শনী (ক্যাটালগ), চারুকলা অনুষদ, ২০০৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে, ২০০৯

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা, বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে, ২০১০

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কারুশিল্প মেলা ,শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা,২০১১

কারুশিল্প মেলা , শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা, ২০১০

কারুশিল্প মেলা , শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা, ২০১১